মহামতি আকবর
নায়ক না খলনায়ক

জিয়াউল হক

লেখক পরিচিতি

কৃষ্টি আর কুষ্টির (পাট) জন্য বিখ্যাত কুষ্টিয়ার (দৌলতপুর থানা, গ্রাম: ফিলিপনগর) সন্তান জিয়াউল হক। জন্ম ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬০। তৎকালিন পাকিস্থান নৌবাহিনীতে কর্মরত পিতার কর্মস্থল করাচিতেই কেটেছে শৈশব, কৈশোর আর তারুণ্যের দিনগুলি। স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ এ বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন। ইংল্যান্ডের ব্রিষ্টল ইউনিভার্সিটি থেকে মেন্টাল হেলথ্, ই-এম-আই এবং ডিমেনশিয়া মেনেজমেন্টে এ্যডাপটেশন কোর্স শেষ করে ইংল্যান্ডেরই একটি বেসরকারি মেন্টাল হাসাপাতালের ডেপুটি ম্যানেজার এবং ক্লিনিকাল লীড হিসেবে দীর্ঘদিন চাকুরি করেছেন। অবসর নিয়ে বর্তমানে ইংল্যান্ডেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। নাবিকের নোঙ্গর হয় ঘাটে ঘাটে। শৈশবেই খেলাচ্ছলে কলম হাতে নিয়ে লিখতে বসা নাবিক পিতার সন্তান জনাব জিয়াউল হকও জীবনের দুই তৃতীয়াংশ সময়ই দেশের বাইরে কাটিয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পেরিয়ে ইংল্যান্ডে স্থায়ীভাবে অবস্থান করলেও নিয়মিত লেখালেখি করছেন। ধর্ম ও সমাজ, রাজনীতি ও আন্তর্জাতিকসহ সমসাময়িক বিষয়ে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ফিচার ও কলাম লিখার পাশাপাশি গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, উপন্যাস ও সংগীতসহ সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি অংগণেই তার উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাথেও তিনি জড়িত রয়েছেন।

লেখকের পূর্ব প্রকাশিত বইয়ের তালিকা

১। আধুনিক যুগে ইসলামী আন্দোলন ও তার দশটি ক্ষেত্র
২। মানব সম্পদ উন্নয়নে আল কুরআন
৩। নেতা বিশ্বনেতা- শ্রেষ্ঠ নেতা
৪। বৃটেনে মুসলিম শাসক
৫। ভোট কি ও কেন ?
৬। ইসলাম সভ্যতার শেষ ঠিকানা
৭। ধরণীর পথে পথে
৮। অন্তর মম বিকশিত করো (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ)
৯। বাংলাদেশের শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা
১০। আবার কখনো যদি
১১। টাইন নদীর ওপার থেকে
১২। নির্বাচিত কিশোর গল্প সংকলণ
১৩। কালচার নিয়ে অনাচার
১৪। বই খাতা কলম (প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ)
১৫। বিদায় বন্ধু দেখা হবে জান্নাতে
১৬। অল্প স্বল্প গল্প
১৭। এই ধরণী তলে
১৮। শিক্ষাব্যবস্থাঃ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী
১৯। চিকিৎসার আড়ালে মিশনারী তৎপরতা ও আমাদের চিকিৎসকদের দায়িত্ব
২০। ইসলামী শাসন ব্যবস্থাঃ মৌলিক দর্শন ও শর্তাবলী (মদিনা পাবলিকেশন্স)
২১। ইতিহাসের অলি গলি

মহামতি আকবর
নায়ক না খলনায়ক

জিয়াউল হক

দি পাথফাইন্ডার পাবলিকেশন্স

মহামতি আকবর
নায়ক না খলনায়ক

জিয়াউল হক

প্রথম প্রকাশ:
২৭ জানুয়ারি ২০১৮ ইং

প্রকাশনায়:
দি পাথফাইন্ডার পাবলিকেশন্স
চকফরিদ, কলোনী, বগুড়া।
মোবাইল: ০১৭১১-৪৮৩৪৯৯, ০১৭৪৮-৯৪০৪১৬।
E-mail: the.pathfinder.publications@gmail.com

প্রকাশক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সুলতানা আখতার

প্রচ্ছদ:
সাজিদুল ইসলাম সাজিদ

বর্ণ বিন্যাস:
ইসরা, বগুড়া।

পরিবেশক:
পরিলেখ
ঐশিক, আব্দুল হক সড়ক
রাণীনগর, ঘোড়ামারা, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য: ৩২০.০০ টাকা মাত্র।

MOHAMOTI AKBOR NAYAK NA KHALNAYAK
Written by: Ziaul Haque
Published by: The Pathfinder Publications.
Phone: 01711-483499, 01748-940416
Price: Tk.320.00 Only
ISBN: 978-984-34-3516-3

স্নেহাস্পদ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ-এর হাতে

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়ায় পি,এইচ,ডি অধ্যায়নরত সুন্দরবনের পার্শ্ববতি প্রত্যন্ত দ্বীপাঞ্চল গাবুরার আব্দুল্লাহ আল মাসুদ।

যার ভেতর আমি অমিত সম্ভবনাময় ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি। এই দেশ ও সমাজকে বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব দেবার জন্য শত শত আব্দুল্লাহ আল মাসুদদের জন্ম হোক। মহান আল্লাহর দরবারে সেই দোয়া করি।

জিয়াউল হক
ইংল্যান্ড-২০১৮

আমার কৈফিয়ত

আলহামদুলিল্লাহ। আকবরকে নিয়ে লেখার ইচ্ছা ছিল অনেকদিন থেকেই। আকবরকে নিয়ে অনেকে লিখেছেন, ভবিষ্যতেও লিখবেন কারণ, তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক অতিচর্চিত, আলোচিত, একইসাথে নিন্দিত ও নন্দিত চরিত্রও বটে।

আকবরের কর্মকাণ্ড, দীর্ঘ প্রায় পাঁচটি দশক ধরে পরিচালিত তার শাসনকার্য আমাকে আকৃষ্ঠ করেছে দীর্ঘদিন থেকেই। তার প্রতি আমার ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই, থাকার কোন কারণও নেই। তিনি গত হয়েছেন প্রায় অর্ধসহস্রাধিক বৎসর পূর্বে। তার প্রতি আমার আগ্রহের কারণ হলো, আকবর তার দীর্ঘ শাসনকালকে ব্যবহার করে এই ভারতীয় সমাজকে একটা বিশেষ ছাঁচে ঢেলে সাঁজিয়ে দিয়ে গেছেন। সেটা তিনি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যেভাবেই করুন না কেন, আমরা প্রতিটি ভারতবাসী আজ সেই ছাঁচের ভেতর দিয়ে আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়, এমনকি, সংস্কৃতিক জীবনটাকেও টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, আকবরের কর্মকাণ্ডের দ্বারা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের প্রতিটি মানুষই দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। আকবরের কারণেই ভারতবর্ষ মুসলমানদের হাতে পড়েও আন্দালুসিয়া হয়ে উঠতে পারেনি। তার সামনে ভারতীয় উপমহাদেশকে আন্দালুসিয়ার মত করে গড়ে তোলার সুযোগ এসেছিল, তিনি তা করেন নি বা করতে পারেন নি।

আমার এই বিশ্বাসটা আকবরের প্রতি বিদ্বেষ থেকে উৎসারিত নয়। আকবরের প্রতি কোন বিদ্বেষ পোষণ করি না, কিন্তু ইতিহাসের পর্যালোচনা করতে গেলে ব্যক্তিগত ভালোলাগা না লাগার উর্ধ্বে উঠে সত্য কথাটা বলতেই হয়, তা না হলে বুদ্ধিবৃত্তিক সততা রক্ষা করা সম্ভবপর হয় না একজন লেখকের পক্ষে। প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যগুলো যাচাই করেই আমার এ লেখা। প্রতিটি তথ্যের উৎস উল্লেখ করেছি যথাস্থানে। ইতিহাসের এই পাঠই আমার মনে আকবরের প্রতি পোষিত দৃষ্টিভংগী তৈরি করে দিয়েছে। 'মহামতি আকবর: নায়ক না খলনায়ক' গ্রন্থে সেটাকেই তুলে ধরেছি মাত্র।

আকবর যা করেন নি, তার দায় আকবরের উপরে চাপানো যেমন অন্যায়, তেমনি তিনি যা করেছেন, তার সেই সব কর্মকাণ্ডের কারণে যে সমস্ত সামাজিক ও সংস্কৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে, তা গোপন করাটাও বুদ্ধিবৃত্তিক অসততা। চেষ্টা করেছি এই উভয় অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার। কতটা সফল হয়েছি, সেটা শ্রদ্ধেয় পাঠকই বিচার করবেন।

জিয়াউল হক
নিউক্যাসল, ইংল্যান্ড
জানুয়ারি ২০১৮।

প্রকাশকের কথা

'মহামতি আকবর নায়ক না খলনায়ক' জনাব জিয়াউল হক রচিত বইটি **'দি পাথফাইন্ডার পাবলিকেশন্স'** প্রকাশনা তালিকায় ত্রয়োদশ বই হিসেবে প্রকাশ হতে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ।

সম্রাট আকবরকে নিয়ে বহু ইতিহাস রচিত হয়েছে। সে সব রচনার ক্ষেত্রে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটেছে। আকবরকে বিভিন্নভাবে চিত্রিত করার চেষ্টা, অপচেষ্টা দুটোই হয়েছে। আকবর ও তার দীর্ঘদিনের শাসন পুরো ভারতবর্ষকে প্রভাবিত করেছে। প্রভাবিত করেছে এতদ্বাঞ্চলের সমাজ ব্যবস্থাকেও। সে বিষয়টিই লেখক সামনে এনেছেন ঐতিহাসিক তথ্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

বইটার আকর্ষণীয় দিক হলো, একত্রে এই একটি বই'এ অনেক অজানা ঐতিহাসিক তথ্যের উপস্থাপন ঘটেছে সূত্রসহ। এমন অনেক ইতিহাস তিনি তুলে এনেছেন, যা আমাদের অনেকেরই অজানা। আশাকরি বইটি পাঠক মহলে সমাদৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

"দি পাথফাইন্ডার পাবলিকেশন্স" আপনাদের সামনে চিন্তার জগতকে আলোড়িত করার মত খোরাক দিতে চায়। সে লক্ষ্যেই এই প্রকাশনা। এ কাজে আপনাদের সহায়তা কামনা করে প্রতিষ্ঠানটি। ভুল ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিলে উপকৃত হবো।

বইটি যথাসময়ে প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর দরবারে কোটি কোটি শুকরিয়া জানাই।

সুলতানা আখতার
প্রকাশক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
দি পাথফাইন্ডার পাবলিকেশন্স, বগুড়া।
বাংলাদেশ, জানুয়ারি ২০১৮।

এক

পর্তুগিজরা সেই সুদূর আটলান্টিকের পূর্ব উপকূল থেকে পূর্ব দিকে ভারত অভিমুখে যাত্রা শুরু করে সেই পঞ্চদশ শতাব্দীতেই। ১৫২৬ সালে বাবর ভারতে তার নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করার বেশ আগেই পর্তুগিজরা ১৫১০ খ্রিষ্টাব্দে গোয়া দখল করে ফেলেছে। গোয়াসহ ভারতের পুরো পশ্চিম-দক্ষিণ উপকূলে তৎপর। নিজেদের একটা কুঠিই বানিয়ে ফেলেছে তত দিনে। নামে বাণিজ্য কুঠি বলা হলেও আসলে এগুলো ছিল একটা একটা মিনি ক্যান্টনমেন্ট। হাজারো ষড়যন্ত্রের ঘাঁটি।

আকবর ১৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দে গোয়ায় পর্তুগিজ কুঠিতে নিজের একজন দূত পাঠান। শুনেছেন সেই কুঠিতে খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী পর্তুগিজদের একটা গির্জা আছে এবং সেখানে নিয়মিত বাইবেলের পাঠ দেয়া হয়, প্রার্থনাও পরিচালিত হয়। আকবরের অনুরোধ, পর্তুগিজরা যেন দিল্লির মোগল দরবারে বাইবেলসহ কয়েকজন পাদ্রিকে পাঠান, তিনি তাদের কাছে থেকে বাইবেলের শিক্ষা বিষয়ে জানতে চান।

আগেই বলেছি, আকবর নিজের মাতৃভাষা ফার্সিটাও পড়তে জানতেন না, আরবি তো দূরের কথা। তা না হলে তিনি আল কুরআনের একজন পাঠক হিসেবে ঠিকই বাইবেলের সেই শিক্ষাটাও জানতে পারতেন, যে শিক্ষাটা একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর কাছেও নেই।

যা হোক, দিল্লি থেকে খোদ সম্রাটের এমন অনুরোধ পেয়ে পর্তুগিজ কুঠিরে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। সে রাতে সেখানে পাদ্রিরা অনেকক্ষণ ধরে বিশেষ প্রার্থনা করলেন। ঈশ্বর যেন এই ভারতভূমিতে মোগল সম্রাট আকবরকে একজন কন্সটান্টিন হিসেবে পরিবর্তিত করে দেন! পাদ্রিদের প্রার্থনার জবাবে উপস্থিত পর্তুগিজ বণিক আর সৈন্যদের সমস্বর কণ্ঠ আমেন! আমেন! ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হলো।

সেই সুদূর পর্তুগাল ও স্প্যানিশ উপকূল থেকে ছুটে আসা খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী পর্তুগিজদের সমকালীন মানসিকতা উপলব্ধি করা আমাদের জন্য অতীব জরুরি। মুসলমানদের হাত থেকে স্পেন হারানোর পর থেকে খ্রিষ্টবিশ্ব একটা দিনও নিশ্চুপ বসে থাকেনি। সেই ধারাবাহিকতাতেই দীর্ঘ সংগ্রাম আর চেষ্টা-প্রচেষ্টা শেষে তারা ফার্ডিন্যান্ড আর রানী ইসাবেলার যুগল স্বপ্ন পূরণ করেছে স্পেন দখল করে। কেবল কি তাই? তারা যে কেবল মুসলিম আন্দালুসিয়া তথা, স্পেনের রাজনৈতিক স্বাধীনতাই কেঁড়ে নিয়েছে, তাই নয়, তারা এর চেয়েও বড় বিপর্যয় টেনে এনেছে দীর্ঘ প্রায় আটশত বছর বাস করে এক অনুর্বর রুক্ষ পাহাড়ি জনপদকে বিশ্বের স্বপ্নরাজ্য, জ্ঞান বিজ্ঞানের পাদপীঠ হিসেবে গড়ে তুলেছে যে মুসলমান সম্প্রদায়, তাদের উপরে।

তারা স্পেন থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করেছে এক কাপড়ে। হত্যা করেছে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে আগুনে পুড়িয়ে ইনকুইজিশন আদালতে বিচার নামক এক প্রহসনের মাধ্যমে। স্পেনকে খ্রিষ্টরাজ্য ঘোষণার পাশাপাশি সেখানে ইসলামকে অবৈধ ঘোষণা করেছে, ইসলামি বিধিনিষেধ পালনকে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেছে। জোর করে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করে খ্রিষ্টান বানিয়ে 'মরিস্কো' নামে এক নতুন গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছে।

এভাবে তারা পুরো স্পেন থেকে মুসলমানদের বিদায় করেছে, বিদায় করেছে ইসলামের নাম-নিশানাটুকুও! এরপর তাদের নজর গেল দূর-দূরান্তে, এমনকি আটলান্টিকের ওপারে যেমনি তেমনি পুবের ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জাভা, শ্রীলংকাসহ দূর প্রাচ্যের আনাচে কানাচে! এক হাতে তরবারি আর এক হাতে বাইবেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে নতুন এক উদ্দীপনায়, বিশ্বের প্রতিটি আনাচে কানাচে খ্রিষ্টের বাণী পৌঁছে দিতে!

ঠিক এরকম উদ্দীপ্ত চেতনায় উজ্জীবিত তিনজন খ্রিষ্টান পাদ্রি Rudolf Aquaviva, Anthony Monsarrate এবং Francis Henriquez গোয়া থেকে ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে গিয়ে উঠলেন ফতেহ্পুর সিক্রিতে। এরও আগে দিল্লিতে খ্রিষ্টান ধর্মবিশ্বাসী পরিব্রাজক এসেছে অথবা যাত্রাবিরতি করেছে কিন্তু কোনো খ্রিষ্টান পাদ্রির আগমন সম্ভবত এই প্রথম!

উক্ত তিনজনের মধ্যে Francis Henriquez ছিলেন মূলত একজন ইরানি, পারসিক শিয়ামতাদর্শী। খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে তিনি পর্তুগিজ নাম ধারণ করেছিলেন। তাকে সাথে নেয়ার ফলে সম্রাট আকবরের সাথে পাদ্রি দলের কথোপকথন নিয়ে কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি, কারণ পাদ্রি Francis এবং আকবরের মাতৃভাষা এক; ফার্সি।

আকবর নিজে ছিলেন অশিক্ষিত। সম্রাট হুমায়ুনের ছেলে হলেও তার জন্ম হয়েছিল ভীষণ এক বৈরী পরিবেশে, বাবা হুমায়ুন তখন যোধপুরের রাজার বিশ্বাসঘাতকতার কারণে নিজের প্রাণ ও পরিবারসহ কিছু সৈন্য নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক এ সময়ে মাঝপথে ওমরকোট নামক মরুপ্রান্তরে ১৫ অক্টোবর ১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দে আকবরের জন্ম। বাবা আর চাচার মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মাত্র আঠারো মাস বয়সেই আকবর তার ষোলো বছর বয়সী মা হামিদা বানুসহ দীর্ঘ প্রায় দুই বছর বন্দিজীবন কাটাতে বাধ্য হন চাচা কামরানের আওতায়। দশ বছর বয়সে মৃত চাচা হিন্দালের রেখে যাওয়া সৈন্যবাহিনীর দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে, বারো বছর বয়সে একজন সেনাপতি হিসেবে কাবুলের পথে সিরহিন্দ-এ মাসের পর মাস ব্যস্ত সৈন্য পরিচালনা আর রাজ্য জয়ে। একটু অবসর পেলেই ছুটে যেতেন শিকারে। পড়াশুনা করার অবসর কই? পরিবেশই বা কোথায়?

এভাবে জীবনের একেবারে শুরু থেকেই বৈরী রাজনৈতিক পরিবেশে জন্ম নেয়াসহ আরও কিছু কারণে আকবরের পড়াশুনা হয়নি। আকবর রাজপুত রাজা আম্বারের কন্যাকে বিয়ে করেন ১৫৬১ সালে। এই মেয়ের গর্ভেই জন্ম নেবে ভবিষ্যৎ সম্রাট জাহাঙ্গীর। প্রায় একই সময়ে জয়সলিমার হিন্দু রাজা নিজ কন্যাকে এবং বিকানৌর-এর হিন্দু রাজা নিজ ভাগিনীকে আকবরের সাথে বিয়ে দেন। এভাবে তিনশত বিবাহিতা স্ত্রী আর পাঁচ হাজার উপপত্নীর এক বিশাল সংসার গড়ে ওঠে!

এসব বিয়ের পর থেকে মোগল রাজদরবারে হিন্দু সমাজের প্রভাব বেড়ে যায় কতটা, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো ভগবান দাস, মানসিংহ প্রমুখ আকবরের প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিয়োগের ঘটনায়।

হিন্দু স্ত্রী ও এইসব সভাসদদের প্রভাবেই আকবর জিযিয়া কর প্রথা বিলোপ, নিজ কপালে তিলক ধারণ, গেরুয়া পোশাক পরিধান, সারা জীবনটা ধরে পবিত্র জ্ঞান করে গঙ্গার পানি পান, রাজদরবারে পুজোয় অংশ নেয়া, এসবে জড়িয়ে পড়েন।

তার ওস্তাদ আব্দুল লতিফ ছিলেন একজন তথাকথিত প্রগতিশীল, মুক্তচিন্তার মানুষ। শিষ্য আকবরকে বিরত রাখা তো দূরের কথা তিনি এগুলোকে দেখেছেন পরধর্মের প্রতি সহনশীলতা হিসেবে। আর এসব বিয়েকে শরিয়ত মতে বৈধতা দিয়ে চলেছেন আবুল ফজল ও তার বাবা শেখ মুবারাক যৌথভাবে!

সুন্নি বাবা, শিয়া মায়ের সন্তান, শত হিন্দু নারীর স্বামী, শত হিন্দু রাজার জামাতা, দুলাভাই ও আত্মীয় আকবরের বিশ্বাসের জগৎটা ছিল বিচিত্র ধরনের গোঁজামিলে ভরপুর! সুফি সাধক শেখ সেলিম চিস্তির ওপরে তার অগাধ আস্থা ছিল। এই সাধক পুরুষই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে আকবরের তিন তিনটি পুত্র সন্তান জন্ম নেবে, যা পরবর্তীতে সত্য হয়েছিল। আজমিরে খাজা মঈনুদ্দিন চিস্তির দরবারেও তিনি নিয়মিত যাতায়াত করতেন।

শিয়া মতাদর্শী মা হামিদা বানুও যে কাল বিবেচনায় খুব একজন শিক্ষিতা রমণী ছিলেন, তাও নয়। তা ছাড়া আকবরের শৈশবে বিভিন্ন মা হামিদা বানুসহ এক এক করে নয়জন নারীর দুগ্ধ পান করেন। হিন্দু মারাঠা, রাজপুত ও শিয়া মতাদর্শী মুসলিম এসব নারীর সান্নিধ্য আকবরের চরিত্রে, তার বোধ-বিশ্বাসে, আচার ও আচরণে এক গভীর ছাপ রেখে গেছে, যা পরবর্তীতে আকবরের পুরো মনোজগৎটাকে একটা অবয়ব দিয়েছে।

কিন্তু তার ভেতরে জানার আগ্রহ ছিল প্রচন্ড। সভাসদদের দিয়ে পড়িয়ে নেয়ার জন্য গড়ে তুলেছিলেন এক বিরাট ব্যক্তিগত পাঠাগার। তার সে

পাঠাগারে জমা ছিল প্রায় চব্বিশ হাজারেরও বেশি বই।
বাবা হুমায়ুন তার মৃত্যুর প্রায় দুই মাস পূর্বেই পুত্র আকবরের জন্য অভিভাবক হিসেবে বৈরাম খাঁকে নিয়োগ দেন। এই বৈরাম খাঁ তার ওপরে সম্রাট হুমায়ুন কর্তৃক পোষিত বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যদিও আকবর বৈরাম খাঁর প্রতি সদাচরণ করেননি।
যাহোক, অশিক্ষিত আকবরকে নিয়ে ইচ্ছামত খেলা করাটা সহজ হয়ে পড়ে। ঠিক এরকম পরিবেশেই তার পাশে ভিড়ে সুযোগসন্ধানী ও চতুর দুনিয়ালোভী আলেম; আবুল ফজল।
আবুল ফজল আকবরের জীবনী আইন-ই-আকবরের রচয়িতা। আরবি ও ফার্সি ভাষায় পারদর্শী শিয়া মতাদর্শী আলেম, শেষে হয়ে ওঠেন মুক্তমনা নাস্তিক, যদিও তিনি ছিলেন একজন আলেম পিতা শেখ মুবারকের সন্তান। আবুল ফজল ও তার পিতা শেখ মুবারক ছিলেন আকবরের অত্যন্ত প্রভাবশালী সভাসদ।
আরও একজন ছিলেন; বাদাউনী, একজন প্র্যাকটিসিং সুন্নি মুসলিম স্কলার, তবে তিনি এই বাপ-বেটার চাপে অনেকটা কোণঠাসা অবস্থায় ছিলেন আগাগোড়াই।
মুসলমানদের সুফি মতবাদ আর প্রায় একই সময়ে হিন্দুদের মধ্যে চলমান ভক্তি আন্দোলন, উভয়ের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম সাদৃশ্য থাকায় আকবর সেদিকেও কিছুটা ঝুঁকে পড়েন।
ফতেহপুর সিক্রির ঠিক পেছনে মসজিদে মাঝে মাঝে নামাজও পড়তেন তিনি, অবশ্য সেটা দ্বীন-ই-ইলাহি প্রবর্তনের আগেকার ঘটনা। বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব এই মসজিদের পেছনে আকবর তৈরি করেন 'ইবাদত খানা'। এখানেই প্রতি বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব বসতেন, তার চারি পাশে গোল হয়ে নিরাপদ দূরত্ব রেখে বসতেন অন্যান্য সভাসদগণও। শুরু হতো ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা।
আলোচনা এগিয়ে চলতো রাতের সাথে পাল্লা দিয়ে। হিন্দু ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের আলোচনা তিনি শুনতেন মন দিয়ে। পর্তুগিজ পাদ্রিদের আলোচনাও শুনলেন পর পর কয়েকদিন ধরে। তাদের দেয়া উপহার, বাইবেল নিলেন সাগ্রহে। কত প্রশ্নই না ছিল, সব প্রশ্নই তিনি করলেন। তিন পাদ্রি জবাব দিল, তারা তাদের জবাবে একমত।
সমস্যা দেখা দিত মুসলিম আলেমদের নিয়ে। কোনো একটা বিষয়ও এমন ছিল না যে মুসলিম আলেমরা সেই বিষয়ে একমত হতেন। রাতের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তো আলোচনা, সেই সাথে বাড়তো আলেমদের গলার স্বর।

সহসাই তারা একে অপরকে আক্রমণ করে কথা বলা শুরু করতো, কে প্রকৃত অর্থে বড় কাফের বা ইহুদিদের দালাল সে বিষয়টা প্রমাণ করাটাই তাদের লক্ষ্য হয়ে উঠতো। মূর্খ আকবর বিরক্ত হতেন স্বাভাবিকভাবেই।

ঠিক এসময় এগিয়ে এলেন আবুল ফজল, আর বাবা শেখ মুবারাক। অনেকটা তাদেরই পরামর্শে তিনি ডিক্রি জারি করলেন; এখন থেকে ইসলামের বিধি-বিধান বা আল কুরআনের কোনো আয়াতের ব্যাপারে ফতোয়া বা চূড়ান্ত মতামত দেবেন স্বয়ং আকবর! সেটা ছিল সাম্রাজ্যের সব প্রজাদের মধ্যে বৃহত্তর আদর্শিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় একক ধর্ম হিসেবে দ্বীন-ই-ইলাহি প্রবর্তনের পথে গৃহীত প্রথম পদক্ষেপ!

আবুল ফজল আর তার বাকপটু বাবা শেখ মুবারক আকবরের মধ্যে নাকি ঐশ্বরিক গুণাবলী দেখতে পেয়েছেন, যা তাকে ঐশী বাণী কুরআন ব্যাখ্যায় যোগ্য হিসেবে অধিষ্ঠিত করেছে! মূর্খ আকবর তোষামুদে বাপ-বেটার কথা অন্ধের মত বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন! বাদাউনী তখন হতবাক হয়ে কেবল নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছেন!

আগত পর্তুগিজ পাদ্রিরা ততদিনে আকবরের কাছ থেকে সেখানে গির্জা তৈরির অনুমতি নিয়ে গির্জাও বানিয়ে নিয়েছে। কেবলই কি তাই? আকবর এই পাদ্রিদেরকেই শাহজাদা মুরাদের গৃহশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিলেন, আর আবুল ফজলকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন পর্তুগিজ পাদ্রিদের ফার্সি ভাষা শেখান।

তখনও প্রতি বৃহস্পতিবার নিয়মিতই আসর বসতো, সারারাত ধরে সে আসরও চলতো, সেই সাথে চলতো মুসলিম আলেমদের পরস্পরের মধ্যে ফতোয়াবাজি, মাজহাবি বিরোধ আর একে অপরকে কাফের নাস্তিক বলে সম্বোধন! তা দেখে পাদ্রিদের মুখে ফুটে উঠতো চাপা হাসি!

দুই

অত্যন্ত ধূর্ত পর্তুগিজ পাদ্রিদের সূক্ষ্ম কৌশল আকবর ও তার সভাসদদের জানার কথা নয়। তারা বরং রয়েছে সেই আটলান্টিকের উপকূল হতে কষ্ট (!) করে আসা এইসব পাদ্রিদের আপ্যায়ন ও মেহমানদারিতে! অথচ তত দিনে পর্তুগিজরা আরব সাগরে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রায় প্রতিষ্ঠা করেই ফেলেছে।

তারা এতদিন আরব সাগরে বাণিজ্য জাহাজ লুট করতো, এতটুকুর মধ্যেই তাদের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ থাকলো না, তারা অচিরেই মোগল সাম্রাজ্যের পশ্চিম-দক্ষিণ উপকূল ঘেঁষে, গোয়া থেকে আরো উত্তরে ছোট্ট একটা এলাকা নিজেদের করায়ত্তে নেবে, নাম দেবে 'বন বাহিয়া'।

পর্তুগিজ ভাষায় এর মানে হলো 'নিরাপদ আশ্রয়' তথা 'শান্তিধাম'। এই 'বন বাহিয়া' থেকেই আধুনিক 'বোম্বাইয়্যা' এর পরে 'বোম্বাই' এবং সেখান থেকে 'বোম্বে' শব্দের উৎপত্তি।

যা হোক, যে পর্তুগিজরা আজ আকবরের রাজদরবারে বসে তার আতিথ্য উপভোগ করছে, সেই পর্তুগিজরাই ভারত থেকে জাহাজযোগে হজ করতে যাওয়া হজযাত্রীদের জন্য বিশেষ পাসপোর্ট চালু করেছে, তা না হলে আরব সাগরে সেই সব জাহাজ ও যাত্রীদের সর্বস্ব লুট করে নেয় তারা। এমনকি, হত্যা করে সমুদ্রে ফেলে দেয় বা দাস হিসেবে নিয়ে গিয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় বিক্রি করে দেয়! (ডমিনিকান রিপাবলিক, ত্রিনিদাদ, টোবাগো, বার্বাডোস, হাইতি, গায়ানা প্রমুখ অঞ্চল, আজও সেসব দেশে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি রয়েছে)।

আকবরের দরবারে দুনিয়ালোভী আলেম আবুল ফজল আর তার বাবা শেখ মুবারক যখন পর্তুগিজদের সবরকম পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছেন ঠিক সেই সময় ভারত থেকে হজ গমনেচ্ছু মুসলিম হজযাত্রীরা আরব সাগর নিরাপদে পাড়ি দিয়ে পবিত্রভূমিতে পৌঁছুনোর জন্য 'বন বাহিয়া' (বোম্বে) থেকে যিশুর কল্পিত ছবি ও ক্রস চিহ্ন আঁকা যে বিশেষ চিরকুট (পাসপোর্ট) নিচ্ছে একটা বিশেষ অংকের অর্থ প্রদানের মাধ্যমে, তা সমুদ্রপথে তাদের নিরাপদে পবিত্রভূমিতে পৌঁছে দিত বটে, কিন্তু তা একই সাথে তাদের জন্য ছিল চরম অপমানজনক ও মানসিক কষ্টের কারণ।

মোগল সম্রাটদের কেউই, বিশেষ করে, সেই সময় আকবর ও তার সভাসদরা মুসলমানদের, এমনকি, পুরো ভারতবাসীর এই অপমানের প্রতিকারে কোনো ব্যবস্থাই নেননি। নিজেদের উপকূলীয় অঞ্চল রক্ষায় মোগল সম্রাটরা কোনো নৌবহরই গড়েননি, উদ্যোগও নেননি। পুরো আরব

সাগর তখন পর্তুগিজ জলদস্যুদের দখলে!

আকবরের চরিত্রে ভারতীয় ও মোঙ্গল বৈশিষ্ট্যের সন্নিবেশ ঘটেছিল। বাবা হুমায়ুন জন্মেছিলেন কাবুলে, আর দাদা বাবরের জন্ম হয়েছিল সমরখন্দের নিকটে ফারগানায়। বাবর কিংবা হুমায়ুনের চরিত্রে ক্ষেত্র বিশেষে যে কাঠিন্য ছিল মরুচারী মঙ্গল জাতির, সে বৈশিষ্ট্য আকবরের ছিল না। এর বিপরীতে আকবরের চরিত্রে ভারতীয় অঞ্চলের মানুষজনের মধ্যে সহজেই দৃশ্যমান বিলাসী, শৌখিন ও প্রচণ্ড আবেগ প্রবণতার প্রবল উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়।

জন্ম বিবেচনায় আকবরই প্রকৃত অর্থে প্রথম ভারতীয় মোগল, কারণ, তার জন্ম হয়েছিল ওমরকোটে। আকবর বরাবরই ভারতকে নিজের জন্মভূমি ভাবতেন সঙ্গত কারণেই।

সম্রাট আকবরের দৃষ্টিভঙ্গিতে যে এক আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়ে গেছে তত দিনে, সে বিষয়টা ঐতিহাসিকরা যেন ইচ্ছা করেই চেপে যান। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হওয়ার পর থেকে হুমায়ুনের শেষ বছর ১৫৫৬ পর্যন্ত মোগল রাজ দরবারে আমির ওমরাহদের (একালে মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী) সংখ্যা ছিল একান্ন জন।

এদের সকলেই ছিলেন শিয়া বা সুন্নি মতাদর্শী মুসলমান। কেউবা আফগান, তুর্কি, উজবেক, পারসিক। একজনও ভারতীয় নন, অমুসলিমও নন।[১]

কিন্তু আকবরের ক্ষমতারোহণের মাত্র কয়েকটি বছরের মধ্যেই (১৫৮০ সাল নাগাদ) এরকম আমির-ওমরাহদের সংখা গিয়ে দাঁড়ালো দুইশত বাইশ জনে। এদের মধ্যে অর্ধেকই ছিলেন ভারতীয়। আর তাদের মধ্যে আবার তিতাল্লিশ জন হিন্দু রাজপুত, বেশির ভাগই আকবরের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক সূত্রে।[২]

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, আম্বারের হিন্দু রাজার কন্যাকে ১৫৬২ সালে বিয়ে করলে বৈবাহিকসূত্রে আম্বার রাজা তথা আকবরের শ্বশুর মোগল দরবারে আমির হিসেবে বরিত হন। এখানেই সীমাবদ্ধ থাকলো না, রাজার পুত্র ভগবান দাস (আকবরের শ্যালক) এবং রাজার অপর এক নাতি মানসিংহও মোগল দরবারে আমির ওমরা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন।

আর এদের প্রভাব দেখতে দেখতে অপ্রতিরোধ্য পর্যায়ে উন্নীত হয়, কারণ হেরেমের ভেতরে এদের কারো মেয়ে বা কারো বোন বা কারো ফুফু স্বয়ং সম্রাটের স্ত্রী হিসেবে রয়েছেন, অতএব এদের কেউ ঘাঁটায়নি বা ঘাঁটাতে সাহস করেনি।

গোয়া বিজয় ও সেখানে নিজেদের ঘাঁটি নির্মাণের পরপরই পর্তুগিজ

জেনারেল আফোনসো ডি আল বুকার্ক তার সেনাদের প্রতি নির্দেশ জারি করেছিল, তারা যেন পরাজিত, নিহত, ধৃত ও দাস হিসেবে আটলান্টিকের ওপারে চালানকৃত ভারতীয় মুসলিম সেনাদের স্ত্রী ও মেয়েদের বিয়ে করে। সে নিজে এরকম কিছু সৈন্যের বিয়েতে উপস্থিত থেকেছে। সেখানে জোর করে ধরে আনা দক্ষিণ ভারতীয় মুসলিম নারীদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বিয়েতে বসতে হয়েছে। আর প্রকাশ্যে তাদেরকে খ্রিষ্টান বানানো হয়েছে।[৩] এসব হতভাগা নারীদের সন্তান-সন্ততিগণকে দাস হিসেবে চালান করে দেয়া হয়েছে দূর-দূরান্তের জনপদে। পর্তুগিজদের হাতে কেবলমাত্র মুসলমানরাই নির্যাতিত হয়েছে, এমন দাবি করাটা সত্যের অপলাপ হবে। সেখানে হিন্দুরাও চরম নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে। হিন্দুদেরও জোর করে খ্রিষ্টান বানানো হয়েছে। মুসলমানদের মতো হিন্দু রসম রেওয়াজ বা তাদের জীবনাচার; যেমন ধুতি পরা, বাড়িতে তুলসী গাছ লাগানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেছে।

এমনকি কোনো কোনো পাদ্রি তো এই সব অপরাধের শাস্তি হিসেবে ইনকুইজিশন কোর্ট তথা আগুনে পুড়িয়ে মারার প্রথা চালুর সুপারিশও করেছে।[৪]

ভোগ বিলাসে মত্ত সম্রাট আর তার সেই বিলাসী জীবনের সহযোগী হয়ে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত হিন্দু-মুসলিম সভাসদদের কোনো মাথা ব্যথা নেই, ছিলও না।

বরং সেই পর্তুগিজ পাদ্রিদেরই খোদ ভারত সম্রাট আমন্ত্রণ জানিয়ে রাজকীয় মর্যাদায় আপ্যায়ন করছেন! এর পরিণতিটাও ফলতে খুব একটা দেরি হয়নি।

আগেই বলেছি আকবর এই পাদ্রি Anthony Monsarrateকে তার এগারো বছরের সন্তান মুরাদের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। পাদ্রি Monsarrate মুরাদকে খুব যত্ন করে শিক্ষা দিতে থাকেন। প্রতিদিন পড়াশুনা শুরুর আগে তাকে খ্রিষ্টবাদ সম্বন্ধে কিছু কথা (বাইবেল থেকে) শোনাতেন। মুরাদ কিন্তু তার বিগত এগারো বছরের জীবনে কোনোদিনও আল কুরআন থেকে একটা আয়াত শুনেনি, বা শেখেনি।

এখানেই শেষ নয়, প্রতিটি পাঠ শুরুর আগে পাদ্রি এর সাথে সাথে মুরাদও 'ঈশ্বর ও তার পুত্র যিশুর নামে' বলে শুরু করতো।[৫]

এরই মধ্যে ডিসেম্বরে বড়দিন এসে উপস্থিত হলে এই প্রথমবারের মতো পর্তুগিজ খ্রিষ্টান পাদ্রিরা সাড়ম্বরে ফতেহপুর সিক্রিতে বড়দিন উদযাপন করলো। দিল্লির মাটিতে সেই প্রথমবারের মত বড়দিন উদযাপন, তাও

আবার মোগল রাজদরবারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়, সম্রাট আকবরের অংশগ্রহণে।
সম্রাট আকবরের সাথে পাদ্রি Rudolf Aquaviva-এর বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো। দু'জনে বিকেল বেলায় একসাথে হেঁটে বেড়াতেন। আকবরের উদ্দেশ্য ছিল খ্রিষ্টবাদকে আরও ভালো করে জানা। তার আগ্রহ দেখে পর্তুগিজরা বড় উৎসাহ আর আগ্রহ নিয়ে লেগে থাকলো ।
কিন্তু অচিরেই তাদের সে আগ্রহে ভাটা পড়লো। আকবর খুবই মর্মাহত হলেন এটা জেনে যে, হযরত ঈসা (আঃ) একজন নবী হওয়া সত্ত্বেও এবং খ্রিষ্টানদের দাবি মতে আল্লাহর সন্তান হওয়া সত্ত্বেও কয়েকজন ইহুদির হাতে এমন চরম কষ্ট-ক্লেশ করে মৃত্যু বরণ করলেন!
তিনি নিজে নাকি মৃতকে জীবিত করেছেন, অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন, তারপরও তাঁর প্রতি আক্রমণকারী ইহুদিদের কিছুই করতে পারলেন না!
আর তার পিতা; আল্লাহ, যিনি পুরো সৃষ্টির উপরে এত ক্ষমতাশালী সেই তিনি কি না নিজ পুত্রকে অপমানজক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হলেন! অথবা পুত্রকে রক্ষা করলেন না? এ কেমন পিতা?
অথচ আকবর যদি আল কোরআন পড়তেন বা তার যদি আল কোরআন পড়া বা জানার সুযোগ হতো, তা হলে তিনি খুব সহজেই জানতে পারতেন যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর একজন সম্মানিত নবী, ইহুদিরা না তাঁকে হত্যা করতে পেরেছে, আর না তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহ তাঁর এই প্রিয় বান্দাহকে চরমতম বিপদের সময় পরিত্যাগ করেননি, ঠিকই তিনি তাঁকে উদ্ধার করেছেন যথাসময়েই।[৬]
যা হোক, চরম বিরক্তিভরে আকবর মুখ ফিরিয়ে নিলেন খ্রিষ্টবাদ থেকে, এ দর্শনের প্রতি তার মোহভঙ্গ হলো।
এর আগেই বলেছি, আকবর ফতেহপুর সিক্রি মসজিদের পেছনে নির্মিত ইবাদত খানায় আলেম-ওলামাদের নিয়ে প্রতি বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব ধর্মীয় আলোচনার আয়োজন শুরু করেছিলেন এবং সেখানে আলেমদের মধ্যে ইসলামের বিধিবিধান নিয়ে বিতর্ক, বাদানুবাদ ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ দেখে ইসলাম থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।
আগেই বলেছি, আকবর পুরোমাত্রায় একজন ভারতীয় সম্রাট, এই ভারতেই তিনি জন্মেছেন, এর বাইরে তার কোনো জায়গা নেই। তিনি ভারতবাসী হিসেবে হিন্দু ধর্মের জাতপ্রথা খুব ভালো করেই জানতেন। তার নিজ প্রাসাদে পুজো-পার্বণ সারা বছর লেগেই থাকতো। বাদাউনিকে দিয়ে তিনি

মহাভারতের ফার্সি অনুবাদ করিয়েছেন। বাদাউনি তাকে মহাভারত পড়ে শুনিয়েছেন।

মহাভারতে বুদ্ধির অগণ্য এমন ঘটনার বিবরণ তিনি শুনেছেন, যা স্বাভাবিক বুদ্ধিতে ধর্মকথার চেয়ে তার কাছে কল্পকথা মনে হয়েছে। তার বেশির ভাগ স্ত্রীই ছিল হিন্দুধর্মাবলম্বী, তারপরেও এ ধর্মকে তিনি ভারতবাসী সকলের জন্য মুক্তির একমাত্র পথ বলে মনে করতেন না। একই রকম ধারণা ছিল শিখ ও জৈন ধর্ম সম্বন্ধেও ।

আকবরের শৈশব থেকেই তার চারিপাশ ঘিরে ছিল পারসিক সংস্কৃতি ও চিন্তা-চেতনার ধারক-বাহকরা। মা হামিদা বানু ছিলেন পারস্যের শিয়ামতাদর্শী, বাবা সম্রাট হুমায়ুন নিযুক্ত অভিভাবক বৈরাম খানও ছিলেন শিয়া মতাদর্শী পারসিক। ব্যক্তিগত দুই ভৃত্য জওহর ও বায়েজিদ, দুই জনই পারসিক শিয়ামতাদর্শী, তাঁর অতি প্রিয় দুধ মা মাহাম আঙ্গা ও তার পুত্র, আকবরের ছোটকালের খেলার সাথী, দুধ ভাই ও বন্ধু আজম খান, এরাও ছিলেন শিয়া মতাদর্শী ও পারসিক বংশোদ্ভূত।

আবুল ফজল ও তার ভাই ফৈজি শিয়া মতাদর্শী হলেও তারা ছিলেন মুক্তচিন্তার মানুষ, বিশেষ করে আবুল ফজল তো ছিলেন পাঁড় নাস্তিক। আর এদের বাবা বুড়ো শেখ মুবারাকও ছিলেন শিয়া মতাদর্শী।

মৃত বাবা হুমায়ুন ছিলেন সুন্নি, আকবরের উপরে যার তেমন কোন প্রভাব পড়ার মত পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগই হয়নি। আর এদিকে বাদাউনিও ছিলেন সুন্নি, কিন্তু শেখ মুবারাক, আবুল ফজল আর তার ভাই ফৈজির দাপটে বাদাউনি আকবরের কাছে তেমন একটা ভিড়তেও পারতেন না, তিনি নিজে থেকে না ডাকলে।

এ বাস্তবতাই আকবরের মনোজগৎকে এমন একটা দিকে ধাবিত করেছে, যেখানে কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি তার অনুসন্ধিৎসু মন আকৃষ্ট হতে পারছে না। তিনি বিষয়টা নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলেন।

তিন

আকবর ভাবছেন তার প্রজাদের নিয়ে, প্রজাদের বৃহত্তর কল্যাণের চিন্তা তার মাথায় আসন গেড়েছে। যে কোনো নৃপতির জন্যই প্রজাহিতৈষী হওয়াটা একটা ভালো গুণ। কিন্তু এখানে সবার আগে একটা মৌলিক প্রশ্ন এসে যায় আমাদের সামনে। সেটা হলো 'কল্যাণ' আর 'অকল্যাণ' এর রূপ সংজ্ঞা ও ধরন কি হবে, সেটা নিয়ে মানুষের জ্ঞান কতটা রয়েছে? সবার কি একই রকম জ্ঞান রয়েছে? কল্যাণ-অকল্যাণের সংজ্ঞা কি সবার কাছেই এক ও অভিন্ন?

প্রকৃত বাস্তবতা হলো, মানব জীবনে প্রকৃত কল্যাণ সম্বন্ধে তার জ্ঞান ছিল না, থাকার কথাও নয়। ফলে দেশবাসী নিয়ে তার মনে ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তাদের কল্যাণ সাধনে তার কোনো প্রকৃত পরিকল্পনাও ছিল না।

প্রজাদের কষ্ট-ক্লেশ দূর করা সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে আকবরের মনে যে উৎকণ্ঠা, তা নিয়ে আমার বা আমাদের মনে কোনো প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন হলো, তার সামর্থ্য কতটুকু ছিল? সেটা নিয়ে। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্তি ছাড়া নিজ জ্ঞান, বুদ্ধি, আর প্রজ্ঞার বদৌলতে এত বিরাট একটা দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার মতো যোগ্যতা ধারণ করতেন?

এর উত্তরটাই আমরা কিছু ঐতিহাসিক তথ্য উপাত্তের আলোকে বিচার করে দেখবো সংক্ষিপ্ত পরিসরে।

আজ হতে প্রায় পাঁচশত বছর আগে যে লোকটি গত হয়েছেন, তার মানসিক দিক, মনস্তাত্ত্বিক চিত্র খুঁজে ফেরা এক দুরূহ কাজই বটে। তারপরেও যেহেতু তার কাজ, তার উপস্থাপিত দর্শন আর কর্মপন্থা ইতিহাসের অংশ হয়ে আমাদের জীবন ও সমাজ ব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে চলেছে, সেহেতু আমরা চাইলেও এই দুরূহ কাজটাকে এড়িয়ে যেতে পারি না। সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সততা বজায় রেখে এই প্রশ্নের উত্তর আমাদেরকে খুঁজে নিতেই হবে।

এই খুঁজে নেয়ার প্রক্রিয়াতেই আমরা তাকে বিচার করবো তার পূর্বসূরিদের ইতিহাস, তার জন্ম, পরিবার ও পরিবেশ, তার শৈশব ও যৌবনের কর্মকাণ্ড ও তার আশপাশে যারা ঠাঁই পেয়েছিল, তাদের সকলকে। এসব সূত্র হতে আহরিত তথ্য উপাত্তই আমাদেরকে বলে দেবে আকবরের মানসচিত্র।

জন্মসূত্রে আকবর পুরোমাত্রায় ভারতীয়। বাবা হুমায়ুনের জীবন ছিল রাজনৈতিক উত্থানে পতনে ভরপুর। যুদ্ধের ময়দানে কেটেছে যেমনি, তেমনি কেটেছে বনে জঙ্গলে, মরু তেপান্তরে প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে বাঁচতে।

আকবরের জন্মও হয়েছিল এরকমই এক যাত্রার মাঝপথে। আবার মাত্র দেড় বছরের আকবর কিছু বুঝে উঠার আগেই প্রায় দুই বছর বন্দিজীবন কাটিয়েছেন মাসহ, বাবা হুমায়ুন তখনও পলাতক।

জীবনে প্রথম যখন বাবার মুখটা স্মরণযোগ্যভাবে দেখেন, তখন তার বয়স মাত্র সাড়ে তিন বছর। এর পরে মাত্র দশটা বছর বাবা হুমায়ুন বেঁচে থাকলেও আকবর নিরবচ্ছিন্নভাবে বাবার সান্নিধ্য পাননি, সুন্নি বাবার আদর্শ ও শিক্ষাকে ধারণ করতে পারেননি। সে সুযোগও তিনি পাননি। কারণ, বেশির ভাগ সময়ই (মাত্র আট বছর বয়স থেকেই) তাকে বাবা অথবা অভিভাবক বৈরাম খাঁর সাথে যুদ্ধের ময়দানে বা সেনা তাঁবুতে কাটাতে হয়েছে।

যুদ্ধ চিরদিনই প্রাণ নেয়া, খুন ঝরানোর উপলক্ষ মাত্র। এটাকে চাইলেও এড়ানো যায় না সব সময়, কখনও কখনও জড়িয়ে পড়তেই হয়। এটা অনস্বীকার্য একটা বাস্তবতা।

আমরা যে সময়কালের কথা বলছি, সে সময়কাল ও যে সমাজের কথা বলছি সেখানে যুদ্ধ মানেই হলো নৃশংসতা আর বর্বরতা। আকবরের শরীরে তৈমুর, চেঙ্গিস, হালাকু খানদের রক্ত বইছে। তার দাদা বাবর চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই যুদ্ধের ময়দানে। দুই-একটা ঘটনা ছাড়া বাবরের জীবনে অহেতুক রক্তপাতের ঘটনা নেই, নৃশংসতা তিনি এড়িয়ে চলেছেন সযতনে।

বাবরের বাবা উমর শেখ ছিলেন ফরগানার শাসক ও সেই সাথে ধর্মপ্রাণ একজন আলেমও বটে। বাবার সে গুণ পেয়ে পুত্র বাবর আলেম হয়ে উঠতে না পারলেও একেবারে বখে যাননি। মানবিক গুণাবলী তার ভেতরে ছিল। তিনি ছিলেন কবি, একটি কবিতাকে ছন্দ, শব্দ, উপস্থাপনা ও মাত্রার ভিন্নতায় ৫০৪ ভঙ্গিতে লিখে দেখিয়েছেন। এটা তার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচায়কও বটে। তিনি একজন প্রকৃতিপ্রেমীও ছিলেন। বাগান করা তার আজীবন শখ ছিল, সেই সাথে তার হবি ছিল বই পড়া।

বাবরের মহৎ প্রাণের চিত্র আমরা দেখতে পাই তার পানিপথ বিজয় উদযাপনের ঘটনায়। বাবর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রতিপক্ষ নেতা নিহত ইব্রাহিম লোদির লাশ দাফন করিয়েছেন পুরোপুরি ইসলামি রীতিতে। তিনি ইব্রাহিম লোদির পরিবার, স্ত্রী, কন্যা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে যথাযথ সম্মান ও নিরাপত্তা দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছেন, কোনো ধরনের অসম্মান করেননি। পরাজিত প্রতিপক্ষ সেনাপতি ইব্রাহিম লোদির কবরকে বাঁধিয়ে দিয়েছেন নিজ দায়িত্বে, অসম্মান করেননি, আর তার কবরকে ঘিরে একটি বাগানও করে দিলেন।[৭]

এর মাত্র কয়েক বছর আগে এই বাবরের ভগ্নিপতি; বোন খানজাদা বেগমের স্বামী, শাইবানী খান পারস্য সম্রাট শাহ ইসমাইলের সাথে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলে শাহ ইসমাইল শাইবানী খানের কাটা মাথার খুলিকে সোনা দিয়ে মুড়িয়ে বিশেষ ধরনের পানপাত্র বানিয়েছিলেন! মাঝে মাঝে, বিশেষ করে, বাইরের প্রতিনিধিদল দেখা করতে এলে শাহ ইসমাইল তাদের সামনে সেই পানপাত্রে সুরা পান করে বিকৃত আনন্দ পাবার পাশাপাশি নিজের বীরত্ব জাহির করতেন।[৮]

পরাজিতদের প্রতি সমকালে কি ধরনের বর্বর আচরণ করা হতো সে উদাহরণ তার সামনে ছিল। কিন্তু তিনি সে পথে যাননি। লাহোর দখলের পর বাবর প্রথম যে কাজটি করেছিলেন, তা হলো, তিনি দ্রুত পায়ে হেঁটে গিয়েছেন স্থানীয় গাজি খাঁর লাইব্রেরিতে, যেন সেখান থেকে বইগুলো কেউ সরিয়ে নিতে না পারে। তার আগেই তিনি পছন্দমত বইগুলো নিজের অধিকারে নেন।

রাজ্য হারিয়ে বাবর যখন রিক্ত হস্তে বিভিন্ন গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সে সময় যেসব কৃষক, জেলে বা শ্রমিক মানুষ তার উপকার করেছেন, ক্ষমতা হাতে পেয়ে সর্বপ্রথম তাদের খুঁজে খুঁজে বের করে পুরস্কৃত করেছেন, তার বিপদের দিনে তাকে সাহায্য করার জন্য, আশ্রয়, খাদ্য ও পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্য তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

মৃত্যুর পূর্বে বাবর নিজ পুত্র হুমায়ুনকে ডেকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন সেখানেও একজন মানুষ হিসেবে, একজন পিতা হিসেবে তার মহৎ গুণাবলীর প্রকাশ দেখতে পাই। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, তার মৃত্যুর পরে হুমায়ুন যেন অপর তিন সৎ ভাই; আসকারি, কামরান আর হিন্দালের সাথে ভালো আচরণ করেন।

হুমায়ুনের চরিত্রেও বাবার কোমল হৃদয়ের দিকটা ফুটে উঠেছিল অনেকটাই। তবে ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারত অভিমুখে পরিচালিত বাবরের পঞ্চম ও শেষ অভিযানের সময় পাঞ্জাবের ময়দানে সতেরো বছরের যুবক হুমায়ুনের নেতৃত্বে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেখানে পরাজিত ও বন্দী প্রায় একশত আটজন সৈন্যকে কামানের সামনে দাঁড় করিয়ে গোলার আঘাতে উড়িয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন শাহজাদা হুমায়ুন তার জেনারেল আলী কুলিকে, সে নির্দেশ বাস্তবায়নও হয়েছিল তৎক্ষণাৎ। বাবর নিজে তার জীবনী বাবরনামায় সে কথা উল্লেখ করেছেন।[৯]

যুদ্ধে পরাজিতদের প্রতি পূর্বসূরি তৈমুর, চেঙ্গিজ ও হালাকু খানদের মত এই

যে নৃশংসতার পুনরাগমন, তা কিন্তু পরবর্তী মোগল সম্রাটদের জীবনে নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে এবং ভারতের মাটিতে পক্ষ-বিপক্ষ নিরূপণ ও নির্ধারণের ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা পালন করবে।

বাবার উপদেশ হুমায়ুন অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও নিজ বৈমাত্রেয় ভাইদের কারো কারো কাছ থেকে হুমায়ুন বার বার এবং কখনও কখনও ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা ও বৈরিতার শিকার হয়েছেন। বিশেষ করে, কামরানের কাছ থেকে। কামরান হুমায়ুনকে উৎখাত করার জন্য বেশ কয়েকবারই বিদ্রোহ করেছে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে।

বেশ কয়েববার ক্ষমা করার পরেও তার চরিত্রে পরিবর্তন না হলে এবং তার পক্ষ থেকে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কাজ কর্ম বন্ধ না হলে হুমায়ুন অনেকটা বাধ্য হয়েই কামরানকে শাস্তি দেন। তার সে শাস্তি ছিল অত্যন্ত হৃদয়বিদারক, নৃশংস ও ভয়ানকও বটে।

সেটা ছিল ১৫৫২ সালের শেষের দিকের ঘটনা। কামরানকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা আদাম গাক্কার বন্দী করে হুমায়ুনের দরবারে পাঠালে দীর্ঘদিন পরে দুই ভাইয়ের দেখা হয়। কামরান এর আগেও বন্দী হয়ে হুমায়ুনের দরবারে আনীত হয়েছিলেন, আর হুমায়ুন প্রতিবারেই তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

কিন্তু ক্ষমা পেয়ে কামরান আবার ফিরে গেছেন তার নিজ লক্ষ্যে। সৈন্য সংগ্রহ করে ভাই হুমায়ুনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন দিল্লি দখলের জন্য।

হুমায়ুনের দরবারে অন্যান্য সভাসদদের পক্ষ থেকে এর আগেও চাপ দেয়া হয়েছে বিদ্রোহী কামরানকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার জন্য। কিন্তু হুমায়ুন বার বার মৃত বাবা বাবরের নসিহতকে স্মরণ করে তাকে ক্ষমা করেছেন। এবারে বেচারা কামরানের আর সে সুযোগ হলো না। হত্যা করা না হলেও তাকে অন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ জারি করা হলো।

সে এক বীভৎস দৃশ্য! আগের দিন দুই ভাই দীর্ঘ দিন পরে সাক্ষাতের কারণে পরস্পর হাসিমুখে, এক উৎসবমুখর পরিবেশে খানা-পিনা করেছেন, অনেক রাত পর্যন্ত সে খানা পিনা চলেছে। আর পরের দিন সেই ঘরের পাশের ঘরে কামরানকে কয়েকজন সৈন্য চিৎ করে শুইয়ে রেখেছে, একজন তার বুকে আসীন হয়ে দুই চোখের মধ্যে ধারালো ছুরি দিয়ে কয়েকবার আঘাত করে চোখের মনি বের করে ফেলে এবং এর পরে সেই ক্ষত স্থানে লেবুর রস দিয়ে ভেজানো লবণ ঢুকিয়ে দেয়।[১০]

কামরান চিরদিনের জন্য তার দু'টি চোখ হারিয়ে অন্ধ হয়ে যান। এর পরে ঘা শুকালে কামরানকে রাষ্ট্রীয় খরচে মক্কায় হজ করতে পাঠানো হয়, তিনি

হজ্বব্রত পালন করেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন।

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার মনে করছি। এই কামরানের কাছেই কিন্তু শিশু আকবর তার মা হামিদা বানুসহ প্রায় দুই বছর ধরে বন্দিজীবন যাপন করেছেন কাবুলে। কামরান মোগল সিংহাসনের উত্তরাধিকার বৈমাত্রেয় ভাই মোগল সম্রাট হুমায়ুনের শিশুসন্তান আকবরকে হাতে পেয়েও হত্যা করেননি, বরং পুত্র স্নেহে মানুষ করেছেন।

বাবার স্মৃতি মনে পড়ার আগে থেকেই আকবরের মানসপটে চাচা কামরান ও আসকারির স্মৃতি গেঁথে যায়। শৈশবের এই পারিবারিক ইতিহাস আকবরের ভুলে যাওয়ার কথা নয়।

চার

শৈশব আর কৈশোরের আরও কিছু এমন ঘটনা রয়েছে যা আকবরের পরবর্তী জীবন ও তার ব্যক্তিত্ব, তার কর্মপ্রণালী, কর্মধারা তৈরি করে দিয়েছে। আকবর তার পারিবারিক ও বংশীয় ঐতিহ্যধারা থেকে বের হয়ে আসতে লেগেও যেন তা পারেননি।

এ বিষয়টা কিছুটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। আমরা পূর্ণবয়স্ক আকবরকে যেভাবে দেখি বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহে, তাতে আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আকবরের একটা কোমল মন ছিল।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত মানবিক ও আবেগী একজন মানুষ। তার আবেগী মনকে কিভাবে দিল্লির মসনদ শাসন ও তা রক্ষার করার মত করে উপযোগী এবং প্রয়োজনে কঠোর হওয়ার মত করে তৈরি করা হয়েছে, তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা দেখতে পাই হুমায়ুনের প্রথম জীবনে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনায়।

রৌড়ির রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করে লবণ বিক্রি করতেন যে হকার; হিমু। এই হকারই শেষ পর্যন্ত নিজের যোগ্যতাবলে আদিল শাহের নজরে পড়ে যায়। সেখান থেকে তর তর করে করে তিনি আদিল শাহের প্রধানমন্ত্রী পদে উন্নীত হন। হিন্দু ধর্মাবলম্বী হিমু ছোটখাটো, বেঁটে হলেও সাহস ও বুদ্ধিতে ছিলেন চৌকস। এর আগে বাবর আর হুমায়ুন, পিতা-পুত্র মিলে মোট পনেরো বছর শাসন করলেও দিল্লির মসনদে ক্ষমতার পাল্লা কখনও বা মোগলদের দিকে ঝুঁকেছে আবার কখনও তা ঝুঁকেছে আফগানদের দিকে। ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে তেরো বছরের ছেলে আকবর আর তার অভিভাবক বৈরাম খাঁ যখন পাঞ্জাবে সিকান্দার শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত, ঠিক তখনই নিজ লাইব্রেরির সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে হুমায়ুন আহত হন (২৪ শে জানুয়ারি, শুক্রবার, ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) আর তিনদিন অজ্ঞান থেকে এর পরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পুত্র আকবর ও বৈরাম খানের কাছে যখন খবর পৌঁছলো তখনও তারা সিকান্দার শাহের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের মাঝপথে। এদিকে দিল্লির সিংহাসনে হঠাৎ করেই এক শূন্যতা চলে এসেছে। এর আগে থেকেই দিল্লির উপরে নজর রেখে আসছিল শের শাহ, তার পুত্র ইসমাইল শাহ, পাঞ্জাবের সিকান্দার শাহ আর এদিকে আদিল শাহ, এ তিনজনের নেতৃত্বে তিনটি পরস্পর বৈরী আফগান বাহিনী। এদের মধ্যে থেকে আদিল শাহের সেই সামান্য লবণ বিক্রেতা থেকে উঠে আসা সেনাপতি হিমু একদল সৈন্য নিয়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে গিয়ে ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দিল্লি দখল করে

নিজেকে রাজা ঘোষণা করে, রাজা বিক্রমাদিত্য নামে দিল্লির মসনদে বসলো।

এখানে একটা ঐতিহাসিক বিষয় খুবই চমকপ্রদভাবে লক্ষণীয়। হিমুকে তার ভেতরে অসাধারণ যোগ্যতা ও সাহস দেখে একেবারে রাস্তা থেকে তুলে এনেছিলেন আদিল শাহ। প্রথমে একজন সৈনিক, এর পরে তাকে পদোন্নতি দিয়ে সৈনিক অফিসার এবং জেনারেল, তারও পরে তারই সালতানাতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন। হিমু এ দীর্ঘ সময়কালে নিজের অবস্থান ক্রমাগতভাবেই শক্ত করতে থাকেন। আদিল শাহ ও তার শাসনক্ষমতার প্রতি পুরোপুরি আনুগত্য প্রদর্শন করে চলেন।

কিন্তু সম্রাট হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যু ও দিল্লি থেকে মসনদের উত্তরাধিকার আকবর তখন দিল্লি থেকে তিনশত মাইল দূরে অবস্থান করাটা পরিস্থিতিকে জটিল করে তুললো।

পাঞ্জাবের সিকান্দার শাহের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধের মাঝখানে এতটাই ব্যস্ত যে, সে যুদ্ধের একটা সফল পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত তারা সেখান থেকে দিল্লি অভিমুখে ফিরতে পারছেন না চাইলেও বা ফিরবেন না।

এরকম একটা বাস্তব পরিস্থিতিকে সামনে রেখে সিকান্দার শাহ খুব হিসেব করে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটা পদক্ষেপ নিলেন। তিনি দিল্লি আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং নিজ প্রধানমন্ত্রী হিমুকে এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে দিল্লি অভিমুখে রওয়ানা দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সময় নষ্ট করার মতো সময় তাদের হাতে নেই!

এখানে, এই মুহূর্তে এসে হিন্দু ধর্মাবলম্বী প্রধানমন্ত্রী হিমু তার জীবনের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটি নিলেন। তিনি যুদ্ধে গেলেন ঠিকই, দিল্লিও প্রায় বলা চলে, একরকম বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দখল করে নেন।

সম্ভবত এর অন্যতম এক কারণ হলো, বৈরাম খাঁর নেতৃত্বে সম্রাট হুমায়ুনের মোগল বাহিনীর বেশিরভাগ সৈন্যই দিল্লি থেকে অনেক দূরে পাঞ্জাবের ময়দানে। হিমুর বিশাল বাহিনীকে নিয়ে হুমায়ুনের অপর সেনাপতি তারদি খাঁ কোনোরকম কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলেননি। তিনি পিছু হটেন, সম্ভবত এটা তার কৌশলগত সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু তার এই সিদ্ধান্তে ক্ষতি যা হওয়ার তা হয়েই গেল। দিল্লি হাতছাড়া হয়ে গেল। এটা ছিল মোগল সাম্রাজ্যের জন্য এক বিরাট মানসিক ধাক্কা ও অপমানজনক অবস্থা।

এর বাইরেও একটা দিক ছিল। সেটা হলো বহিরাগত মুসলিম শাসকদের হাত থেকে ভারতের স্বাধীনতাকে উদ্ধার করা সংক্রান্ত হিন্দুদের গোপন কৌশলের সফলভাবে প্রয়োগ ও তার কার্যকারিতার বিষয়টি, সেটি প্রকাশ্যে

ও জনসম্মুখে এসে গেল । এ কৌশল হিমু বলেননি। বলেননি আর কোনো সমসাময়িক নেতা বা সমরপতি। কৌশলটি অনেক পরে এসে নির্দ্বিধায়, অবলীলায় নিজের লেখায় লিখেছেন আধুনিক ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহারলাল নেহেরু তার লেখা বিখ্যাত The Discovery of India গ্রন্থে, এভাবে;

Her method has been two fold: to fight them and drive them out, and to absorve those who could not be driven away. She resisted with considerable success.

ভাবানুবাদ: তার (ভারতের) কৌশল ছিল দ্বিমুখী, যুদ্ধ করে তাড়িয়ে দাও, আর যাদের যুদ্ধের মাধ্যমে তাড়ানো সম্ভব হবে না, তাদেরকে ভেতর থেকেই হজম করে নেয়া। আর এভাবে তারা উল্লেখযোগ্য সফলতাও পেয়েছে।[১১]

যা হোক, ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু দিল্লি হারিয়ে বৈরাম ও হুমায়ুন, দু'জনই হকচকিত হয়ে পড়লেও বুদ্ধিমান বৈরাম দ্রুত পরিস্থিতি বিবেচনায় করণীয় ঠিক করে ফেললেন। তারা পাঞ্জাব অভিযান আপাতত বন্ধ রেখে দিল্লির দিকে নিজেদের নজর ফেরালেন।

তারা নিজেদের সৈন্য নিয়ে দিল্লির দিকে এগুলেন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালালে তার কি ধরনের পরিণতি হবে বা হতে পারে, সে ব্যাপারে আকবরের সৈন্যদের একটা বার্তা দিতেই বৈরাম খাঁ দিল্লির যে মোগল সেনাপতি হিমুর বাহিনীর মোকাবেলা না করে রাজধানী একরকম বিনাযুদ্ধেই হিমুর হাতে ছেড়ে দিয়ে পালিয়েছে, সেই তারদি খাঁকে প্রকাশে মৃত্যুদণ্ড দেন। এই তারদি খাঁ ছিলেন আকবরের বাবা হুমায়ুনের অতি বিশ্বস্ত কয়েকজন সেনাপতির একজন।

এরপরে বৈরাম খাঁ আর আকবর মিলে হিমুর মোকাবলোয় দাঁড়ালেন ঐ বছরেরই নভেম্বর মাসের ৫ তারিখ, বৃহস্পতিবার। এটাই ছিল দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ। এই পানিপথেই এর তিরিশ বছর আগে দাদা বাবর ইব্রাহিম লোদির মুখোমুখি হয়েছিলেন। এখানেই বাবরের ভাগ্য লিখা হয়ে গিয়েছিল। এই পানিপথেই মোগল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়। আজ আরও একবার সেই পানিপথেই কিশোর আকবর সেই মোগল সাম্রাজ্য উদ্ধারের জন্য এসে দাঁড়িয়েছে!

হিমুর বাহিনী ছিল বিশাল, মোগল সৈন্যদের তুলনায় সংখ্যা আর রসদে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস, এর আগে এক এক করে ২২টি যুদ্ধে যে হিমু অপরাজিত থেকেছে, সেই হিমুই তার জীবনের ২৩তম যুদ্ধে ভাগ্য

বিড়ম্বনার মুখোমুখি হলো।[১২]

যুদ্ধের মাঠে সবই ঠিক ছিল, এমন সময় হঠাৎ করে একটি তীর এসে হিমুর বাম চোখে বিদ্ধ হলে সে ব্যথা, যন্ত্রণায় হাতির পিঠে ঢলে পড়ে এবং অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়।

সেকালে যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতির উপস্থিতি তার সৈন্যদের জন্য অবধারিতভাবে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হতো। হিমু আহত ও অজ্ঞান হয়ে যাওয়ায় তার সৈন্যরা অচিরেই রণে ভঙ্গ দিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। অতি সহজেই দুর্বল বাহিনী হলেও মোগলরা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হলো।

পরদিন আহত হিমুকে বন্দী করে পিছমোড়া অবস্থায় বেঁধে নিয়ে আসা হলো। আহত বন্দীর চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করা হলো না, বৈরাম খাঁ তখন দিল্লির মসনদের সুরক্ষায় বিভোর!

দীর্ঘদিন নিজ প্রভু সিকান্দার শাহের তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠে শক্তি সঞ্চয় করে তারই সৈন্যবাহিনী, তারই দেয়া রসদ সরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধে এসে দিল্লি দখল করে হিমু তার নিয়োগকর্তা সিকান্দার শাহকে বেমালুম ভুলে, তার সাথে প্রতারণা করে নিজেকে দিল্লির রাজা হিসেবে ঘোষণা প্রদান করেছেন।

প্রতিপক্ষ এমন বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি আর কারো কাছ থেকে দয়ার্দ্র আচরণ পাক না কেন, বিজয়ী বৈরাম খাঁর কাছ থেকে এমন আচরণ অন্তত আশা করতে পারেনা। বৈরাম নিজের চোখের সামনে এমন বিশ্বাসঘাতককে করুণা করতে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। বিনা বাক্য ব্যয়ে হিমুকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করলেন। তিনি হিমুকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন বটে, কিন্তু সেই দণ্ড কার্যকর করতে হবে তেরো বৎসরের কিশোর আকবরকে!

এইখানে এসেই আমরা কিশোর আকবরের ভেতরের নরম মানবিক দিকটির দেখা পাই। আকবর তার শিক্ষক বৈরাম খাঁর এই নির্দেশ মানতে অস্বীকার করলেন। তিনি মানুষ হত্যা করতে পারবেন না, বিশেষ করে, একজন অসহায়, নিরস্ত্র বন্দীর প্রতি অস্ত্র উত্তোলন করতে তার মন সায় দিচ্ছিল না। কিন্তু বৈরাম খাঁ অনেক পোড়খাওয়া অভিজ্ঞ একজন সেনাপতি। জীবনে অনেক উত্থান পতনকে কাছ থেকে দেখেছেন তিনি। হিমুর প্রাণদণ্ড কার্যকরের নির্দেশটা ইচ্ছা করলেই তিনি কোনো এক জেনারেলকে দিতে পারতেন, তারা হিমুকে বাইরে নিয়ে গিয়ে এক কোপে ধড় থেকে মাথাটা আলাদা করে ফেলতে পারতো। কিন্তু সেটা তিনি করেন নি। তিনি নির্দেশ দিলেন আকবরকে, আকবরকেই এই প্রাণদণ্ড কার্যকর করতে হবে! আকবর, ভবিষ্যতের মোগল সম্রাটকে এই অঞ্চল এই জনপদে এরকম অনেক

পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে, এরকম অনেক অপ্রীতিকর সিদ্ধান্ত তাকে নিতে হবে নিজ অস্তিত্ব, ক্ষমতা, নিজ বংশের গৌরব ও ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে হলে। তাই এখন থেকেই তাকে সেভাবেই তৈরি হতে হবে। আর তাকে তৈরি করার সে দায়িত্বটাই অর্পণ করে গেছেন তার পিতা হুমায়ুন। বৈরাম খাঁ সে দায়িত্বটুকু পালন করছেন কেবলমাত্র!
ওস্তাদ বৈরামকে আকবর শ্রদ্ধা আর ভক্তিভরে খান বাবা বলে ডাকতেন। খান বাবার কাছে আর্জি জানালেন তাকে দিয়ে যেন এ কাজটা করানো না হয়। কিন্তু তার সে খান বাবা নাছোড়। আর কেউ নয় আকবরকেই এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে। কারণ, তিনি অর্থাৎ আকবরের খান বাবা যে আকবরের ভেতরের এই কোমল দিকটাকে দূর করতে চাচ্ছেন তাকে ভবিষ্যতের একজন সফল নৃপতি হিসেবে তৈরির লক্ষ্যে, এই দিকটা বোঝার মতো মানসিক পরিপক্বতা কিশোর আকবরের তখনও হয়নি।
খান বাবার নির্দেশ পরে আঠারো বছর বয়সে এসে যেভাবে অমান্য করেছেন, আজ এই তেরো বা সাড়ে তেরো বছর বয়সের কিশোর আকবর সেভাবে অগ্রাহ্য তো দূরের কথা, কোনো রকম প্রতিবাদও করার সাহস পেলেন না।

বৈরাম খানই আকবরের হাতে একটা খোলা তলোয়ার তুলে দিয়ে ইশারা করলেন হিমুর মস্তক কাটতে।[১৩]
আকবর নীরবে তলোয়ারটা হাতে নিয়ে এক কোপে হিমুর মাথা কেটে ফেললেন। একটা মাত্র কোপ! হিমুর মাথা তখন মাটিতে গড়াচ্ছে। সেখানে উপস্থিত অন্যান্য কার মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা জানা যায়নি, তবে আকবরের কিশোর মনে এ ঘটনা বিরাট প্রভাব রেখে গেছে।

পাঁচ

হিমুকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হননি বৈরাম খান। হিমুর এই করুণ পরিণতিকে মোগল সাম্রাজ্যের, বিশেষ করে, মোগল সাম্রাজ্যের কিশোর সম্রাট আকবরের জন্য এক বিরাট প্রচার প্রোপাগান্ডার বিয়ষবস্তু হিসেবে অতি কৌশলের সাথে কাজে লাগালেন। হিমুর বিশাল বাহনীর বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত ছোট ও দুর্বল মোগল বাহিনীর বিজয়টা আসলেই ছিল এক কথায় অভাবিতপূর্ব, বিশেষ করে সেই তখন যখন আকবরের বাহিনীর এক বিরাট অংশ পাঞ্জাবে সিকান্দার শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত।

মাত্র তিরিশ বছর আগে দাদা বাবর দিল্লি দখল করে সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করলেও ক্ষমতাকে সংহত করতে পারেন নি কেউই। না তার দাদা বাবর, আর না বাবা হুমায়ন। চারিদিকে বিরুদ্ধশক্তি দিল্লির ক্ষমতা দখল করার জন্য তৎপর।

কতটা তৎপর তার প্রমাণ হলো, এক দুর্ঘটনায় পড়ে হঠাৎ করে বাবা হুমায়ুনের মৃত্যুর পরবর্তীতে সৃষ্ট সাময়িক শূন্যতার সুযোগে প্রায় চোখের পলকে আদিল শাহ কর্তৃক তার সেনাপতি হিমুকে দিল্লি অভিমুখে প্রেরণ আর হিমু কর্তৃক দিল্লি একরকম প্রায় বিনা বাধায় দখল করে নিয়ে নিজেকে রাজা ঘোষণা প্রদানের ঘটনা।

হিমু কিংবা তার প্রভু আদিল শাহই কেবল নন, এদের বাইরে আরও অনেকেই দিল্লির মসনদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, সুযোগ পেলেই তারাও এ মসনদের দিকে হাত বাড়াবে, তা এক প্রকার নিশ্চিত।

অতএব তাদেরও একটা শিক্ষা দিতে হবে, তারা যেন নতুন ও শিশু এই মোগল রাষ্ট্রটিকে খাটো করে দেখার ও এর দিকে হাত বাড়াবার সাহস না করে, সেটা নিশ্চিত করতেই এ প্রোপাগান্ডার প্রয়োজন ছিল।

অন্তত প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ বৈরাম খান তেমনটাই মনে করেছিলেন। তাই তিনি হিমুকে বধ করিয়ে সেখানেই ক্ষান্ত হলেন না। হিমুর কর্তিত মাথাটা কাবুলে এবং হাঁটুর নিচ থেকে কাটা তার পা জোড়া দিল্লির বাজারে প্রকাশে টাঙ্গিয়ে রাখলেন, প্রদর্শনের জন্য। দিল্লির মসনদের দিকে হাত বাড়াবার সাহস করলে তার পরিণতি কেমন হবে, সেটা সকলে দেখুক!

যা হোক, আকবর তার কিশোর বয়সে এরকম একটা রক্তাক্ত ও তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা কোনদিনও ভুলে যাননি। এর মানে এই নয় যে আকবর তার পরবর্তী জীবনে রাগ বা ক্ষোভ কিংবা প্রতিহিংসায় কোনোরকম হত্যাকাণ্ড ঘটাননি। তিনি এরকম, এমনকি, এর চেয়েও জঘন্য ঘটনা ঘটিয়েছেন।

সেটা আমরা পরে দেখবো ইতিহাসের পাতা থেকে। কিন্তু বৈরাম খান কিশোর আকবরের মনে আজ যে অপ্রীতিকর একটা অভিজ্ঞতার বীজ রোপণ করে দিলেন এর মূল্য তাকে আর মাত্র কয়েকটা বছর পরে, একটি মাত্র দশক পেরোবার আগে নিজের জীবন দিয়েই দিতে হবে।

আমাদের সমাজে প্রচলিত অনেক ইতিহাস গ্রন্থেই আকবরকেই বৈরামের মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হয়। বলা হয়ে থাকে যে, আকবর বৈরাম খানকে তার প্রধান পরামর্শদাতার পদ থেকে বরখাস্ত করেন এবং তাকে হজ্জে যেতে বলেন। বৈরাম খান যথাসময়ে হজ্জে রওয়ানা হন, আকবর তার পিছু পিছু নিজের গুপ্তচর পাঠান, কেউ কেউ বলেন, তিনি বৈরামকে হত্যা করার জন্য ঘাতক পাঠান, পথিমধ্যে বৈরাম খানকে হত্যা করা হয়।

প্রকৃত ঘটনা সেটা নয়। বৈরাম খান ছিলেন একজন শিয়ামতাদর্শী পারসিক মুসলমান। তার বাবা সাইফ আলি বেগ এবং দাদা জান আলি বেগ উভয়েই সম্রাট বাবরের বাহিনীতে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে চাকরি করেছেন। তার বাবার দাদা, পীর আলি বেগ ছিলেন সম্রাট বাবরের স্ত্রী পাশা বেগমের ভাই, অর্থাৎ তার শ্যালক।

বৈরামের নাম ছিল বৈরাম বেগ। মাত্র ষোলো বছর বয়সে তিনি সম্রাট হুমায়ুনের সাথে যোগ দেন। হুমায়ুনের প্রতিটি সামরিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপে বৈরাম ছিলেন তার সহযোগী। বিশেষ করে, তার প্রথম দিকের সামরিক অভিযানে বৈরাম অত্যন্ত সাহসের সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করেন। হুমায়ুন কর্তৃক হৃত সিংহাসন পুনরুদ্ধারে বৈরামের অবদান অনস্বীকার্য। কান্দাহার দখলের ক্ষেত্রে বৈরাম খানকেই একক কৃতিত্ব দেয়া উচিত।

হুমায়ুন তার শাসনক্ষমতার একেবারে প্রথম দিকে ১৫৩৫ খ্রিষ্টাব্দে, নব্য প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে সংহত করতে গুজরাটের সুলতান বাহাদুরের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন, তখন বৈরাম খান তার সাথে ছিলেন, আবার পুবের দিকে বিহারে শের শাহের বিরুদ্ধে পরিচালিত সামরিক অভিযানেও বৈরাম তার পাশে থেকে প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন।

তার প্রতি বৈরামের এই যে একনিষ্ঠ সেবা ও কর্মদক্ষতা, এসবে সন্তুষ্ট হয়েই তিনি বৈরাম বেগকে 'খান ই খানান' উপাধিতে ভূষিত করেন। সেই থেকে 'বৈরাম বেগ' ইতিহাসে 'বৈরাম খান' হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছেন।

হুমায়ুন আমৃত্যু বৈরামকে মূল্যায়ন করেছেন তার বিশ্বস্ততা ও চৌকস সামরিক জ্ঞান আর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কারণে। এমনকি, নিজের মৃত্যুর মাত্র দুই মাস আগে তিনি এই বৈরামকেই নিজ পুত্র তেরো বছর বয়সী কিশোর আকবরের অভিভাবক নিযুক্ত করে যান।

আকবর এখন আঠারো বছরের যুবক সম্রাট। তার সভাসদ পরিষদ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্দর মহলে; হেরেমে যেমনি যোগ হয়েছে মারাঠা, রাজপুত হিন্দু নারী, তেমনি তার পরিষদের হিন্দু, শিয়া ও সুন্নি মুসলমান পরামর্শদাতাও এসে ভিড়েছেন।

এরমধ্যে রয়েছেন ফৈজি, আবু ফজল, এই দুই ভাইয়ের বাবা শেখ মুবারাক, সুন্নি পণ্ডিত বাদাইউনীসহ আরও অনেকে। রাজনৈতিক বা আদর্শিক বা মতাদর্শ কারণে এদের অনেকেই বৈরাম খার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন। তারাই আকবরকে বৈরামের প্রতি বিরক্ত করে তুলেছেন।

এর পেছনে বৈরামের যে আদৌ কোনো দায়ভার ছিল না, ব্যাপারটা তেমনও নয়। বৈরাম ক্রমাগতভাবে অধিক মাত্রায় কর্তৃত্বশীল হয়ে উঠছিলেন আর ওদিকে আকবর বয়স ও অভিজ্ঞতা বাড়ার সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই নিজের রাজ্য শাসনব্যবস্থা নিয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠছিলেন। আকবরের এই পরিবর্তনটাকে যথাসময়ে বুঝে উঠতে পারেননি বৈরাম খাঁন।

দিল্লি হারিয়ে বাবা হুমায়ুন যখন পাঞ্জাব, কান্দাহার আর হেরাতে সাহায্যের জন্য উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ঠিক তখন প্রতিবেশী পারস্য সাম্রাজ্যের শাহ তেহমাসাব-এর কাছে হুমায়ুনকে সদলবলে নিয়ে গেলেন বৈরাম খাঁন।

শাহ তেহমাসাবের চাচা শাহ ইসমাইলের কাছেও এসেছিলেন হুমায়ুনের বাবা সম্রাট বাবর। ভাগ্যের কি খেলা, বাবরও এসেছিলেন এরকমই রাজ্যহারা হয়ে সাহায্যের আশায়!

শাহ ইসমাইল বাবরকে সাহায্য করার জন্য মুখিয়ে ছিলেন! তবে বিনা শর্তে নয়। তার তিনটি শর্ত ছিল। তিনি এক এক করে বাবরের কাছে পর পর তিনটিই শর্তই উপস্থাপন করেছিলেন। নিরুপায় বাবর কান পেতে শর্তগুলো শুনেছেন।

নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারেন নি সেদিন! সাহায্যের নামে এমন অবমাননাকর শর্ত শাহ ইসমাইল তাকে দিতে পারেন, ভেবে তিনি অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু সে যুগের সম্প্রসারণবাদী রাজনীতিতে এরকম বিস্ময়াভিভূত হয়ে বসে থাকার কোনো উপায় ও সুযোগ ছিল না কারো জন্যই।

বাবরকে রাজি হতেই হয়েছিল, অন্ততপক্ষে মুখরক্ষার জন্য হলেও। কি ছিল

শাহ্ ইসমাইলের পক্ষ থেকে বাবরের কাছে উপস্থাপিত শর্তগুলো? শর্ত ছিল মাত্র তিনটি।

এক-বাবরকে শিয়া মতাদর্শে দীক্ষা নিতে হবে এবং শিয়াদের পরিচিতিমূলক বিশেষ পোশাক ও পাগড়ি পরিধান করতে হবে।

দুই-রাজ্য পুনরুদ্ধারের পরে বাবরকে তার রাজ্যে শাহ্ ইসমাইলের নামে মুদ্রা ও খুতবা চালু করতে হবে এবং

তিন-সুন্নিদের প্রভাব খর্ব করতে হবে।[১৪]

শর্ত না মেনে বাবরের কোনো উপায়ই ছিল না। তিনি খুব ভালো করেই জানতেন, নিজের পায়ে হেঁটে এসে তিনি বাঘের গুহায় উপস্থিত হয়েছেন। শাহ্ ইসমাইলের শর্ত না মানলে তিনি এখান থেকে বেরুতে পারবেন না। শর্তগুলো মেনে নিলেন। কথামত সামরিক সাহায্য পেলেন এবং যথাসময়ে সমরখন্দ পুনরুদ্ধারও করলেন।

কিন্তু বাবর চুক্তির শর্ত মত সুন্নি আলেমদের হত্যা করতে অস্বীকার করলেন। ফলে শাহ্ ইসমাইল স্থানীয় উবজেকদের উসকে দিয়ে বিদ্রোহ করালেন ও তাদের সবরকম সামরিক সহায়তাও দিলেন। বাবর আবার রাজ্য হারা হয়ে রাতের আঁধারে কেবলমাত্র প্রাণটা নিয়ে পালিয়ে এলেন কাবুলে।

অত্যন্ত বুদ্ধিমান বাবর কাবুলে এসে আশ্রয় নিলেও পরবর্তীতে তার নজর ফিরিয়েছিলেন ভারতের দিকে। এই নজর ফেরানোই তার ভাগ্য বদলে দিয়েছে চিরদিনের মতো। রচিত হয়েছে সফলতার এক অনন্য ইতিহাস; মোগল সাম্রাজ্য।

শাহ্ তেহ্মাসাবও রাজ্যচ্যুত হুমায়ুনকে সাহায্য করতে মুখিয়ে ছিলেন। পারস্য সীমান্তে প্রবেশ করার পর থেকেই হুমায়ুনকে সবরকম নিরাপত্তা ও তার বহরের সকল প্রয়োজন তিনি মিটিয়েছেন। হুমায়ুনকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শিয়া ইমামদের মাজারসহ অন্যান্য দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখিয়েছেন।

তিনি খুব ভালো করেই জানতেন হুমায়ুন আপাদমস্তক একজন সুন্নি মুসলমান। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? হুমায়ুন তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত যে দূতকে সাথে করে এনেছেন, সেই বৈরাম খান একজন কট্টর শিয়া এবং পারসিক বংশোদ্ভূত।

এখানেই শেষ নয়, হুমায়ুনের স্ত্রী হামিদা বানুও একজন শিয়া। বাবরের অপর পক্ষের সন্তান, হুমায়ুনের বৈমাত্রেয় ভাই হিন্দালের গৃহশিক্ষক শেখ আলি আকবরের মেয়ে।

শেখ আলি আকবর কর্তৃক হিন্দালের সৌজন্যে আয়োজিত এক পার্টিতেই

হুমায়ুন চৌদ্দ বছরের অনিন্দ্য সুন্দরী কিশোরী হামিদা বানুকে সর্বপ্রথম দেখেন। সেই প্রথম দর্শনেই তার ভালো লেগে যায়। সেখান থেকেই তাকে বিয়ে করেন রাজ্যহারা থাকাবস্থাতেই, সেটা সেই ১৫৪১ সালের কথা।[১৫]
এরপরের বছর, ১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দে অক্টোবরের ১৫ তারিখ রাজ্যহারা থাকাবস্থাতেই পাঞ্জাবের ওমরকোটে তাদের প্রথম পুত্র, ভবিষ্যতের মোগল সম্রাট আকবরের জন্ম।
শিয়া মতাদর্শী হওয়ার পরেও স্ত্রী হিসেবে এবং বৈরাম খাঁনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পেতে হুমায়ুনের কোনো অসুবিধা হয়নি। এটা ভেবেই শাহ তেহমাসাব আশাবাদী হয়ে ওঠেন।
অতএব সাহায্য প্রদানের বিনিময়ে তারও সেই একই শর্ত, হুমায়ুনকে শিয়ামতাদর্শ গ্রহণ করতে হবে প্রকাশে ঘোষণা দিয়ে এবং মোগল ভারতে শিয়া মতবাদকে ছড়িয়ে দিতে হবে।
শিয়া মতবাদ নিয়ে, তথা শিয়া মতবাদ ছড়িয়ে দিতে পারস্যের একটা গোষ্ঠী এই যে এতটা উদগ্রীব, এতটা নিবেদিতপ্রাণ এবং তৎপর তার রেশ এবং ফলাফল কিন্তু সুদূরপ্রসারী বলে প্রমাণিত হবে ভবিষ্যতে।
মোগল সাম্রাজের একেবার সূচনালগ্নে হেরেমে শিয়াবাদের এই অনুপ্রবেশ এই সাম্রাজ্যের খোলসটাই কেবল বদলে দেবে না, বদলে দেবে ভারতবর্ষে ইসলামি সাংস্কৃতির রূপ ও ধরনও! আমরা যথাস্থানেই সে বিষয়ে আলোকপাত করবো।

ছয়

যা হোক, মোগল রাজ দরবারে, তথা আকবরের সভাসদদের মধ্যে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী মতাদর্শীদের সংখ্যাবৃদ্ধির সাথে সাথে সেখানকার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পরিবেশ বিষিয়ে উঠতে থাকে। পারস্পরিক সম্পর্কও আন্তরিক হওয়ার পরিবর্তে স্বাভাবিকভাবেই অনাস্থা ও অবিশ্বাসের মধ্যে নিপতিত হতে শুরু করে।

রাজ্য ব্যবস্থা একক কর্তৃত্বশীল তথা ডিক্টেটোরিয়াল হওয়ার কারণে সকলেই সম্রাট আকবরের মনোসন্তুষ্টি অর্জনের দিকেই নিজেদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। নিজেদের সহযোগী কারো বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার উপায়ও ছিল এরকমই; অপছন্দনীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে সত্য মিথ্যা কথা লাগিয়ে বা সত্য কথাটারও বিকৃত ব্যাখ্যা করে সম্রাটের কান ভারি করা। সম্রাটকে যদি একবার কারো বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা যায়, তবেই কার্যসিদ্ধি হতো।

এরকম একটা আবহের মধ্যেই সবাই বাস করতো। আর এ আবহেই সময়ের পরিক্রমায় বৈরাম খান এককভাবেই কর্তৃত্বশীল এমনকি, রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যেতে থাকে। সে এক আকবর ছাড়া আর কাউকেই ধর্তব্যের মধ্যে আমলে নিতো না। এমনকি, সম্রাট আকবরও অনুযোগ করতেন বৈরাম খানের কাছে, তার নিজস্ব ভৃত্যরা বৈরাম খানের ব্যক্তিগত ভৃত্যদের চাইতে কম সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে, এ মর্মে।[১৬]

বৈরাম খাঁন এতটাই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন যে, হেরেমের ভেতরে ও বাইরে, এমনকি, রাজদরবারেও যে তার বিরোধীদের সংখ্যা ও প্রভাব বেড়েই চলেছে, সে বিষয়টি নিয়ে একেবারে উদাসীন থেকেছে বা তোয়াক্কাও করেনি। মোগল সাম্রাজ্য তখন ক্রমবর্ধনশীল। এর পরিধি যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে এর অভ্যান্তরীণ অবকাঠামো। এক এক করে গড়ে উঠছে প্রশাসনের চেইন অব কমান্ড। অর্থব্যবস্থা, কর আদায়ের সিস্টেম, ভূমি ব্যবস্থা, অভ্যান্তরীণ নিরাপত্তা সিস্টেম, সামরিক বিভাগসহ সাম্রাজ্যের বুনিয়াদি দিকগুলো গড়ে উঠতে শুরু করেছে, একটা সুষম ও স্থায়ী অবয়ব পেতে শুরু করেছে। বাবা হুমায়ুন ও দাদা বাবর এগুলো করে যাবার মত পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ পাননি। সন্তান আকবর সেটা করছেন। আর এসবের পেছনে বৈরাম খান অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নিজের মেধা ও শ্রম দিয়ে চলেছেন। আগেই বলেছি, পার্শ্ববর্তী পারস্য সাম্রাজ্যের ক্ষমতায় তখন এমন একটা গোষ্ঠী উপবিষ্ট, যাদের মন মানসিকতায় একটি মাত্র লক্ষ্যই বিদ্যমান, আর সেটি হলো, পারস্যে কট্টর শিয়ামতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সেই

একই মতবাদ আশপাশের এলাকাগুলোতে, পারলে সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়া। বৈরাম খান নিজেও ছিলেন একজন পারসিক এবং কট্টর শিয়া মতাদর্শী একজন। ভাগ্যের সন্ধানে এসেছেন ভারতে। তারও মনে যে শিয়া মতাদর্শকে ছড়িয়ে দেয়া এবং প্রতিষ্ঠিত করার গোপন ইচ্ছা লুক্কায়িত নেই, তা কি করে জানা যাবে?

ইতিহাসে বৈরাম খানের মনে এমন ইচ্ছা লুক্কায়িত ছিল, সেটা প্রমাণ করার কোনো তথ্য আমাদের জানা নেই। তাই, আমাদেরকে নির্ভর করতে হবে বাস্তবে ঘটে যাওয়া ঘটনা, তার পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটগুলোকে।

বৈরাম খান সাম্রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ, প্রধান মুফতি হিসেবে নিয়োগ দিলেন শেখ গদাই নামক একজন পারসিক শিয়ামতাদর্শীকে।[১৭]

এই গদাই শেখ ছিলেন প্রচণ্ড সুন্নি বিরোধী। এ বিষয়টি নিয়ে আকবরের সভাসদ পরিসরে বিদ্যমান সুন্নি আলেমদের মধ্যে যেমন, তেমনি পুরো প্রশাসনে সুন্নি মতাবলম্বীদের মধ্যে এক দারুণ ক্ষোভ দেখা দিল। এর পাশাপাশি তার হিন্দু সভাসদ ও আমির ওমরাহগণও অসন্তুষ্ট, কারণ, শেখ গদাই ভারতীয় নন, একজন বহিরাগত, ইরানি। কিন্তু বৈরাম খাঁন এতটাই আত্মপ্রত্যয়ী যে, কারো কোনো ধরনের বিরোধিতাকে আমলে নেবার মত মানসিক অবস্থা তখন তার নেই।

বৈরামের প্রতি চূড়ান্ত ও মারাত্মক চ্যালেঞ্জটি এ সময়ই এলো। এলো অপ্রত্যাশিতভাবে। তবে তা রাজসভার কোনো সভাসদ বা জেনারেল বা বৈরাম বিরোধী কোনো ওমরাহের পক্ষ থেকে নয়, বরং তা এলো একেবারে অন্দর মহল থেকে।

আকবরের এক ধাত্রী মা ছিলেন মাহাম আগা বেগম। তিনিই ছিলেন প্রধান ধাত্রী। আকবর শৈশবে এই ধাত্রীর দুধ পান করেছেন। তার ছেলে আদম খান আকবরের সমবয়স্ক এবং খেলার সাথী। এই আদম খান যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যন্ত সাহসী ছিল। কিন্তু একই সাথে সে ছিল অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ধূর্ত, কর্কশভাষী, নৃশংস প্রকৃতির ও দুশ্চরিত্রসম্পন্ন একজন ব্যক্তি।

অনেকদিন দুধ মা মাহাম আগার সাথে আকবরের দেখা হয়নি। তিনি আকবরকে দিল্লি যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালে আকবর সে আমন্ত্রণ রক্ষার্থে দিল্লি গেলেন। সেটা ছিল ১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসের ঘটনা। বৈরাম খান রয়ে গেলেন ফতেহপুর সিক্রিতে। [১৮]

দিল্লিতে আকবরকে একা পেয়ে মাহাম আগ ও আদম খান; মা ও ছেলে আকবরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন বৈরাম খানের ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিপত্তির দিকটি। আর এ বিষয়টা যদি এভাবে বাড়তে থাকে,

এখনই যদি তার রশি টেনে ধরা না যায়, তা হলে ভবিষ্যতে খোদ আকবরের ক্ষমতার ভিতই নড়ে যেতে পারে। আকবরও গত কিছুদিন ধরে বৈরাম খানের বিষয়টা নিয়ে, তার একক প্রভাব, প্রতিপত্তি ও রাজ্য পরিচালনায় নিরংকুশ ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়টি নিয়ে মনে মনে এক ধরনের অস্বস্তিতে ভুগছিলেন।

তদুপরি অতি সম্প্রতি ফতেহপুর সিক্রিতে প্রধান মুফতি হিসেবে বহিরাগত একজন ইরানি, কট্টর শিয়ামতাদর্শী গদাই শেখকে নিয়োগ দেয়ার পর থেকে অন্যান্য সভাসদগণও আকবরের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন বৈরাম খানের ব্যাপারে। ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথাই বলার চেষ্টা করেছেন।

আকবরের বয়স এখন সতেরোর মাঝামাঝি। তিনি সেই শৈশব থেকেই রাজ্য পরিচালনা দেখে আসছেন খুব কাছে থেকেই। ভালো মন্দ বুঝতে শিখেছেন। তা ছাড়া তার বাবা হুমায়ুন ও দাদা মহান বাবরের রক্ত বয়ে চলেছে তার শিরায় শিরায়। রাজ্য বিজয় ও পরিচালনা, প্রশাসনে নিয়ন্ত্রণ করা তো রক্তসূত্রেই তিনি পেয়েছেন।

এখনই তিনি যদি শক্ত হাতে রাজ্যের হাল একক কর্তৃত্বে না নেন, তা হলে বলা যায় না ক্ষমতার রশি কখন কোন দিকে হেলে পড়ে! আকবর তাদের কথায়, বিশেষ করে, দাঈ মা মাহাম আগার কথায় গলে পড়লেন।

আসলেই তিনি তো এখন পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষ, তিনি নিজেই রাজ্য পরিচালনায় সক্ষম, অতএব তা নিজের হাতে রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতা নেয়া এবং রাজ্য পরিচালনায় নিরংকুশভাবে কর্তৃত্বশীল হওয়া উচিত। দিল্লিতে থাকতেই আকবর বৈরাম খানকে তার প্রধানমন্ত্রী ও অভিভাবক পদ থেকে বরখাস্ত করে একটা ফরমান জারি করে পাঠালেন।[১৯] বৈরাম খাঁর জন্য বিষয়টা ছিল একেবারে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত একটা ঘটনা। দিল্লি কিংবা ফতেহপুর সিক্রিতে বৈরাম বিরোধী শিবিরে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। আনন্দে তারা ফেটে পড়ার উপক্রম!

আকবর তার দীর্ঘদিনের ওস্তাদ ও অভিভাবক বৈরাম খানকে মক্কায় হজব্রত পালন করতে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। আর এর জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত অর্থও বরাদ্দ করতে বললেন তার অর্থ বিভাগকে। সেকালে কোনো আমির ওমরাহ বা সভাসদকে হজ করতে যেতে বলার অর্থ ছিল তাকে নির্বাসনে পাঠানো।

এটা করা হতো রাজা বা বাদশাহ যদি বরখাস্তকৃত ব্যক্তিকে দয়াপরবশ হয়ে কয়েদখানায় বন্দী করতে বা আরও বড় শাস্তি; মৃত্যুদণ্ড দিতে না চাইতেন, সে ক্ষেত্রেই কেবল। বৈরাম খান অপ্রত্যাশিতভাবে বরখাস্তের আদেশ পেয়ে

যার পর নাই বিস্মিত ও দুঃখিত হলেন। তিনি আকবরের সাথে একবার দেখা করতে চাইলেন, কিন্তু দেখা করার অনুমতিটুকুও মিললো না। এতে করে তিনি আরও বেশি মর্মাহত হলেন। বৈরামের ঘনিষ্ঠমহল তাকে উসকে দিতে চাইলো, তারা সে রকম সব ধরনের চেষ্টাও করে চললো। কিন্তু বৈরাম আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে অস্বীকার করে মক্কার পথ ধরলেন।

এরমধ্যে আকবর ও তার ধাত্রী মা মাহাম আগা নিশ্চিত ছিলেন না, বৈরাম খান কি পদক্ষেপ নেবেন বা নিতে পারেন। মাহাম আগার পরামর্শে আকবর বৈরাম খার ভারত ছেড়ে যাওয়াটা নিশ্চিত করতে একটা সেনাদল পাঠালেন। বৈরাম খান আকবরের এই পদক্ষেপে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে এবারে এই সেনাদলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন।

এর ফলে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়লো। বৈরাম খান কৃতজ্ঞতাবোধ হোক বা অভিমানবশত হোক এই সংঘাতটাকেই এড়িয়ে যেতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু মাহাম আগা ও তার পুত্র আদম খানের পরামর্শে হোক বা আকবরের নিজের একক সিদ্ধান্তেই হোক তিনি তার নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারলেন না। প্রলুব্ধ, ক্ষুব্ধ ও অপমানিত বৈরাম খাঁন সম্রাট আকবরের পাঠানো সেনাদলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরলেন। পরিস্থিতি সংঘাতমুখর হয়ে উঠলো।

ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! আকবরের সেনাদল বৈরামের মুখোমুখি হয়ে পড়লো। বৈরামের একক কোনো শক্তি ও রসদ ছিল না। এতদিন তিনি প্রতাপ ও প্রতিপত্তির সাথে রাজ্য শাসন করেছেন, করেছেন মোগল সম্রাট আকবরের পক্ষেই। ফলে এবারে তিনি সেই মোগল বাহিনীরই বিরোধীপক্ষ হিসেবে নিজেকে দেখতে পেলেন! নিজের হাতে গড়া মোগল সাম্রাজ্য ততদিনে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈরাম খান যোগ্য লোক বসানোর চেষ্টা করেছেন। একটি উদীয়মান শক্তির পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত, এমনকি আশাতীত সুযোগ সুবিধা পেয়ে পুরো ভারতবর্ষ, আফগানিস্তান, সমরখন্দ, তুরস্ক, এমনকি, ইউরোপ থেকেও ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়ে আসা দক্ষ লোকজন এসে জুটেছে। দক্ষতা, শক্তি ও অভিজ্ঞতার চমৎকার সংমিশ্রণে মোগল বাহিনী তখন দুর্জেয় হয়ে ওঠার পথে। নিজ হাতে গড়া এই মোগল বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে বৈরাম টিকতে পারেন নি। ধৃত হয়ে আকবরের সামনে বন্দী অবস্থা তাকে আনা হয়।

আমি আগেই বলেছি, আকবরের মনটা কোমল ও উদার ছিল। সে কোমল মনের প্রকাশ, তার মনের গভীর লুক্কায়িত মানবিক দিকটির প্রকাশ আমরা আবারও দেখতে পাই এখানে, বন্দী বৈরামের প্রতি তার কৃত আচরণের ক্ষেত্রে। সতেরো বছরের সম্রাট আকবরের সামনে তারই অভিভাবক, নিজ

পিতার বিশ্বস্ত বন্ধু ও সহকর্মী বৈরাম খাঁন শৃঙ্খলিত অবস্থায় উপস্থিত! এই সেই বৈরাম খাঁন যিনি কিশোর আকবরকে বাবা হুমায়ুনের মৃত্যুর পর থেকে প্রতিটি পদে পদে দেশ, প্রশাসনের খুঁটিনাটি শিখিয়েছেন, শিখিয়েছেন যুদ্ধের কলাকৌশল ও সমকালীন সমাজের কুটিল কূটনীতির সূক্ষ্ম দিকগুলো। বহুদিন, বহুরাত ওস্তাদ বৈরাম খাঁনের সাথে আকবরের কেটেছে জীবনের নানা দিক শিখতে শিখতে। জন্ম থেকে বাবা হুমায়ুনের সাহচর্য পাননি বেশি দিন, কত দিন পেয়েছেন সে কথা তার মনে নেই, কিন্তু বিগত চারটা বছর একাধারে যার ছায়া তাকে একটা দিনের জন্যও ছেড়ে যায়নি, সেই বৈরাম খান আজ শৃঙ্খলিত অবস্থায়, বিদ্রোহী, রাষ্ট্রদ্রোহী অবস্থায় তার সামনে পড়ে আছে! এমন দৃশ্য দেখে আকবরের দুই চোখ ভিজে উঠলো।

সাত

হায়রে ক্ষমতা! হায়রে মসনদের মোহ!! আকবর আজ যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন, এর চেয়েও ঢের করুণ ও অপমানকর পরিস্থিতির মুখোমুখি তিনি হবেন তার পরবর্তী জীবনে, হবেন নিজ আত্মজদের পক্ষ থেকেই। সেটা তো ভবিষ্যতের কথা। সতেরো বছর বয়সী আকবরের সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই। তিনি বরং এ অবস্থায়, বিশেষ করে, তার সামনে নিজের প্রিয় ওস্তাদ বৈরাম খাঁনের এই করুণ দশা দেখে দুঃখ, ক্ষোভ আর অনুশোচনায় তপ্ত হতে থাকলেন।

বৈরাম খাঁনের পেছনে পেছনে মোগল বাহিনী পাঠিয়ে কাজটা যে ভালো করেননি, এতক্ষণে মর্মে মর্মে সে উপলব্ধি তার হলো। দাঈ মা মাহাম আগার দাওয়াত গ্রহণ না করলেও ভালো করতেন তিনি!

আকবর বৈরামের প্রতি সর্বপ্রকার শৈথিল্য ও সম্মান প্রদর্শন করলেন। নিজ হাতে তার বাঁধন খুলে দিয়ে নিজের পাশে বসিয়েছেন। দুঃখ প্রকাশ করে তাকে মক্কায় যাওয়ার অনুরোধ করে মুক্তি দিয়েছেন। পারস্পরিক সম্পর্ক এমন একটা পর্যায়ে পৌছে গেল যে, বৈরাম বা আকবর কেউই আর এটা মনে করেননি, তারা আবার একত্রে দেশ শাসন করতে পারবেন।

আকবরও চাননি বৈরাম আবার তার পূর্ব পদে ফিরে আসুক, বৈরাম নিজেও এটা খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন, সাম্প্রতিক এই বিদ্রোহের ঘটনায় উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার দেয়ালটা এমনভাবে ধ্বসে গেছে যে, তা আর জোড়া দেয়া যাবে না। তা ছাড়া, আকবর এখন একজন পূর্ণবয়স্ক, সক্ষম পুরুষ এবং সম্রাট, যিনি তার রাজ্যের সমস্ত কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিতে আগ্রহী। এখানে আর যাই হোক, আকবর নিজে না চাইলে বৈরামের আর কোনো স্থান নেই। অতএব নতুন এ পরিস্থিতিকে বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়াটাই সম্মানজনক হবে।

বেশি ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন পড়লো না। বৈরাম নিজের ভাগ্যকে মেনে এক আবেগঘন পরিবেশে বিদায় নিয়ে মক্কার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। হুমায়ুন থেকে আকবর ইতোমধ্যে প্রায় দুই দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। মোগল সাম্রাজ্য ক্রমবর্ধমান। এর পরিধি, এর আয়তন ও প্রভাব বেড়েই চলেছে। এই যে বৃদ্ধি, এর পেছনে বাবরের পরে সবচেয়ে যার শ্রম, বুদ্ধি আর কৌশল তথা অবদান রয়েছে, তিনি হলেন বৈরাম খাঁন। বাবা হুমায়ুন নিযুক্ত আকবরের অভিভাবক। হুমায়ুন বা আকবর, পিতা-পুত্র উভয়ের পক্ষ হতে পরিচালিত প্রতিটি সামরিক অভিযানের মূল পরিকল্পক ছিলেন বৈরাম খাঁন। আকবরের সময়ে পরিচালিত প্রতিটি যুদ্ধে সম্মুখ সমরে

নেতৃত্বও দিয়েছেন তিনি। অত্যন্ত দক্ষ সমরবিদ ও কূটনীতিবিদ হিসেবেও তার জুড়ি মেলা ভার ছিল। সঙ্গত কারণেই তার দুশমনেরও অভাব ছিল না। প্রতিটি পরাজিত পক্ষের ক্ষোভ ছিল তার ওপর। কাজেই তাদের সকলেরই সহজ টার্গেটও ছিলেন তিনি। মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে বৈরাম খান গুজরাট রাজ্যের অতি প্রাচীন নৌবন্দর; খাম্বাত-এর দিকে যাচ্ছিলেন, সেখান থেকে তিনি জাহাজ ধরবেন আরব সাগর পাড়ি দেয়ার জন্য। পথিমধ্যে এক যাত্রাবিরতিতে তিনি থামলেন আধুনিক গুজরাটের অতি পুরাতন ও ঐতিহাসিক শহর পাটান বা পতোলাতে। এখানেই তিনি একদিন একটি পুরনো দুর্গ ঘুরে ফিরে দেখছিলেন। আর এখানে তার উপরে নজর পড়ে এক আফগান সৈন্যের। উক্ত আফগান সৈন্যের বাবা এই বৈরাম খাঁনের প্রতিপক্ষ বাহিনীর একজন সৈন্য হিসেবে যুদ্ধ করতে গিয়ে তার হাতে নিহত হয়।

আফগান এত সহজে এবং এমন অপ্রত্যাশিতভাবে বৈরামকে হাতের নাগালে পেয়ে যাবে তা কল্পনাও করতে পারেনি। দেরি না করে সে একেবারে অপ্রস্তুত বৈরামের উপরে খোলা তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে হত্যা করে। দিনটি ছিল ৩১ শে জানুয়ারি ১৫৬১ সাল, শুক্রবার।[২০]

ওইদিকে বৈরাম খাঁনকে এমন অপ্রীতিকর অবস্থায় সম্রাট আকবরের মুখোমুখি করতে পারাটা নিজেদের বিরাট সাফল্য হিসেবে ভেবে পুলকিত হচ্ছেন। তারা কল্পনাও করতে পারেনি, তাদের নিজেদের ভাগ্যে কি করুণ পরিণতি অপেক্ষমান!

বৈরামের মৃত্যুর খবর আকবরকে মর্মাহত করলো। তিনি তার ওস্তাদের এমন করুণ পরিণতিতে খুবই দুঃখ পেলেন। অপরদিকে মাহাম আগা ও তার ছেলে, আকবরের দুধ ভাই, শৈশবের খেলার সাথী এবং বন্ধু আদম খাকে করলো আনন্দে আটখানা।

হেরেমে মাহাম আগা ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী নারী। আকবর তাকে অত্যন্ত সমীহ করতেন। বৈরামের মৃত্যুর পরে মাহাম আগা আকবরের আরও কাছাকাছি চলে আসলেন। প্রায় সব বিষয়েই তিনি মাথা ঘামাতে লাগলেন।

ভারতের আধুনিক রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ; দুই রাজ্যের অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত মালওয়া নামক রাজ্যের রাজা বাজ বাহাদুর (তার আসল নাম ছিল মিয়া বায়েজিদ, সুলতান শুজাআত খাঁর পুত্র) ছিলেন সমসাময়িক ভারতে তার বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ আচরণের জন্য কুখ্যাত। এক হিন্দু রক্ষিতা রূপমতির সাথে তার প্রেম ও তাকে কেন্দ্র করে লেখা গান, কবিতা, শ্লোক

তখন ভারতের প্রায় প্রতিটি ঘরে ঘরে, প্রতিটি লোকের মুখে মুখে।

রাজ্য পরিচালনায় তার কোনো মনোযোগ নেই, সারাদিন, সারাটাক্ষণ সে বুঁদ হয়ে থাকতো সুরা পানে, সাকির সান্নিধ্যে। নিজে গাইতে পারতো, গানের গলাও ছিল চমৎকার। তার কণ্ঠ আর রূপমতির নাচ, দু'জনের অভিসার চলছিল সমান তালে।

নিজ রাজ্যসীমানার বাইরে আশপাশে কোথায় কি ঘটছে, সে সব আকবরের নজরের আড়ালে ছিল না। তিনি মালওয়ার দুর্বল প্রতিরক্ষা ও রাজার প্রতি সাধারণ জনগণের অনাস্থা বিষয়ে সম্যক অবহিত ছিলেন। অতএব এই সুযোগ, এখনই মোক্ষম সময়। তিনি সেখানে সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।

সেই বাহিনীর নেতৃত্ব দেবে তারই দুধমাতার সন্তান আদম খান, আর তাকে সহায়তা করবে অপর আফগান সেনাপতি পীর মুহাম্মদ। সেটা ছিল ১৫৬১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কথা।

বাজ বাহাদুর যুদ্ধ করার মতো মানসিক শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিল না, সে ছিল নিখাদ ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ভোগবিলাসী নারীলোলুপ দুর্বলচিত্তের একজন লোক। মোগল বাহিনী আসার খবর শুনেই সে রাজমহল ছেড়ে পালিয়ে যায়। যাওয়ার আগে অবশ্য তার প্রহরীদের নির্দেশ দিয়ে যায়, হেরেমে সকল সুন্দীরদের যেন হত্যা করা হয়, কোনোমতেই যেন তারা আকবরের হাতে না পড়ে।

তাই করা হয়, সকল সুন্দরী ও যুবতী নারীদের হত্যা করা হয়। বাজ বাহাদুরের প্রধান রক্ষিতা রাজপুত রূপমতি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে, মৃত্যু না হওয়ায় আহতাবস্থায় বন্দী হলেও পরে সে বিষ পানে আত্মহত্যা করতে সক্ষম হয়। [২১]

আদম খাঁন ও পীর মুহাম্মদ প্রচুর ধন-সম্পদ হস্তগত করে। উচ্চাভিলাষী আদম খাঁন এখানে এই পর্যায়ে এসে আরও একটা ভুল করে বসলো। সে নামমাত্র কিছু সম্পদ, কয়েকটা হাতি ও ক'জন সুন্দরী নারীকে মোগল রাজধানীতে পাঠালেও লুণ্ঠিত সম্পদের এক বিরাট অংশ নিজের জন্য রেখে দেয়। এর সাথে সাথে সে কয়েকজন সুন্দরী নারীকেও নিজের কাছে রাখে।

আদম খান আর তার সহযোগী সেনাপতি পীর মুহাম্মদ, দুজনে মিলে মালওয়াতে অহেতুক রক্তপাত ঘটায়। মালওয়ায় আত্মসমর্পণকারী বহু আমির-ওমরাহকে তারা দু'জনে মিলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। এদের অনেকেই ছিল মুসলমান আলেম এবং তারা কুরআন হাতে করে এসে আত্মসমর্পণ করে। [২২]

আকবর তার গোয়েন্দা মারফত সকল খবরই পেলেন। রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ থেকে শুরু করে কয়েকজন সুন্দরীকে কেন্দ্রের হেরেমে না পাঠিয়ে গোপনে নিজের বা নিজেদের জন্য রেখে দেয়া এবং আত্মসমর্পণের পরেও অহেতুক বেশ কিছু নিরস্ত্র মুসলমানকে হত্যা করায় আকবর প্রচণ্ডভাবে ক্ষেপে যান। কারো সাথে কোনো পরামর্শ না করেই মাত্র ছোট্ট একটা বাহিনী নিয়ে তিনি নিজেই মালওয়ার দিকে রওয়ানা দিলেন। এত দ্রুত এগিয়ে গেলেন যে, মাহাম আগা কিংবা আদম খানের গোয়েন্দারা খবর পৌঁছে দেয়ার আগেই মোগল সম্রাট আকবর স্বয়ং এসে হাজির! মাহাম আগা কিংবা আদম খান কেউই কিছু টের পাননি ঘুণাক্ষরেও! তবে মাহাম আগা ছেলে যে দুইজন সুন্দরীকে আকবরের কাছে না পাঠিয়ে নিজের জন্য রেখে দিয়েছে, সেটা জানতেন। জানতেন বলেই আকবর কিছু বুঝে ওঠার আগেই নিজের প্রহরীকে দিয়ে সেই দুইজন হতভাগিনীকে গোপনে হত্যা করিয়ে তাদের লাশগুলোও গুম করে ফেলেন।[২৩]

আকবরের সামনে মা ও ছেলের কোনো ওজর ছিল না, তারা নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে এ যাত্রা পার পেয়ে গেলেন। তবে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আকবর তার নিজের হাতে রাজ্যের সমস্ত কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা নিয়েছেন। তার চোখকে ফাঁকি দেয়াটা বড়ই কষ্টকর ও ঝুঁকিপূর্ণ হবে।

এ ঘটনায় আঠারো বছর বয়স না পেরোনো সম্রাট আকবরের চারিত্রিক কিছু দিক পরিষ্কার হয়ে যায়। আকবর ছোটকাল থেকেই ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, এক রোখা, আবেগী। কখনও কখনও তাকে গোঁয়ার গোবিন্দ ধরনের মনে হয়।

তিনি মূর্খ ছিলেন বটে, তবে বোকা ছিলেন না। যদিও আবুল ফজল তার আকবারনামা'য় আকবরকে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন বলে লিখেছেন। কিন্তু অতি তোষামুদে চরিত্রের আবুল ফজলের এ মন্তব্য সমকালীন কোনো ঐতিহাসিকই বিশ্বাসযোগ্য মনে করেননি। আকবরের পরবর্তী জীবনের কর্মকাণ্ড দেখেও সেরকম কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রখ্যাত এক পশ্চিমা ঐতিহাসিক John Keay তো আকবরকে Dyslexia রোগে আক্রান্ত রোগী বলে অভিহিত করেছেন।[২৪]

একটা জটিল মানসিক রোগের নাম 'Dyslexia'। জন্মগতভাবেই লেখাপড়া শিখতে অক্ষম। এ রোগে আক্রান্তরা লেখাপড়া শিখতে পারেন না। রোগটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবেঃ Dyslexia is a common learning difficulty that can cause problems with reading, writing and spelling. It's a "specific learning

difficulty", which means it causes problems with certain abilities used for learning, such as reading and writing. Unlike a learning disability, intelligence isn't affected. [২৫]
তবে মজার বিষয় হলো, এরা কিন্তু নির্বুদ্ধিসম্পন্ন হয় না। এদের বুদ্ধিমত্তা কখনও কখনও প্রখর হয়ে থাকে। আকবরের ক্ষেত্রেও আমরা এমনটাই দেখতে পাই।

কিশোর আকবর একাই পাগলা হাতির মুখোমুখি হয়েছেন সবাই যখন প্রাণভয়ে পালিয়ে বাঁচতে এদিক ওদিক ছুটছে। পাগলা হাতির সামনে পড়ে বীরবলের জীবন যখন সংকটাপন্ন, শত শত দর্শকদের মধ্যে থেকে কেউই যখন তার সাহায্যে এগিয়ে যাচ্ছে না, ঠিক তখনই সম্রাট নিজে ভিড়ের মধ্যে থেকে ছুটে গিয়েছেন একা, নাঙ্গা তলোয়ার হাতে। পাগলা হাতির মোকাবেলা করেছেন এককভাবে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে জীবন ফিরে পাওয়া সেদিনের কথা বীরবল আমৃত্যু স্মরণ রেখেছিলেন। আকবরের প্রতি আমৃত্যু কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ থেকেছেন।

একাই একবার বাঘের মুখোমুখি হয়েছেন নাঙ্গা তলোয়ার হাতে। বাঘ শিকার তার নেশা! দিনের পর দিন পড়ে থেকেছেন জঙ্গলে বাঘের সন্ধানে।

এটোয়া জেলার সাকিত মহকুমায় একবার শিকারে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রায় চার হাজার দুর্ধর্ষ ডাকাত বাহিনীর সামনে পড়ে গেলেন। কোন রকম সামরিক প্রস্তুতি ছিল না তার। একেবারেই অপ্রস্তুত! মাত্র শ' চারেক প্রহরী রয়েছে তার সাথে। দিল্লি থেকে সাহায্য চেয়ে পাঠাবেন, সে সময়ও এখন তার হাতে নেই। শ'চারেক সৈন্য নিয়ে চার হাজারেরও বেশি দুর্ধর্ষ ডাকাতের সামনে দাঁড়ানো মানেই হলো নিশ্চিত মৃত্যু! এখন কি করবেন তিনি? কোন পথে যাবেন?

আট

কিন্তু আকবর দমে যাওয়ার পাত্র নন। সামনে যখন এসেই পড়েছে, তিনি এদের মোকাবেলা করবেনই। যা হয় হোক। ছুটলেন ডাকাতদের সাথে লড়তে। আটঘেরায় পরাংক নামক একটা দুর্গকে দুর্ভেদ্য হিসেবে গড়ে তার ভেতরে আশ্রয় নিয়ে তারা লড়ে যাচ্ছে। আকবর একাই একটা হাতির পিঠে চড়ে এগিয়ে গেলেন, দুর্গের দরজা ভাঙতে। তিনি শেষ পর্যন্ত নিজের জীবনের পরওয়া না করেই সেদিন সেই দুর্গের দরজা ভেঙেছিলেন।[২৬]
ডাকাত দল পরাজিত হয়ে পালিয়েছিল সেদিন পেছনে শতশত সাথীর লাশ ফেলে রেখে।

আকবরের শৈশব, কৈশোর ও যৌবনে এরকম বেশ কিছু ঘটনা রয়েছে, যেগুলো দেখে তার দুর্দান্ত সাহস, চরম একরোখা ও গোঁয়ার গোবিন্দভাব ধরা পড়ে বটে, তবে তা আমাদেরকে আর একটা দিক চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। আর তা হলো সেই পশ্চিমা ঐতিহাসিক John Keay সম্ভবত ঠিকই বলেছেন। আকবরের চরিত্রের এই দিকটির বিচার ও বিশ্লেষণ শেষে যে সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হয়েছেন, তা সম্ভবত যথার্থ।

এর কারণ হলো, যারা এই রোগে আক্রান্ত থাকে, তারা তাদের কাজ কর্মের সাথে যে বিপদ ও ঝুঁকির সমূহ সম্ভাবনা থাকে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা যে মারাত্মকও হতে পারে, এই বাস্তবতাটাও তারা শিখতে বা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন। আকবরের জীবনে এরকম সব কাজকর্ম দেখে তেমনটাই মনে হয়।

রাজা ভগবান দাসের ভাতিজা জয়মলকে পাঠিয়েছিলেন বাংলাদেশে সামরিক অভিযানে। রাজপুত রাজা উদয় সিংহের মেয়ের সঙ্গে জয়মলের বিয়েতে যাবার জন্য উভয় রাজাই অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু আকবর যেতে পারেননি তার ব্যস্ততার কারণে। পরে এ নিয়ে জয়মল অনুযোগ করলে আকবর কথা দিয়েছিলেন বাংলা থেকে ফিরে আসো, তোমার বউকে দেখে আসবো। সেই জয়মল আর ফিরে এলো না। আকবরের নির্দেশে বাংলা অভিযানে গিয়ে সেখানেই সে মারা গেল। বেচারি তরুণী বউটার কপালই খারাপ! সে যুগের ভরিত, কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যা, মাত্র ষোলো বছর বয়সেই বিধবা হলো। সুন্দরী এই ষোড়শীকেই চিতায় তোলার আয়োজন হচ্ছে গোপনে। সমস্যা হলো, জয়মলের বিধবা বৌ কিছুতেই চিতায় উঠতে রাজি হচ্ছে না, তার একই কথা; আমার স্বামী মরেনি। তোমরা ভুল খবর শুনেছো। সে ঠিকই ফিরে আসবে দেখে নিও।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! ধর্ম রক্ষার্থে তারা এই মেয়েকে চিতায় পোড়াবেই। সব আয়োজনও সম্পন্ন। হেরেমে বিশ্রামরত আকবরের কানে খবরটা গেল

হেরেমেরই কোনো এক সুন্দরীর মাধ্যমে, গল্পচ্ছলে।

কোমলপ্রাণ আকবরের সামনে জয়মলের বিধবা বৌয়ের না দেখা মুখটা ভেসে উঠলো। কারো সাথে কোনো শলাপরামর্শ নয়, কাউকে না জানিয়েই মোগল সম্রাট আকবর একাই একটা ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছুটলেন। তিনি জানেন কোথায় তার হিন্দু প্রজারা সতীদাহের জন্য চিতা পোড়ায়, কোথায় শশ্মান, তিনি তা খুব ভালো করেই চেনেন।

দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এলেন সেখানে। মেয়েটাকে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে, যেন চিৎকার করতে না পারে, তার জন্য মুখে কাপড়ও গুঁজে দেয়া হয়েছে। অদূরেই চিতা জ্বলছে, খুব গোপনে আয়োজনকৃত এ অনুষ্ঠানে মাত্র কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন এসে উপস্থিত হয়েছে, তারাও ব্যগ্রতার সাথে কাজটা শেষ করে সটকে পড়ার চিন্তায় ব্যস্ত, তা না হলে আবার কখনও এই বেআইনি কাজটার কথা ফাঁস হয়ে যায়, কে জানে!

ঠিক এরকম সময়ে ঘোড়ার পায়ের আঘাতে ধুলো উড়িয়ে আকবর এসে হাজির। খোলা তলোয়ার হাতে খোদ সম্রাটকে দেখে যে যেদিকে পারলো, পালালো জান বাঁচাতে! [২৭] পরবর্তীতে এই ষোড়শী আকবরের হেরেমে ঠাঁই পায়।

আকবর একবার তার নিয়মিত সান্ধ্যকালীন আসরে বসে জ্যান্ত মানুষ পুড়িয়ে মারার এই নৃশংস প্রথা কতটা যে অমানবিক, সে কথাটা বড় ক্ষেদের সাথে বলেছিলেন, পাশে বসা জয়মলের সেই চাচা রাজা ভগবান দাস মিন মিনে গলায় বলে উঠলেন; হিন্দু মুসলমান, উভয় ধর্মই যদি খারাপ হয়, তা হলে আমরা ভালোটি কোথায় পাবো? [২৮] আকবর চুপচাপ এক ভাবনার জগতে হারিয়ে গিয়েছিলেন সেদিন। কি যেন ভেবেছিলেন অনেকক্ষণ বসেবসে। সভায় আর কোনো কথাই সেদিন বলেননি। কি ভেবেছিলেন? সেটা অবশ্য পরে জানা গেছে। সে কথা আমরা পরে আলোচনা করবো। আমরা আপাতত আকবরের কোমল মনের দিকটি নিয়ে কথা বলছিলাম। আকবরের চরিত্রের এই কোমল দিকটি হয়তো তার দাঈ মা মাহাম আগা চিনেছেন। চিনেছেন বলেই তিনি বার বার আকবরের কাছ থেকে সপুত্রক ক্ষমাও পেয়েছেন। কিন্তু প্রয়োজন ও ক্ষেত্র বিশেষে আকবর যে কতটা কঠোর হতে পারেন, সেটা নিজের বুকের দুধ পান করালেও মাহাম আগা যেমন ঠাউর করে উঠতে পারেননি যেমনি, তেমনি, আশৈশব একইসাথে হেসে খেলে বড় হলেও দুধ ভাইয়ের চরিত্রের এই দিকটি ঠাউর করে উঠতে পারেননি আদম খাঁন নিজেও। মাহাম আগা ও তার পুত্র আদম খাঁন আকবরের ক্ষমা পেলো বটে তবে তাদের ওপর সম্রাটের বিশ্বাস আর

আস্থা একেবারেই শেষ হয়ে গেল। ক্ষুব্ধ আকবর ঐ বছরেরই নভেম্বর মাসে অর্থাৎ ১৫৬১ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কাবুল থেকে তার অতি বিশ্বস্ত আতকাহ্ খানকে ডেকে আনলেন দিল্লিতে। তাকেই নিযুক্ত করলেন রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, বৈরামের স্থলাভিষিক্ত হলেন আতকাহ খাঁন, একজন আফগান পাঠান। এ ঘটনায় মাহাম আগা এবং তার পুত্র আদম খাঁনের সকল স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। দাঈ মা মাহাম আগা দীর্ঘদিন ধরেই অন্তরে স্বপ্ন লালন করে চলেছেন মোগল সম্রাট আকবরের দুধ মা হওয়ার কারণে নিজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি খাটিয়ে তার পেটের ছেলে আদম খাঁনের জন্য একটা সম্মানজনক ব্যবস্থা তিনি করে যাবেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তিনি সম্রাটের আস্থা তো হারিয়েছেনই, সেই সাথে তার আজীবন লালিত স্বপ্ন পূরণের সকল সম্ভাবনাটুকুও শেষ হয়ে গেছে। মাহাম আগা আর সেই সাথে তার অস্থির চিত্তের পুত্র আদাম খান জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলো। এর কয়েক মাস পরে; ১৫৬২ সালের মে মাসের এক দুপুরের ঘটনা। আকবর দুপুরের আহার শেষ করে হেরেমের ভেতরে বিশ্রামরত। আর তার ঘরের পাশের বারান্দায় নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী আতকাহ্ খান বসে বসে দাপ্তরিক কাজ করছেন। এমন সময় আদম খান তার কিছু সহচর নিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লেন। আগে থেকেই বলা ছিল আততায়ীদের, টার্গেটিও ঠিক করা ছিল। তাদেরই একজন সরাসরি আতকাহ্ খানের উপরে তলোয়ার চালিয়ে দিলে মাত্র সাত মাসের প্রধানমন্ত্রী লুটিয়ে পড়লেন। [২৯]

আতকাহ্ খানের উপরে আঘাতটা এতটাই মারাত্মক ছিল যে, দ্বিতীয়বার আর তার উঠে দাঁড়াবার সুযোগ হলো না, ঐখানেই তার জীবন সাঙ্গ হলো। দুষ্কৃতকারীরা হেরেমের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করতেই প্রহরীরা হেরেমের প্রধান ফটক বন্ধ করে দিলে তারা ভেতরে ঢুকতে ব্যর্থ হয়।

এরমধ্যে বাইরে হৈ চৈ শুনে আকবর বাইরে বেরিয়ে এসে আতকাহ্ খানকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হন। আশপাশে চোখ বুলিয়ে তিনি খুঁজতে থাকেন কারা এ কান্ড ঘটালো? সেটা জানার জন্য।

এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন। ঠিক এমন সময় পর্দার আড়াল থেকে হঠাৎ করেই বের হয়ে এলো আদম খান। এসেই আকবরের একটা হাত ধরে ফেললো। আকবর কেবল একবার মাত্র চোখ তুলে দেখলেন তার হাতটা কে ধরলো? হ্যাঁ তিনি ভুল দেখেননি। তারই খেলার সাথী, ছোটবেলার বন্ধু, দুধ ভাই খোদ আদম খাঁন তার হাত ধরেছে!

এটা এমন একটা মুহূর্ত, সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করলে তার মূল্য দিতে হবে নিজের জীবন দিয়ে। আকবর ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিতে বরাবরই সক্ষম। তা না

হলে দাদা বাবর ও বাবা হুমায়ুনের রেখে যাওয়া দুর্বল মোগল রাজ্যকে তিনি এভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারতেন না। আকবর একটাবার মাত্র দেখলেন। এর পরে তার সবল বাহু তুলে ঝড়ের গতিতে একটামাত্র ঘুষি চালিয়ে দিলেন আদম খাঁনের মুখ বরাবর। তখন আকবরের বয়স মাত্র উনিশ বছর। উনিশ বছরের তাগড়া যুবক আকবরের গা এর জোর কতটা ছিল সেটা কেউ টের না পেলেও আদম খান ঠিকই টের পেলো। টের পেলো বটে তবে তা বলার মত জ্ঞান তার থাকলো না। ছিটকে গিয়ে মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকলো।
ততক্ষণে প্রহরীরা দৌড়ে এসেছে। রাগে, ক্ষোভে আর বিস্ময়ে আকবর তখন ফুঁসছেন। না আর নয়। আর ক্ষমা নয়। নির্দেশ দিলেন, জ্ঞান হারা আদম খানের শরীরটাকে তিন তলার বেলকনি থেকে নিচে ছুঁড়ে ফেলে দিতে।
তাই করা হলো। কই মাছের মত শক্তপ্রাণ আদম খান মরলো না দেখে তাকে আবারও তুলে আনা হলো, আবারও ছুঁড়ে ফেলা হলো তিন তলা থেকে। এবারে আর সে রক্ষা পেলো না।
এর আগে আকবরের হাতে ঘুষি খেয়ে জ্ঞান হারালেও পরপর দুই বার তে'তলার উচ্চতা থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে নিচে শান বাঁধানো শক্ত মেঝেতে পড়ার কারণে আদম খাঁন শেষে প্রাণটাই হারালেন। এটা ছিল ১৫৬২ সালের মে মাসের এক দুপুরের ঘটনা।
বিশ্বাসঘাতক আদম খাঁনের তো ব্যবস্থা হলো। কিন্তু দাঈ মা মাহাম আগার কি হবে? ছেলে যে এতদূর এগিয়েছে, স্বয়ং সম্রাটকেই হত্যা করতে এসেছে, সেটা কি মা মাহাম আগা জানেন না? অবশ্যই জানেন। মাহাম আগার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতি ব্যতিরেকে আদম খাঁন এ পথে পা বাড়িয়েছে, সেটা আকবর বিশ্বাস করেন না।
হেরেমের ভেতরে এ ঘটনা মাহাম আগা সবিস্তারে জানতেন কি না, সেটা জানার কোনো পথ আমাদের সামনে এখন আর নেই। তবে আমরা এটা জানি যে, স্বয়ং আকবরই মাহাম আগাকে খুব শান্ত কণ্ঠে, যেন তেমন বিশেষ কিছুই ঘটেনি, এমন ভঙ্গিতে আদাম খাঁনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার খবরটি দেন। [৩০]
মাহাম আগা আকবরের কাছে বুকের পাঁজর ভাঙার মত নির্মম খবরটি চুপচাপ শুনলেন বটে, কিন্তু মায়ের মন বলে কথা! নীরবে চোখের পানি ছেড়ে দিলেন একটু পরেই। দাঈ মায়ের আচরণে আকবর কতটা ক্ষেপেছিলেন, আকবরের এই আচরণেই সেটা টের পাওয়া যায়। মায়ের

মত সারাজীবন শ্রদ্ধা করেছেন বলে তার কোনো আচরণেই কিছু বলেননি। তবে শেষবারের এই আচরণে তিনি তারা সারা জীবনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন এভাবে!

এরপরে অবশ্য হতভাগিনী আর বেশিদিন বাঁচেননি। সব স্বপ্ন, সব আশা তার শেষ হয়ে গিয়েছিল নিজের পেটে ধরা একমাত্র সন্তানের মৃত্যুর সাথে সাথেই। মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই তিনি অসুখে পড়েন এবং মারা যান।[৩১]

কোমলপ্রাণ সম্রাট আকবর পরে অবশ্য অনুতপ্ত হন ছোটবেলার খেলার সাথী এবং দুধ ভাইকে এভাবে নৃশংসতার সাথে হত্যা করার কারণে। তবে এ কথাটাও ঠিক যে, আদম খাঁনের মৃত্যুর জন্য আকবর দায়ী নন। যে কোনো আদালতের নিরপেক্ষ বিচারে রাষ্ট্রদ্রোহ ও প্রধানমন্ত্রী আতকাহ্ খানকে হত্যার কারণে তার মৃত্যুদণ্ডই হতো।

আর আকবর যেটা করেছেন, সেটা করেছেন নিজে আক্রান্ত হওয়ার পরেই কেবলমাত্র। আদম খান নিজের ভাগ্য নিজের হাতেই তৈরি করে নিয়েছে।

আকবর কুতুব মিনারের পাশে, লাল কেল্লার দক্ষিণ দিকে আদম খানের স্মৃতিতে একটা সমাধি বানিয়ে দেন। আজও সে সমাধি সেখানে রয়ে গেছে।[৩২]

নয়

আদম খাঁন ও তার মা; মোগল হেরেমের সবচেয়ে প্রভাবশালী নারী, মাহাম আগার এই করুণ পরিণতি দেখে সবচেয়ে বেশি খুঁশি হয়েছিলেন যিনি, তিনি হলেন, সালিমা সুলতানা বেগম; আকবরের চতুর্থ স্ত্রী।

এই সালিমা সুলতানা ছিলেন হতভাগ্য বৈরাম খানের বিধবা স্ত্রী। বৈরাম খানের মৃত্যুর পরে সম্রাট আকবর তাকে চতুর্থ স্ত্রী হিসেবে ঘরে তুলে নিয়েছেন। সেলিমা সুলতান বেগম ছিলেন আকবরের চেয়ে বয়সে প্রায় চল্লিশ বছরের বড়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিদুষী একজন নারী। আকবরের ফুফাতো বোন।

সম্রাট বাবরের মেয়ে তথা হুমায়ুনের বোন গুলরুখ বেগমের বিয়ে হয়েছিল কনৌজের সুলতান মির্জা মুহাম্মদ নুরুদ্দিন বেগের সাথে। এই দম্পতির মেয়ে সালিমা সুলতানা জ্ঞান আর প্রজ্ঞায় ছিলেন সে যুগে একজন অনন্য নারী। নিজ যোগ্যতাগুণেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন আকবরের হেরেমের সবচেয়ে প্রভাবশালী একজন।

তিনি একজন কবি ছিলেন। 'মাখফি' নামে লিখতেন। সম্রাট আকবরের উপরে তার অত্যন্ত প্রভাব ছিল, পরবর্তীতে তিনি পুরো মোগল রাজদরবারে, বিশেষ করে, জাহাঙ্গিরের জীবন বাঁচাতে এবং তাকে মোগল সিংহাসনে বসাতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। ১৫৬০ এর শেষ দিকেই তিনি আম্বারের রাজপুত রাজার কন্যা চম্পাবতীকে বিয়ে করেন (বিয়ের পরে মোগল হেরেমের নিয়মানুযায়ী চম্পাবতীর নাম রাখা হয় মরিয়ম-উজ-জামানি)। সে সূত্রে রাজপুত রাজার সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়।

ভবিষ্যতে আকবরের পুত্র সেলিম পরবর্তীকালের মোগল সম্রাট জাহাঙ্গিরেরও বিয়ে দেয়া হবে এই বংশেরই আর এক রাজপুত কন্যা মানবাঈ-এর সাথে হিন্দু মতে। স্বয়ং আকবরের ইচ্ছা ও অনুপ্রেরণায়, হিন্দু প্রথায় ভারতের প্রথম হিন্দু মুসলিম বিবাহ। আর সেই মানবাঈ-ই হবে ভবিষ্যৎ সম্রাট শাহজাহানের মা। আকবর এখন উনিশ বছর বয়সী যুবক, মোগল সম্রাট। ১৫৫৯ সালের মাঝামাঝি সময় থেকেই আকবর রাজপুত শক্তির দিকে নজর দিতে থাকেন। বৈরাম খান সেখানে অভিযান পরিচালনা করলেও কোনো সাফল্য আসার আগেই সে অভিযান বন্ধ রাখতে হয়, কারণ তখন বৈরাম খাঁনের সাথে আকবরের সম্পর্কের অবনতি ও তার রেশ ধরে বৈরামের অপসারণ আর শেষ পর্যন্ত দুঃখজনক মৃত্যুর কারণে। দুধ ভাই আদম খাঁন ও অপর সেনাপতি পীর মুহাম্মদের নেতৃত্বে বিজ বাহাদুরের বিরুদ্ধে

অভিযান পরিচালনা ও সহজ জয় পাওয়া গেছে সেটা আগেই বলেছি।
একেবারে দোরগোড়ায় শক্তিশালী মোগল বাহিনীর উপস্থিতি পার্শ্ববর্তী রাজপুতদের মনে আতঙ্ক, ভয়, অবিশ্বাস আর অনাস্থার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে, চিতোরের দুর্গ বিজয়ের পরে প্রায় চল্লিশ হাজার বন্দী রাজপুতকে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করে আশপাশে রাজপুতসহ অন্যান্য সম্প্রদায়কে কঠোর বার্তা দিলেন, মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়ালে তার পরিণতি কী হবে?
যা হোক, আকবরও তখন মালওয়ার রাজ্যে উজবেক বিদ্রোহীদের দমাতে ব্যস্ত। সামরিক পদক্ষেপের পাশাপাশি কূটনীতিও চলছিল যথারীতি। বিনা যুদ্ধে পরিচালিত কূটনীতি যথেষ্ট ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে আকবরের জীবনে। রাজপুত রাজকন্যা চম্পাবতীকে বিয়ের সূত্র ধরেই রাজা, তার পুত্র ভগবান দাস এবং নাতি মান সিংহ রাজদরবারে আমির ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জায়গা করে নেবে।
রাজপুত রাজা কর্তৃক মোগল সম্রাটের নিজের মেয়ে দেয়ার মাধ্যমে সখ্যতা এবং চূড়ান্ত অর্থে প্রভাব বিস্তার করার এই প্রচেষ্টা দেখে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য হিন্দু রাজন্যবর্গ নিজেদের প্রভাব ও ক্ষমতাকে নিরাপদ রাখতে সেই একই পথ ধরলেন। জয়সলিমার হিন্দু রাজা নিজ কন্যাকে দিলেন আকবরের কাছে, তা দেখে বিকানৌর হিন্দু রাজা নিজের মেয়ে না থাকায় বোনের মেয়ে তথা ভাগিনীকে আকবরের হেরেমে পাঠালেন। আত্মীয়তা পাকাপোক্ত হলো মোগল সম্রাটের সাথে।
এভাবে আকবরের অন্দর মহলে বিভিন্ন মতাদর্শীদের সমাবেশ ঘটতে থাকলো। যা কেবলমাত্র আকবরের ব্যক্তিগত জীবন ও বিশ্বাসকেই প্রভাবিত করবে না নিকট ভবিষ্যতে, বরং অনাগত দিনের ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজ ও ইসলামি মূল্যবোধ, শিক্ষা সংস্কৃতিকেও প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করবে। যদি বলি ভারতীয় উপমহাদেশে এর রেশ ধরে ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঠিক রূপ, অবয়বই পাল্টে যাবে। পাল্টে যাবে ইসলামি দর্শনের যথাযথ রূপটাও, তবে তা অতিশয়োক্তি হবে না, বরং প্রকৃত বাস্তবতাকে এবং এক অকাট্য ঐতিহাসিক সত্যকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হবে।
এরই রেশ ধরে আকবরের মৃত্যুর শত শত বছর পরে, এমনকি, আজও এই একবিংশ শতাব্দীতেও আধুনিক ভারতে ইসলামকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। ইসলামকেই ভারতের অনগ্রসরতা ও পশ্চাৎপরতার জন্য দায়ী করে এর অনুসারী মুসলমানদের জীবন ও সমাজকে পর্যুদস্থ করা হবে। ভারতীয় উপমহাদেশে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থানের পেছনেও এ পরিবেশ পরোক্ষভাবে একটা নিয়ামক ভূমিকা পালন করবে।

তবে আমাদের এ বক্তব্যকে আরও সুস্পষ্ট করে তুলতে হলে ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্য উপাত্তকে সামনে আনতে ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতার সাথে ভেবে দেখতে হবে। ত্বরিত কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে আসুন আমরা সে কাজেই মনোনিবেশ করি আপাতত।

সাম্রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি আকবর অভ্যন্তরীণ অবকাঠামো গড়ে তোলার দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি পুরো রাজ্যজুড়ে কর আদায়ের জন্য একটা সুষম ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। আর এ ব্যবস্থার মূলে ছিল 'মনসবদার' প্রথা। ভারতীয় সমাজে এরাই ছিলেন এলিট শ্রেণী। অথচ এদের প্রায় সবাই ছিলেন বহিরাগত; ইরানি বা মধ্য এশিয়া থেকে আসা উজবেক বা আফগান অঞ্চলের লোক।[৩৩]

দুই একটা ব্যতিক্রম ছাড়া তারা প্রায় সকলেই ছিলেন শিয়ামতাদর্শী মুসলমান। এদেরকেই ভূমি জায়গির দেয়া হতো, সে অর্থে এদেরকে জায়গিরদারও বলা হতো (যদিও দুটো আলাদা পদ)। এসব বহিরাগত লোক নিজ নিজ জন্মভূমি ছেড়ে ভারতে এসেছে ভাগ্যের সন্ধানে, অর্থ কামাতে। তারা যে কোনো পন্থায় তা কামিয়েছে। এদের হাতে যখন জায়গির ছেড়ে দেয়া হয়েছে কর ধার্য, আদায় এবং আদায়কৃত অর্থের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ কেন্দ্রে; মোগল রাজকোষে জমা দেয়ার শর্তে।

তখন তারা সেটা করেছে যে ভাবে পেরেছে সেভাবেই। এর জন্য তারা বৈধ বা অবৈধ পথ পন্থা, নীতি নৈতিকতার বিচার করেনি। সে ধরনের মানবিক ও নৈতিক মনমানসিকতাও তাদের অধিকাংশদেরই ছিল না।

জমির মালিক সম্রাট। তিনি জায়গির দিতেন জায়গিরদারদের। জায়গিদারগণ চাষিদের কাছ থেকে উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক খাজনা হিসেবে আদায় করতেন।[৩৪] আর এটা দিতে হতো নগদ অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে। এই কর ব্যবস্থায়ই ছিল মোগল সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তির বুনিয়াদ।

রাজকোষে সম্রাটের অংশ পরিশোধের পরেও তাদের নিজেদের, নিজেদের পরিবার পরিজনের জীবিকা, ভোগ বিলাস, অধীনস্থ কর্মচারীদের বেতন পরিশোধের ব্যাপারটি ছিল। এসব কিন্তু তারা সেই চাষি বা প্রজাদের কাছ থেকেই আদায় করতো। আর এ অর্থ জোগানের জন্যই তারা প্রজাদের ওপরে নানান ছলে কর বসাতো, তা আদায়ও করতো, প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে হলেও। এ বাস্তবতাটা জানা থাকলে আমাদের এটাও বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, সে সময়ে ভারতের বাইরে থেকে আসা এই এলিট শ্রেণীর বাইরে সাধারণ প্রজাদের অর্থনৈতিক অবস্থাটা কেমন ছিল? কেমন ছিল তাদের জীবন ও জীবনাচার?

এর বিপরীতে ইরান, কাবুল সমরখন্দ এসব জায়গায় নিজেদের জীবন ও জীবিকার জন্য সুবিধাজনক অবস্থান তৈরি করতে না পেরে কিছু লোক, যারা ভারতবর্ষে এসে মোগল সম্রাটের আওতায় চাকরি ও নিজ নিজ যোগ্যতা প্রদর্শনের মাধ্যমে সম্রাটের কাছ থেকে নানান সুবিধা আদায় করেছে (জায়গির পাওয়াটাও প্রাপ্ত এসব সুবিধার মধ্যে অন্যতম), আর্থিক ও সামাজিকভাবে তারাই কালক্রমে প্রভাবশালী হয়ে এখানে বসবাস শুরু করেছে।

এদের, বলা চলে, কেউই আর ফেরত যায়নি নিজ নিজ বাপ দাদার ভিটায়। এদের সকলেরই মাতৃভাষা ফার্সি হওয়ার কারণে মোগল দরবার ও প্রশাসনেও এরা একচেটিয়া সুবিধা করে নেয়।

ক্রমবর্ধমান মোগল সাম্রাজ্যের জন্য লেখাপড়া জানা, ফার্সি জানা কর্মচারীর প্রয়োজন ছিল, সে প্রয়োজন মেটানোর জন্য এগিয়ে এসেছে এইসব ফার্সিভাষী লোকগুলো। এভাবে তারাই বলা চলে সরকারি সুবিধা ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে ভারতীয় সমাজে আসন গেড়ে নেয়। সহসা এরাই হয়ে ওঠে মোগল আমলে ভারতের 'এলিট শ্রেণী'! এদের হাতে আগামী দিনের ভারত তথা মোগল ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক চিত্র গড়ে উঠবে।

এই যে সামাজিক বিবর্তন, এর রেশ ও প্রভাব অনিবার্যভাবেই সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে পড়েছে। শিক্ষা সংস্কৃতি থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই ফার্সিভাষী লোকদের সংস্কৃতি, তাদের বোধ, বিশ্বাস আর লোকাচার ছড়িয়ে পড়েছে। এটাকে পুরোপুরি ইসলামি সংস্কৃতি বলাটা নিছক সত্যের অপলাপ হবে, আবার এই সংস্কৃতির সাথে ইসলামি সংস্কৃতির কোনো সংযোগই ছিল না, তেমন বলাটাও ঠিক হবে না।

ভারতের বাইরে থেকে আগত এইসব লোকদের অধিকাংশই সুযোগসন্ধানী ও নিজেদের ভাগ্য গড়ে তুলতে ব্যস্ত ছিল। তাদের চিন্তা-চেতনায় স্থানীয় ভারতবাসীদের স্বার্থচিন্তা প্রাধান্য পায়নি বরং প্রাধান্য পেয়েছে নিজেদের পকেটভারী করার বিষয়টি। কাজেই ভারতবাসী চাষী সম্প্রদায়, যারা পুরো ভারতের অন্ন জোগাতো, কর ধার্য ও আদায় করার সময় সেই তাদের স্বার্থরক্ষার বিষয়টি এদের মাথায় ছিল না। সমাজের প্রান্তিক সীমায় বসবাসকারী এই জনগণ ধার্যকৃত কর পরিশোধ করতে পারবে কি না, সেটা বিবেচনায় না নিয়েই তাদের উপরে কর ধার্য করা হতো।

যা হোক, প্রকৃত অর্থে কর আদায়ের এই পরিমাণটা এক হিসেবে শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগ, এমনকি, আশি ভাগ পর্যন্ত বলা হয়েছে।[৩৫]

তার মানে দাঁড়ালো, সাধারণ জনতা তার উৎপাদিত শস্যের মাত্র কুড়ি ভাগ ভোগ করতে পারতো। উৎপাদিত শস্যের এই এক-পঞ্চমাংশ নিয়েই তার নিজের ও পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণ চলতো। পরবর্তী বছরের বীজ হিসেবেও একটা অংশ এখান থেকেই তাকে গচ্ছিত রাখতে হতো।

আকবরের অন্যতম সভাসদ (বলা চলে, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা) টোডরমল সম্রাট আকবরের এই কর ধার্য ও আদায় ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। এটা টোডরমলের একক কৃতিত্ব। [৩৬]

আকবর তার রাজস্ব ব্যবস্থাকে একটা সিস্টেমের মধ্যে আনার জন্য তাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। টোডরমল ভারতীয় সমাজে যে শোষণমূলক অর্থব্যবস্থা সম্বন্ধে ধারণা রাখতেন, সেটুকুর উপরে ভিত্তি করেই আকবরের জন্য একটা কর আদায়, তথা রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা গড়ে তুললেন। আর সেটি ছিল পুরোটাই সরকার বান্ধব, সাধারণ মানুষের ন্যূনতম অর্থনৈতিক মুক্তি কিংবা অর্থনৈতিক সাম্য ও অধিকার রক্ষা করার কোনো সুযোগ ছিল না। এ বাস্তবতা যখন আপনার সামনে থাকবে তখন আপনি তৎকালীন ভারতীয় সমাজে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল, সেটা সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন। আমরা ভবিষ্যৎ আলোচনার ক্ষেত্রে এ তথ্য কাজে লাগানো। যদি বুদ্ধিবৃত্তিক সততা ও নৈতিক মান বজায় রাখতে হয়, তা হলে এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ভারতীয় সমাজে আপামর সাধারণ মানুষের এ ধরনের অর্থনৈতিক শোষণের দ্বারোন্মোচন করে দিয়েছেন মোগল সম্রাট, আরও সুস্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, জেনে বা না জেনে, বুঝে বা না বুঝে স্বয়ং সম্রাট আকবর।

তার মানে অবশ্য এটা নয় যে, আকবরের আগে যেসব মুসলিম শাসকগণ ভারত শাসন করেছেন, তাদের এ ব্যাপারে কোনো দায় নেই।

আমরা আকবরের কথা এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট করে বললাম এ কারণে যে, বাবর ও হুমায়ুন মোগল শাসনের ভিতকে শক্ত করার সময় ও সুযোগ পাননি। সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোগুলোও গড়ে তোলার কোনো ধরনের সুযোগ তারা পাননি। এই সুযোগ পেয়েছিলেন সম্রাট আকবর। আর তা ছাড়া, আমাদের এ রচনায় আমরা বিশেষভাবে আকবরের ভূমিকা ও কর্মকাণ্ডের প্রতি আলোকপাত করছি।

আকবর ১৫৬৩ সালে মথুরায় শিকারে গেলেন। সেখানে তিনি দেখতে পেলেন এক মন্দীরে স্থানীয় হিন্দুরা জড়ো হচ্ছে তাদের এক পূজা উপলক্ষে। আগত হিন্দু পুণ্যার্থীদের কাছ থেকে আকবরের স্থানীয় জায়গিরদারের কর আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী বিশেষ কর আদায় করছে। [৩৭]

দশ

আকবর বিষয়টা দেখে মর্মাহত হলেন। যে কোনো মানবিক বিচারে এটা ছিল একটা অন্যায়, অনায্য কর। শোষণের একটা পদ্ধতি এবং একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের প্রতি অবিচার, ইসলামের দৃষ্টিতে জুলুম। এটা না করা বা আইনত করতে না পারার ব্যাপারে কোনো ধরনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ছিল না। এই না থাকাটা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে খোদ আকবরেরই ব্যর্থতা। হিন্দু সভাসদরা যখন বিষয়টির প্রতি সম্রাটের মনোযোগ আকর্ষণ করলো, তখন সম্রাট তাৎক্ষণিকভাবে এই কর আদায় বন্ধ করে দিলেন।[৩৮]

আকবর নিজের চোখে দেখলেন, তার হিন্দু প্রজাদের কাছ থেকে কেবলমাত্র হিন্দু হওয়ার কারণে একটা বিশেষ ধরনের কর আদায় করা হচ্ছে, তাও আবার তাদের ধর্মীয় প্রথা পালন, তথা ধর্ম পালন করার কারণে! বিষয়টা তার মগজে গেঁথে গেল। তিনি ভাবতে থাকলেন।

এখানে আমরা আকবরের মনে প্রজাসাধারণের প্রতি মমত্ববোধ দেখতে পাই। তাদের প্রতি কৃত জুলুম, তাও আবার কেবলমাত্র একটা বিশেষ ধর্মবিশ্বাসের অনুসারী হওয়ার কারণেই সেই জুলুম বা অবিচারের মুখোমুখি হওয়া!

এটা যে কোনো মানবিক মমত্ববোধের স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ। এর পাশাপাশি সম্ভবত ঐসব প্রজাকে নিজ 'দেশবাসী' ভাবার মত জাতীয়তাবাদী ভাবনাবোধের বিষয়টিও জড়িত থাকতে পারে। এখানে আলোচনার এ পর্যায়ে আমাদেরকে একটু পেছন ফিরে আরও একটা বিষয় ভেবে দেখতে হবে আকবরের মনোজগতকে ভালো করে বোঝার স্বার্থে।

বাবর পানিপথের যুদ্ধে বিজয় লাভ করার পরে আগ্রায় আসেন। ভারতের আর্থসামাজিক অবস্থা দেখে তিনি খুবই মর্মাহত হন। রাস্তা-ঘাটের অবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অবকাঠামো এবং অন্যান্য সামাজিক সুযোগ সুবিধার অপ্রতুলতা দেখে তিনি হতোদ্যম হয়ে পড়েন।[৩৯]

তিনি আগ্রায় তার প্রিয় সমরখন্দ স্টাইলে একটা বাগান করতে চাচ্ছিলেন, যেখানে নানা ধরনের গাছ-গাছালি, আর ফুল-ফল ছাড়াও ঝর্ণার ব্যবস্থা থাকবে। সেকালে আগ্রার অবস্থা দেখে তিনি আশাহত হলেও সহসাই বাগানের কাজ শুরু করলেন।

বাবর দিল্লি বা আগ্রা, তথা, ভারতে স্থায়ী নিবাস তৈরির কথা ভাবেননি। তিনি বরং ভারতের উপরে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চেয়েছিলেন উত্তর ভারতের মধ্য দিয়ে মধ্য এশিয়া এবং তারও ওপারে চলে যাওয়া

প্রাচীন বাণিজ্য রুটকে নিয়ন্ত্রণ করতে, এটা করতে পারলে তা তার রাজ্যের আর্থিক বুনিয়াদকে যেমন শক্তিশালী করবে তেমনি তার রাজনৈতিক ও ভূকৌশলগত গুরুত্বও বাড়িয়ে দেবে। তার শক্তি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। পারস্য সাম্রাজ্যের আশীবার্দপুষ্ট উজবেকদের হাত থেকে সমরখন্দ ও জন্মস্থান ফারগানা উদ্ধার করাই তার আজীবন স্বপ্ন ছিল।

পরপর তিনবার প্রিয় সমরখন্দ তার হাত ছাড়া হয়েছে। তার দৃষ্টিসীমা বরাবরই নিবদ্ধ ছিল সমরখন্দের দিকে। ফারগানা, বুখারা আর সমরখন্দকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। আর তাই তিনি ভারতের মাটিতে নিজেকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা বা চেষ্টা কোনটাই করেননি। সেই সমরখন্দ, ফারগানা তার বিরোধীপক্ষের হাতে, সেখানে ফিরে যেতে পারেননি, তাই তিনি তার বিকল্প নিবাস হিসেবে কাবুলকে বেছে নেন।

এ কারণেই তিনি দিল্লি বা আগ্রাতে নয়, নিজের জন্য আবাস তৈরি করতে শুরু করেছিলেন কাবুলে। তার মৃত্যুর পরে অন্তিম শয্যা কোথায় হবে? তার নির্দেশও তিনি নিজের জীবদ্দশায় দিয়ে গেছেন; কাবুলে। মৃত্যুর পরে তার অসিয়তমতই তাকে সেখানেই সমাহিত করা হয়েছে।[৪০]

এ অর্থে বাবর মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেও তিনি ভারতীয় হতে পারেননি, না তিনি জন্মসূত্রে ভারতীয় ছিলেন, আর না তিনি ভারতে অভিবাসী হওয়ার চেষ্টা করেছেন। বাবরের সন্তান, আকবরের বাবা হুমায়ুন কাবুলে জন্ম নিলেও ভারতেই মৃত্যুবরণ করেন। দিল্লিতে সমাহিত হন। মাত্র বৎসর চারেক ছিলেন দিল্লিতে। তার মৃত্যুটাও ছিল আকস্মিক, দুর্ঘটনাকবলিত অবস্থায়। তিনি ভারতীয় হওয়ার সুযোগও পাননি।

আকবর জন্ম, চেতনা ও মানসিক দিক থেকে ছিলেন ভারতীয়। পুরোমাত্রায় ভারতীয়। তার ভেতরে ভারতীয় হওয়ার একটা প্রচেষ্টাও ছিল সারাটা জীবন ধরেই। শিয়া মা, সুন্নি বাবার সন্তান আকবরের চেতনার জগৎ, বোধ ও বিশ্বাস, তথা আদর্শিক জগৎটা ছিল বড় জটিল, বড় বিস্ময়কর। আকবরই হলেন সার্বিক বিচারে ভারতে মোগল শাসনের প্রকৃত প্রতিনিধি, তিনিই মোগল শাসনকে ভারতীয় সমাজের গভীরে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। দাদা বাবর যেখানে মাত্র চার বৎসর চার মাস এবং বাবা হুমায়ুন দুই দফায় দশ বৎসর চার মাস সময় পেয়েছিলেন ভারতের মাটিতে তাদের প্রশাসনকে প্রতিষ্ঠিত করার, সে ক্ষেত্রে আকবর একাধারে, এক নাগাড়ে আটচল্লিশ বৎসর সময় পেয়েছেন। এর ফলে ভারতের মাটিতে মোগল শাসনকে একটা শক্ত ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করার মত অবারিত সুযোগ তার সামনে ছিল। তিনি তা করেছেনও।

তবে তা করেছেন তার আদর্শ ও বিশ্বাস অনুযায়ী। আর আকবরের শাসনামল থেকে শুরু করে তার পরবর্তী মোগল সম্রাটদের প্রত্যেকের শাসনকালই এর রেশ টেনে গেছে। শুধু মোগল শাসকদল বা তাদের পরিবার পরিজনই নয়, এর রেশ টানবে পুরো ভারতের আপামর জনগণও। এমনকি, টেনে চলেছি আজকের যুগে এই আমরাও।

এ কারণেই আকবরের আদর্শিক জগতের একটা চিত্র, এর ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের ধারাটা আমাদের ভেবে দেখা উচিত। দুঃখের বিষয় হলো, ঐতিহাসিকগণ এই দিকটার পর্যাপ্ত বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই ইতিহাস উপস্থাপন করেছেন, ফলে আমাদের সামনে আকবরের কর্মকাণ্ড ও তার পরিণতি, প্রভাবের পুরো চিত্রটা আলোচিত হয়নি। আমরা এ ব্যাপারে পুরোমাত্রায় সচেতনও নই।

আকবর যখন দাক্ষিণাত্যের দিকে তার সাম্রাজ্যকে এগিয়ে নেয়ার জন্য একেরপর এক সামরিক আগ্রাসন চালাচ্ছেন, তখন আমাদেরকে ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতা ও সততা রক্ষার জন্য হলেও সেখানকার আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থাটা একবার দেখে নেয়া দরকার।

দেখে নেয়া দরকার এ কারণে যে, মোগল সম্রাট আকবর দাক্ষিণাত্যে তার সামরিক অভিযান পরিচালনার প্রয়োজন মনে করলেন কেন? তিনি কি বাধ্য হয়েই এমন ঝুঁকিপূর্ণ যুদ্ধের দিকে এগিয়েছিলেন? না, নিরেট সাম্রাজ্য বিস্তারের লোভেই সে পথে বাড়িয়েছেন?

বিষয়টা আরও একটা কারণে আমাদের জানা দরকার। সেটা হলো, আকবরের ইতিহাস যখন আমাদের কাছে ইসলামের ইতিহাস হিসেবে তুলে ধরা হয়, মুসলমানদের ইতিহাস বলে তুলে ধরা হয় তখন ইসলামের অনুসারীদের এটা জানার অধিকার আছে বৈকি যে, আকবর তার সামরিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি বা বিধি বিধান কতটা মেনে চলেছেন?

তামিলনাড়ু এবং মাদ্রাজ উপকূলীয় অঞ্চলে আরব বণিকদের উপস্থিতি ছিল ইসলাম পূর্বকাল (হযরত মুহাম্মদ সা: কর্তৃক নবুয়ত দাবির আগের সময়) থেকেই। এখানে আরবদের উপস্থিতি ছিল। এইসব আরবদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। অনেকেই আবার এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। এদেরকেই বলা হতো মোপলা। [৪১]

এটা একটা প্রাচীন নৌবন্দর। এখান থেকেই আরব বণিকরা আরাকান, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ বন্দর, আসামের কামরুপ হয়ে চীনের প্রাচীন সিল্ক রুট হয়ে সাংহাই (ক্যান্টন) যেতেন।

এই সাংহাই বা ক্যান্টন নগরীতেই ছিল একটা বড়সড় আরব বণিকদের উপস্থিতি। কেবলমাত্র ৬৫১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু করে ৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দ সময়, এই ১৪৮ বৎসর সময়কালের মধ্যে অন্ততপক্ষে ৩৭টি আরব প্রতিনিধিদল চীনে এসেছেন, এমন ঐতিহাসিক দলিলের উপস্থিতি রয়েছে।[৪২]
এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সা'দের বাবা আবি ওয়াক্কাস। পরবর্তীতে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। এখানে নবীজির দুধ মা হযরত হালিমা (রা:) এর এক আত্মীয় (সম্ভবত দেবর) আব্দুল ওজ্জা ইবনে আবি খাবশা'ও ছিলেন। ঐতিহাসিক তথ্য উপাত্তে এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, বাংলাদেশের আরাকান, সন্দ্বীপ এবং ভারতীয় দক্ষিণ উপকূলজুড়ে আরব বণিকদের এক বিরাট গোষ্ঠীর স্থায়ী উপস্থিতি বিদ্যমান ছিল।
চেরামান রামাভার্মা পেরুমল, দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্য Kodungaloor 'কোডুঙ্গোলর' (বর্তমান কেরালা) রাজ্যের রাজা। 'পেরুমল' রাজবংশের মোট ২৬ জন রাজার মধ্যে তিনিই সর্বশেষ রাজা এবং একাধারে ২৬টি বৎসর তিনি রাজা হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পুরো দক্ষিণ ভারতের ২৫০০ মাইলেরও বেশি এলাকা জুড়ে উপকূলীয় এ রাজ্যের সীমানা ছিল বিশাল।মক্কার কাফেরদের দাবির মুখে প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সা:) এর হাতের ইশারায় চাঁদকে দ্বি-খণ্ডিত করে দেখান। চাঁদের একটা অংশ আকাশের পূর্বাংশে আর অপরাংশ পশ্চিম দিকে সরে যায় কিছুক্ষণের জন্য। উপস্থিত অনেকেই সে রাতে এ দৃশ্য দেখেছিল। কাফেরদের কেউ কেউ এটা বিশ্বাস করলেও নিজের চোখে দেখা সত্ত্বেও কেউ কেউ তা জাদু হিসেবে অভিহিত করে। জ্যোৎস্নারাতে রাজা চেরুমল রাজপ্রাসাদের ছাদে বসে ছিলেন রানী সাথে করে। হঠাৎ চাঁদকে দ্বি-খণ্ডিত হতে দেখে রানীসহ তিনি ও তার সভাসদরা যারপরনাই বিস্মিত হন। এ বিষয়ে তিনি রাজ জ্যোতিষীদের কাছে জানতে চান।
মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই মালাবার উপকূলে আগত আরব বণিকদের মাধ্যমে স্থানীয় আরব বণিক ও তাদের ভারতীয় দোসররা জানতে পারেন যে, আরবে এক নবী আত্মপ্রকাশ করেছেন, তিনি একত্ববাদ প্রচার করেন, তিনিই নিজ হাতের ইশারায় চাঁদকে দ্বিখন্ডিত করেছিলেন। এ কথা শুনে অভিভূত রাজা চেরামান পেরুমল আরবের সেই নবীর সাথে সাক্ষাতের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন, শেষ পর্যন্ত তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন একদল আরব বণিকদের সাথে।

হিজরতের পূর্বে সম্ভবত ৬১৯-৬২০ খ্রিষ্টাব্দে, ২৭ শে শাওয়াল সকাল ৯টার দিকে প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সাথে তাঁর দেখা হয়। সেখানেই তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু বক্কর (রা:) সহ আরও কয়েকজন সাহাবীর উপস্থিতিতে স্বয়ং আল্লাহর হাবিব (সা:) তার নাম রাখেন; তাজউদ্দীন।

রাজা চেরামান পেরুমল রাসূলুল্লাহ (সা:) এর জন্য উপঢৌকন হিসেবে দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত আচার নিয়ে গিয়েছিলেন। ভারতীয় এক বাদশাহ কর্তৃক আদার সংমিশ্রণে তৈরি সেই আচার সংক্রান্ত একটা হাদিসও আমরা দেখতে পাই, প্রখ্যাত সাহাবি আবু সাইদ খুদরী রা: থেকে বর্ণিত হয়েছে হাদিসটি।

প্রখ্যাত সাহাবি হযরত মালিক ইবনে দিনারের বোন রাজিয়ার সাথে রাজা পেরুমল তথা সাহাবি তাজউদ্দীন (রা:) এর বিয়ে হয়। তিনি সেখানে প্রায় সাড়ে চার থেকে পাঁচ বৎসর অবস্থান করে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নির্দেশে ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

তার সাথে মালিক ইবনে দিনারসহ আরও ক'জন সাহাবি ছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব আরবের এক বন্দরে (বর্তমান ওমানের সালালা শহর) অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। আজও তার কবর রয়েছে ওমানের সালালা শহরে, মর্যাদাবান এক সাহাবি হিসেবে বিশ্বের মুসলমানদের কাছে সেটি এক অনবদ্য আকর্ষণ।

ওইদিকে মালিক ইবনে দিনার (রা:) এবং তার বোন রাজিয়া রা:সহ অন্যান্য মুসলমানগণ ঠিকই কেরালাতে আসেন, মৃত্যু আসন্ন বুঝতে পেরে চেরুমান পেরুমল তথা তাজউদ্দীন (রা:) তার আত্মীয়-স্বজনদের কাছে অসিয়তনামাসহ একটি চিঠি লিখে পাঠান সাহাবি মালিক ইবনে দিনারের হাতে।

সাহাবি মালিক ইবনে দিনার, তার বোন রাজিয়া দলবলসহ কেরালায় আসেন এবং এখানেই তারা বসতি স্থাপন করেন। এর আগে থেকেই সেখানে এক বিরাট আরব বণিকদের বসতি গড়ে উঠেছিল। সাহাবি মালিক ইবনে দিনার সেখানে ভারতের প্রথম মসজিদ স্থাপন করেন। সেখানেই এই মহান সাহাবি ও তার বোন হজরত রাজিয়া (রা:) এর কবর আজও বিদ্যমান রয়েছে।

এগারো

কাজেই এ কথা ঐতিহাসিক তথ্য উপাত্ত ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণের মাধ্যমে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, ভারতের উপকূলীয়াঞ্চলসহ বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের উপস্থিতি বিদ্যমান ছিল। এইসব মুসলমান যে যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, তারা নিজ নিজ অবস্থানস্থলে ইসলাম প্রচার করেছেন।

এদের উপস্থিতি দ্বারা স্থানীয় ভারতীয়রা প্রভাবিত হয়েছে। এইসব আরব বণিক মুসলমানরা ব্যবসা পরিচালনার স্বার্থে নিজেদের কর্মচারী রেখেছেন, স্থানীয় মধ্যস্বত্বভোগী ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সাথে ব্যবসার লেন দেন করেছেন, আবার অনেকেই স্থানীয় নারীদের বিবাহ করে বসতি হয়েছেন।

তাদের আবার সন্তান-সন্ততি হয়েছে এবং ভারতের জন্মগ্রহণকারী এইসব আরবদের দ্বিতীয় প্রজন্ম স্থানীয় রাজা রাজড়ার অধীনে সৈনিক হিসেবে, নাবিক বা ব্যবসায়ী কর্মচারী হিসেবে চাকরিও করেছে। এদের দ্বারা ভারতীয় সমাজের অতি ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত কিছু অঞ্চলে (প্রধানত উপকূলীয় অঞ্চলে) ছোটখাটো মুসলিম সম্প্রদায়ের উপস্থিতি বিদ্যমান থাকলেও তারা বৃহত্তর পরিসরে ভারতীয় সমাজের উপরে তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করেননি বা করতে পারেননি। রাজনৈতিক প্রভাবের তো প্রশ্নই ওঠে না।

ভারতের মাটিতে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে অষ্টম শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে এবং সেটা ঘটে অনেকটা অকস্মাৎ। বিপন্ন কিছু মুসলমানের জান-মাল ও ইজ্জত রক্ষায় ভারতীয় হিন্দু রাজা দাহিরের অস্বীকৃতির কারণে সেই সব মুসলমানদের উদ্ধারের লক্ষ্যে মুসলিম সেনাবাহিনী আগমনের মধ্য দিয়ে।

খ্রিষ্টীয় ৭০৮ কিংবা ৭০৯ সালে বর্তমান শ্রীলঙ্কা থেকে একদল মুসলিম হজের জন্য মক্কার পথে জেদ্দায় বন্দরের দিকে যাচ্ছিলেন। (এ কথা এটাই প্রমাণ করে যে, সেই তখনই আরবের বাইরে এই উপমহাদেশেও মুসলমানদের উপস্থিতি বিদ্যমান ছিল এবং সেটা প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ইন্তেকালের মাত্র নব্বই বৎসর এবং খোলাফায়ে রাশেদার শেষ খলিফা হযরত আলি (রাঃ) এর শাহাদতের মাত্র পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে)

পথিমধ্যে তাদের জাহাজটি সামুদ্রিক ঝড়ে পড়লে তারা নিকটস্থ দেবল বন্দরে নৌকা ভেড়ান। এটি ছিল বর্তমান করাচি শহরের সন্নিকটে সিন্ধুর একটি বন্দর। সমুদ্র ঝড়ের কবলে পড়ে আশ্রয়ের জন্য নোঙ্গর করা এই হজযাত্রী দলকে বন্দী করা হয় এবং এদের অনেককেই দূর-দূরান্তে বিক্রি করে দিলেও নারীদেরকে নিজেদের কাছে রেখে দেয়া হয়।

কয়েকজন পালিয়ে কোন মতে সাগর পাড়ি দিয়ে বসরা পর্যন্ত পৌছে এবং হাজ্জাজের কাছে সাহায্য চায় বন্দী সহযাত্রীদের উদ্ধারে। খবরটা পেয়ে হাজ্জাজ সিন্ধুর রাজা দাহিরের কাছে তাদের মুক্তি ও ক্ষতিপূরণ দাবি করলে তা অগ্রাহ্য করা হয়। ফলে হাজ্জাজ ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র পনেরো বৎসর বয়সী ভাতিজা মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে ছয় হাজার সৈন্যসহ একটা বাহিনী প্রেরণ করেন।

রাজা দাহির পরাস্ত হয়ে পালিয়ে যান ব্রাহ্মণাবাদে, মুহাম্মদ বিন কাসেম তাকে সেখানেও তাড়া করে শহরটি দখল করেন। এভাবে তিনি পুরো সিন্ধু ও মুলতান দখল করে নেন মাত্র দুইটি বৎসর; তথা ৭১২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই।

অষ্টম শতাব্দীর একেবারে শুরুর দিকে সংঘটিত এ ঘটনা ছিল ভারতের পশ্চিমাঞ্চল, পাকিস্তানের করাচি, সিন্ধু ও মুলতান এলাকার ঘটনা। এভাবে নানা ঘটনার সূত্র ধরে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আগমন ঘটতে থাকে ইসলামের একেবারে প্রাথমিক কাল থেকেই। একাদশ শতাব্দীতে এসে ভারতের মাটিতে মুসলিম শাসন আসন গাড়তে শুরু করে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ইসলাম ভারতীয় জনমানসে ধীরে ধীরে আসন গেড়ে নিতে শুরু করলেও রাজনৈতিকভাবে ইসলাম ভারতীয় ভূ-খণ্ডে ঠাঁই করে নিতে আরও বেশকিছুদিন সময় নেয়। সম্রাট আকবর যে সময় ভারতের মাটিতে নিজের শাসনব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করেছেন , অর্থাৎ ষষ্টদশ শতাব্দীর ভারতে ইসলাম রাজনৈতিকভাবে একটা দৃঢ় অবস্থানে আসীন হয়ে গেছে।

সে ইতিহাস অনেক লম্বা এবং নানা উত্থান-পতনে ভরপুর। আকবরের শাসনব্যবস্থা ও তার কর্মকাণ্ডকে সঠিকভাবে জানতে ও বুঝতে হলে ভারতে ইসলামি সালতানাত তথা রাজনৈতিক ইসলাম কখন এবং কিভাবে কাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার রূপ ও ধরনই বা কি ছিল, সেটা জানা খুবই জরুরি।

কারণ, আকবর এই ইসলামি সালতানাতকেই উচ্ছেদ করে সেখানে নিজের বংশীয় শাসনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন আর পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ সেই শাসনব্যবস্থার আওতায় সংঘটিত সকল কর্মকান্ডকে বাছ-বিচার না করেই 'ইসলামি শাসনব্যবস্থা'র চিত্র বলে চালিয়ে দিলেন। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রকৃত অর্থে ইসলাম একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আসে গজনীর সুলতান মাহমুদের হাত ধরে, ১০০১ খ্রিষ্টাব্দে। ভারতীয় ইতিহাসে এই সুলতান মাহমুদের নানাভাবে চরিত্র হরণ করা হয়েছে। মিথ্যা তথ্য পরিবেশন ও ইতিহাস বিকৃত করে তাকে একজন খলনায়ক বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আসলে তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত জনদরদি, চৌকস ও দক্ষ শাসক, অসম সাহসী বীর এবং নিষ্ঠাবান মুসলমান।

মামলুক তুর্কি বংশোদ্ভূত সেনাপতি সুলতান আলাপ্তিগীন কর্তৃক ৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত গজনভী শাসনব্যবস্থা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। তারই জামাতা সেবুক্তিগীন কর্তৃক গজনীভিত্তিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সূচনা হয় ৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে। এর পরে তারই পুত্র সুলতান মাহমুদ এর ভিত্তিকে আরও সংহত করেন এবং এ রাষ্ট্রের সীমানা আমু দরিয়া থেকে সিন্ধু নদ, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, উত্তরে উত্তর পশ্চিম ভারত পর্যন্ত ব্যাপক বিস্তার ঘটান।

পুরো আফগানিস্তান, হামাদান পাকিস্তান, উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব পর্যন্ত এ রাষ্ট্রের পরিধি ছড়িয়ে ছিল। তারা ৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এক নাগাড়ে প্রায় দুইশত দশ বৎসর এই এলাকা শাসন করে।

পাকিস্তানের সিন্ধু ও মুলতান এলাকায় শিয়া ইসমাইলী শিয়া রাষ্ট্রের পতন হয় এই সুলতান মাহমুদের হাতে। এই ক্ষুদ্র শিয়া রাষ্ট্রটি পাকিস্তানের ঐ এলাকায় কবরপূজা থেকে শুরু করে, পীরকে সেজদাহসহ নানান শিরকী কাজ কর্মকে ইসলামি লেবাস পরিয়ে দেয়। তারা ইসলামের শিক্ষা ও দর্শনকে বিকৃত করে চলেছিল।

মধ্য এশিয়ার তুর্কি জাতিসত্ত্বা হলেও এরা পুরোপুরি পারসিক কৃষ্টি কালচারে অভ্যস্ত ছিল, ফার্সি এদের রাষ্ট্রভাষা ছিল।

এরা শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, ফলে এদের শাসনামলে গজনী, হেরাতসহ পুরো আফগানিস্তান ও আশপাশের এলাকা শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক পাদপীঠ হয়ে ওঠে এবং ধর্মীয় বিশ্বাসে সুন্নি মতাদর্শী মুসলমান ছিলেন।

আমরা সুলতান মাহমুদের কথা বলেছি ইতোমধ্যেই। আমাদের পরবর্তী আলোচনার যে বিষয়বস্তু, তার স্বচ্ছতার স্বার্থই আমাদেরকে এই সুলতান মাহমুদকে নিয়ে কিছু কথা, তার ব্যক্তিচরিত্র ও দর্শন সম্বন্ধে আলোকপাত করা দরকার। কারণ সুলতান মাহমুদ ও তার পরবর্তী শাসকগণ ভারতের মাটিতে যে ইসলামি শাসন ও সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে যাবেন, সেটাকেই ধ্বংস করতে এগিয়ে আসবেন সম্রাট আকবর এবং তারই উপরে নিজের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন, সেই একনায়কতন্ত্রের ইতিহাসকেই আমাদের সামনে ভারতের বুকে মুসলিম শাসনের ইতিহাস, মুসলিম শাসকদের ইতিহাস হিসেবে তুলে ধরা হবে।

মাহমুদ ছিলেন জন্মসূত্রেই একজন চৌকস সৈনিক। মধ্য এশিয়া থেকে আগত তার পূর্ব পুরুষগণ আব্বাসীয় খেলাফতের অধীনে অত্যন্ত বীরত্ব ও সামরিক নৈপুণ্যের সাথে দীর্ঘদিন চাকরি করে আব্বাসীয় সেনাবাহিনীর আঞ্চলিক প্রধানের দায়িত্বপূর্ণ পদেও আসীন হয়েছিল তাদের বিশ্বস্ততা ও কর্মদক্ষতার কারণে। এর ফলে তারা এক সময় নিজ নিজ অঙ্গনে অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে

ওঠে। মাহমুদের বাবা সেবুক্তিগীন খোরাসান ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ঘিরে গড়ে ওঠা সামানাইড বা সামানীয় সাম্রাজ্যের শাসক আলপ্তিগীনের অধীনে কাজ করেছেন এবং তার খুবই আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত ছিলেন। তাদের সেই সম্পর্ক আরও জোরদার হয় যখন সেবুক্তিগীনের সাথে আলপ্তিগীনের নিজের মেয়ের বিয়ে দেন।

অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ এই স্ত্রীর গর্ভেই সেবুক্তিগীনের এক পুত্র জন্মে, মাহমুদ। নিজ ঘরে মায়ের কাছেই ছেলের লেখাপড়ার হাতে খড়ি। অত্যন্ত অল্প বয়সেই মাহমুদ পুরো কুরআন হেফজ শেষ করে একজন হাফেজ হয়ে ওঠেন।[৪৩]

এছাড়াও তিনি আরবি ভাষা, সাহিত্য, হাদিসশাস্ত্র, কাব্যে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেন। তখন তার বাবা সেবুক্তিগীন খোরাসানের গভর্নর। ছেলের এই অসাধারণ মেধা দেখে তিনি তাকে সমরবিদ্যায় বিশেষভাবে পারদর্শী করে তোলেন আর সেই একই সাথে, রাষ্ট্র ও প্রশাসন পরিচালনায়ও বাস্তবে প্রশিক্ষণ দেন, নিজের কাছে রেখে।

মাহমুদই ১০০১ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম পাঞ্জাব অভিমুখে তার সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। সেখানকার হিন্দু রাজা প্রথম জয়পালের মুখোমুখি হন পেশওয়ারের কাছাকাছি এলাকায়। যুদ্ধে জয়পাল পরাজিত ও বন্দী হন। পরে মাহমুদ জয়পালকে মুক্তি দেন এই শর্তে যে তিনি মাহমুদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন না। মুক্তি পেয়েই জয়পাল তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আবারও সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। আবারও তিনি পরাজিত হন অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে এবং পালিয়ে গিয়ে আত্মহত্যা করেন।[৪৪]

পাঞ্জাবে নিজের শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মাত্র ত্রিশ বছর বয়সী সুলতান মাহমুদ সেই মধ্য এশিয়া থেকে সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত বিশাল এলাকার শাসনকর্তা হয়ে ওঠেন। বাড়ির পাশে মুসলিম শক্তির এরকম উত্থান ও বিস্তার দেখে ভারতের সকল হিন্দু রাজা ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটা হিন্দু মহাজোট করে। গোয়ালিয়র, দিল্লি, আজমির ও আশপাশের ছোট বড় হিন্দু রাজাদের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী নিয়ে পরাজিত ও আত্মহত্যাকারী জয়পালের পুত্র আনন্দ পালের নেতৃত্বে ১০০৮ খ্রিষ্টাব্দে পাঞ্জাব আক্রমণ করে। কিন্তু এবারেও সুলতান মাহমুদের কাছে সম্মিলিত এই হিন্দু মহাজোট বাহিনী পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়।[৪৫]

একটা বিষয় লক্ষণীয়, সেটা হলো সুলতান মাহমুদ পাঞ্জাব (লাহোর) দখল করেই ক্ষান্ত দিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের হিন্দু রাজন্যবর্গ আগ বাড়িয়ে তার উপরে আক্রমণ পরিচালনা করে নিজেদের বিপদ ডেকে আনেন। পরের বৎসর ১০০৯ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ এই পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হিন্দু মহাজোটের

বিরুদ্ধে তাদের সমূলে নির্মূলের জন্য আবার সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেন। মহাজোট পরাজিত হলেও এরও পর কয়েক বৎসর তারা বিক্ষিপ্ত হামলা চালাতে থাকে। কিন্তু ক্রমশই তাদের শক্তি ক্ষয়ে আসে ও তারা চূড়ান্তভাবে পরাজয়বরণ করে

সুলতান মাহমুদ অত্যন্ত দক্ষ ও চৌকস একজন সেনাপতি ছিলেন। তার জীবনে এক এক করে সতেরোটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন, এর প্রতিটিতেই বিজয়ী হন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন এবং ধর্মীয় প্রতিটি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে চরম দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা তাকে স্পর্শও করতে পারেনি।

এর প্রমাণ হলো, তার সেনাবাহিনীতে তিনি প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হিন্দু সৈনিককে নিয়োগ দিয়েছিলেন। কোনো হিন্দুর উপরে নিজের ধর্মকে চাপিয়ে দেয়ার কোন রকম চেষ্টা বা প্রচেষ্টা করেননি। স্থানীয় হিন্দুরা তার অধীনে মুসলিম সৈন্যদের মতোই সমান অধিকার, সমান সুযোগ সুবিধা পেয়ে নিজ নিজ ধর্ম রক্ষা করেই সন্তুষ্টচিত্তেই চাকরি করেছে।

তার বারোজন সিনিয়র সেনাপতির মধ্যে পাঁচজনই ছিলেন হিন্দু। এমনকি, তিলক রায় ও সনি নামে দুই হিন্দুকে তিনি তার মন্ত্রিপরিষদেও ঠাঁই দিয়েছিলেন মন্ত্রীর মর্যাদায়।[৪৬]

এমন কোন ইতিহাস আমাদের সামনে নেই যা দ্বারা একথা প্রমাণ করা যায় যে, মাহমুদ তার তেত্রিশ বৎসরের সামরিক ও রাজনৈতিক জীবনে কোনো একটা যুদ্ধে একটাবারের জন্যও পরাজিত হয়েছেন। এমনকি, তার ঘোর সমালোচনাকারী হিন্দু বা ইংরেজ ঐতিহাসিকরাও তাদের কোন ইতিহাস রচনাতেই সে রকম কোন ঘটনার বর্ণনা করতে পারেননি বা করেননি।

বারো

মাহমুদ নিজে ছিলেন অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত এবং রুচিবান ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি কবি-সাহিত্যিক, বিজ্ঞানীদের কদর করতেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানী আবু রায়হান আল বেরুনী, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক আল ফারাবি এবং মহাকবি ফেরদৌউসিকে তিনি পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন। ফেরদৌউসির শাহনামা তো সুলতান মাহমুদের পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থ সাহায্যেই রচিত হয়েছে।

তার একত্রিশ বৎসরের শাসনকালে তিনি গজনী, হেরাত, খোরাসানকে শিল্প, সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলেন। তিনি গজনীতে তার হিন্দু প্রজাদের জন্য একটি হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃতি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৭]

সুলতান মাহমুদের উপরে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হলো তিনি হিন্দুদের সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করেছেন। এটা সত্য যে, তিনি সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করেছেন, তবে এটাও সত্য যে, তার বিরোধীপক্ষ হিন্দু সেনাপতিরা যুদ্ধের কৌশল হিসেবে অনেক মন্দিরেই ধন সম্পদ ও অস্ত্র লুকিয়ে রেখে এইসব ধর্মশালা তথা মন্দিরগুলোকে দুর্গ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন।[৪৮]

সুলতান মাহমুদ যদি প্রকৃত অর্থেই হিন্দুদের মন্দিরগুলোকে কেবল হিন্দুদের উপাসনালয় এ কারণেই ধ্বংস করতেন, তা হলে সবার আগে যে কাজটা হতো, তা হলো তার নিজের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে হিন্দু সৈন্যরাই বিদ্রোহ করতো, তার হিন্দু জেনারেলরাই সবার আগে সৈন্য পরিচালনা করতে অস্বীকার করতো এবং পরিশেষে তিনি ব্যর্থ হতেন।

কিন্তু তার বারোজন সেনাপতির মধ্যে পাঁচজনই হিন্দু সেনাপতি এবং পুরো সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ হিন্দু সৈন্য থাকা সত্ত্বেও তারা কেউই এই মন্দির ধ্বংসের বিরোধিতা না করে বরং এ কাজে অংশ নিয়েছে।

এতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, উক্ত হিন্দু সেনাপতি ও হিন্দু সৈন্যরাই খুব ভালো করেই জানতো যে, জয়পাল বা তার পুত্র আনন্দপাল সোমনাথ মন্দিরসহ অন্যান্য কিছু মন্দিরকে উপাসনার কাজে ব্যবহারের পরিবর্তে সামরিক কাজে ব্যবহার করেছে। প্রখ্যাত হিন্দু ঐতিহাসিক পণ্ডিত ড: ঈশ্বরী প্রসাদ একজন হিন্দু হয়েও কেবলমাত্র ঐতিহাসিক সত্যকে অকপটে তুলে ধরতে গিয়ে লিখেছেন: The temples of India which Mahmud raided were store houses of enormous and untold wealth and also some of these were political centres.

ভাবানুবাদ : মাহমুদ যে সব মন্দিরের উপরে আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন

সেগুলোতে অকল্পনীয় সম্পদ গচ্ছিত করে রাখা হতো। এসবের অনেকগুলোই আবার ছিল রাজনীতির কেন্দ্রস্থল।[৪৯]

তার এ কথার প্রমাণ পাই আমরা আরও একটি ঘটনায়। ১০০১ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার মাহমুদের সেনাবহিনীর কাছে পরাজয় বরণ করে এবং বন্দী হয়েও পিতা জয়পাল সুলতান মাহমুদের সাথে কৃত চুক্তিমত ক্ষতিপূরণ দেয়ার মাধ্যমে নিজের রাজ্য রক্ষা করেন। পরাজয়ের এই জ্বালা সহ্য করতে না পেরে তিনি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। তবে তার আগে তিনি তার পুত্র আনন্দপালকে নিজের রাজ্যে সিংহাসনে বসিয়ে যান।

সিংহাসনে বসেই পুত্র আনন্দপাল কৃত চুক্তি অস্বীকার করে মাহমুদের আজন্ম দুশমন মুলতানের শাসনকর্তা ইসমাইল শাহের সাথেও জোট করে তার নেতৃত্বে ভারতীয় হিন্দু রাজাসহ। এর ফলে মাহমুদ ১০০৮ খ্রিষ্টাব্দে আবারও ভারত (পাঞ্জাব) আক্রমণ করেন।

সুলতানের ব্যক্তিগত সেক্রেটারি আল উতবীর বর্ণনামতে মাহমুদ এবারের আক্রমণে হিমাচল প্রদেশের 'কাংগ্রা' মন্দিরে লুক্কায়িত প্রায় সত্তর কোটি দিরহাম মূল্যের সমপরিমাণ ১৮০ কেজি স্বর্ণ, দুই টন রৌপ্যসহ অগণিত মূল্যবান রত্ন উদ্ধার করেন।[৫০]

সুলতান মাহমুদই ভারতে সর্বপ্রথম ইসলামকে একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেন বা নিয়ে আসেন, সে কথাটা সত্য নয়। তবে আংশিক সত্য বলা যেতে পারে।

কারণ মাহমুদ ভারতে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে নিরংকুশ বিজয় লাভ করলেও তিনি এখানে না ইসলামি শাসন জারি করেছেন আর না তিনি এখানে কোনো ইসলামি রাজনৈতিক প্লাটফরম তথা সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বরং তার বিজিত অঞ্চলে স্থানীয় হিন্দুদেরই নিয়োগ দিয়েছিলেন শাসন পরিচালনার জন্য। ভারতবর্ষে যে সালতানাত, তথা ইসলামি শাসনব্যবস্থার সাথে আকবরের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সংঘাত হবে, যে ইসলামি শক্তিকে মোগল শাসকরা পরাজিত করে সেখানে নিজেদের বংশীয় শাসন জারি করবেন, সেই ইসলামি রাষ্ট্রশক্তি বা সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা মাহমুদ নন। কিন্তু তার পরেও মাহমুদ ভারতের ইতিহাসে অত্যন্ত সমালোচিত একজন ব্যক্তি।

এর কারণটা বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়, তথাপি সে ব্যাপারে কিছুটা ধারণা না থাকলে আমাদের পক্ষে পরবর্তীতে মুসলিম শাসক ও ইসলামি শাসনব্যবস্থার প্রতি ভারতীয় হিন্দু, বিশেষ করে, উচ্চবর্ণের

হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের কর্মপন্থা বুঝে উঠাটা একপ্রকার অসম্ভব হয় উঠবে।

তিনি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন না, যেমনটা তাকে হিন্দু ও খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকরা চিত্রিত করে থাকেন। বরং তিনি ছিলেন মানবিক। হিন্দু বা মুসলমান অথবা অন্য যে কোন ধর্মাবলম্বীই হোক না কেন, তিনি মানুষকে তার মানবিক মর্যাদায় দেখতেন এবং সেভাবেই সম্মান করতেন।

ব্রিটিশ ভারতের আরও এক সিভিল সার্ভেন্ট, হায়দ্রাবাদের নিজামের দরবারে ইংরেজ দূত, আয়ারল্যান্ডস্থ ডাবলিনের বিশ্ববিখ্যাত ট্রিনিটি কলেজের প্রফেসর, পণ্ডিত ও ইংরেজ ঐতিহাসিক Thomas Wolseley Haig (জন্মঃ ১৮৬৫-মৃত্যুঃ ১৯৩৮, ইতিহাসের পাতায় তিনি ডব্লিউ হেইগ নামেই সমধিক পরিচিত) সুলতান মাহমুদের ধর্মীয় সহনশীলতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন; 'His religious policy was based on toleration and though jealous for Islam, he maintained large body of Hindu troops and there was no reason to believe that conversion was a condition of their services.

ভাবানুবাদঃ ধর্মীয় সহিষ্ণুতার উপরেই তার (মাহমুদের) কর্মনীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। যদিও তিনি ইসলামের ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন, তথাপি, নিজের বাহিনীতে এক বিরাট সংখ্যক হিন্দু সৈন্য নিযুক্ত করেছিলেন। আর ধর্ম পরিবর্তন করাটা তাদের (এইসব হিন্দুদের) জন্য চাকরি প্রাপ্তির শর্ত ছিল, এমন বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।

প্রায় একই সমসাময়িক সময়ে অপর এক স্কটল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী ও কাবুলে চাকরি করা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল William George Keith Elphinstone (জন্মঃ ১৭৮২-মৃত্যু ১৮৪২) তার কাবুল অবস্থানকালীন সময়ে সুলতান মাহমুদ ও আফগানিস্তানের ইতিহাসকে খুব কাছে থেকে জেনেছেন ও বুঝেছেন। এই জেনারেল তার ছয়শত নব্বই জন ইউরোপীয় সৈন্যসহ প্রায় সাড়ে চার হাজার ব্রিটিশ বাহিনী নিয়ে প্রথম ইঙ্গো আফগান যুদ্ধের (১৮৩৯-১৮৪২) সময় সদলবলে নিহত হন।[৫১]

তিনি তার এক লেখায় সুলতান মাহমুদ ও তার অনুসৃত নীতি নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন; 'এরকম ঘটনা কোথাও দেখা যায়নি যে, যুদ্ধ ব্যতীত কোথাও কোনো হিন্দুকে তিনি প্রাণদণ্ড দান করেছেন'।[৫২]

মাহমুদ ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান। প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নতের অনুরক্ত। আফগানিস্তান, কাবুলে এবং লাহোরে, তথা তার রাজ্যে তিনি ইসলামি বিধি-বিধানকে অত্যন্ত যত্নের সাথে প্রতিষ্ঠা করেন। পুরো

রাজ্যজুড়ে নামাজ, ন্যায়বিচার, যাকাত ও অর্থনৈতিক সাম্য, অমুসলিমদের অধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

সমাজবিরোধী কাজ কর্মের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও নিরাপোষকামী। তার শাসনামলে সংঘটিত একটি চমকপ্রদ ও সাধারণ ঘটনা ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে দিচ্ছি, দেখুন;

'একবার এক দরিদ্র হিন্দু প্রজা সম্রাটের কাছে অভিযোগ নিয়ে এলেন যে, সম্রাটের ভাগ্নে নাকি তার অসহায় স্ত্রীর উপর প্রতি সপ্তাহে পৈশাচিক অত্যাচার চালায়। সম্রাট তাকে সান্তনা দিয়ে নির্দেশ দিলেন, এবারে যখনই তাঁর ভাগ্নে তাঁর বাড়িতে যাবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন সম্রাটকে তা অবগত করেন। তাঁর হাতে একটা কার্ড দিয়ে জানালেন, এটা দেখালে যে কোনো মুহূর্তে রাজভৃত্যরা তাঁকে সরাসরি সম্রাটের কাছে পৌছে দেবে। পরে একদিন সম্রাটের ভাগ্নে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলো; হিন্দু প্রজারা এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন; তারা পরখ করবেন মুসলমান বাদশাহর ইসলামিক বিচার পদ্ধতি; তৎক্ষণাৎ বাদশাহর নিকট খবর পৌছালো।

বাদশাহ তরবারি হাতে সেই দরিদ্র প্রজার বাড়িতে উপস্থিত হলেন। টিমটিমে আলোয় দেখলেন এক উন্নতমস্তক যুবক ঘরের ভিতরে হিংস্র মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি ইশারায় আলোটি নিভিয়ে দিতে বলে উলঙ্গ তরবারি দিয়ে পিছন দিক থেকে এক চোটে তাকে দ্বি-খণ্ডিত করলেন।

তারপর গৃহকর্তীকে আলো জ্বালাতে বললেন। অতঃপর দু'রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করলেন, 'ওগো আল্লাহ, আমি যে তোমার পছন্দনীয় ইসলামের নিয়মানুযায়ী আমার এই হিন্দু বিচারের ভার নিজ হস্তে সুসম্পন্ন করতে পারলাম তার জন্য তোমার অশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।' পরে হিন্দু প্রজা তাঁকে আলো নিভানো ও জলপান করার কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, স্নেহসিক্ত ভাগ্নের শিরশ্ছেদের পথে মায়া মমতার কোনো বাধা সৃষ্টি না হয় তার জন্যই ছিল আলো নিভানোর নির্দেশ। আর আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার অভিযোগের সুবিচার করতে পারছি ততক্ষণ জল স্পর্শ করব না; তাই এর মাথা কেটেই জলপান করতে চেয়েছিলাম, কারণ আমি তখনও অভুক্ত ও পিপাসায় কাতর ছিলাম। আরও অবাক হওয়ার কথা এই যে, হতভাগ্য যুবক আমার কোনো ভাগ্নে না, সামান্য একজন রাজকর্মচারী মাত্র। ইসলামের এরকম বিচারপদ্ধতি দেখে সম্রাটের প্রজারা সেদিন আশ্চর্যান্বিত ও হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন।' [৫৩] ঘটনাটি প্রখ্যাত ইংলিশ ঐতিহাসিক Edward Gibbon তার 'The History of Decline and Fall of the Roman Empire'

নামক বিশ্বখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থেও সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।[৫৪]

উক্ত চমকপ্রদ ঘটনার মধ্যে আমরা বেশ কয়েকটা দিক দেখতে পাই। সেগুলো হলো;

এক: সুলতান মাহমুদ তার রাজ্যে বিচারব্যবস্থাকে সহজলভ্য করেছিলেন এবং একেবারে তৃণমূল পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন।

দুই: সুলতান মাহমুদ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও কার্যকরের বিষয়টা নিজের কর্মচারীদের ওপরে ন্যস্ত করে চুপচাপ বসে থাকেননি, বরং তিনি নিজেই তা নিশ্চিত করতে সর্বদা তৎপর ছিলেন।

তিন: তার রাজ্যের হিন্দু প্রজাদের মনেও তার ওপর আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। তিনি তার অমুসলিম প্রজাদেরও আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছিলেন।

চার: তিনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখতেন। ধর্ম ও আদর্শের ভিন্নতা তার কাছে সাম্য, সমতা ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

পাঁচ: সুলতান মাহমুদের চিন্তা ও চেতনায় আল্লাহভীতি সদা জাগ্রত থাকতো। প্রজাদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হলে আল্লাহর কাছে যে তাকে জবাবদিহি করতে হবে, সে চিন্তায় তিনি কাতর থাকতেন। তার চরিত্রের এই দিকটি আমাদের জানা থাকলে সুবিধা এই যে, তাকে বিচার করাটা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। ঐতিহাসিকদের মিথ্যা উপস্থাপনা ও ইতিহাস বিকৃতিকে মোকাবেলা করা সম্ভবপর হয়।

ছয়: সুলতান মাহমুদের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও লক্ষ্য অর্জনে অবিচলতা এই ঘটনার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার ফুটে ওঠে।

তেরো

যাহোক, অবশেষে ১০১৩ সালে পুনরায় মাহমুদের আগ্রাসনের মুখে রাজা আনন্দ পালের পুত্র ত্রিলোচন পালের পালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে এই রাজবংশের চূড়ান্ত পতন হয়।

মাহমুদ ভারতবর্ষের সামনে, বিশেষ করে ভারতীয় হিন্দুদের সামনে ইসলাম যে একটা অজেয় রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি, সে বিষয়টি তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। ভারতের আগামী দিনের ইতিহাসে এই ইসলামের সাথেই যে তাদের বোঝাপড়া করতে হবে, সে বিষয়টা সুলতান মাহমুদই সর্বপ্রথম সম্মিলিত হিন্দুজোট নেতাদের সামনে তুলে ধরেন।

প্রায় দুই শত বৎসরেরও বেশি সময় ধরে রাজত্ব করার পরে এই গজনীর শাসকরা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ে। আর এ সুযোগে ১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঘোরি লাহোর দখল করে সেখানে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এরও প্রায় সাত বৎসর পরে এসে ১১৯২ সালের শেষ দিকে এসে তিনি দিল্লি দখল করে সেখানে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

সঠিকভাবে বললে বলতে হয় ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিতে ইসলামি সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়। [৫৫]

এই শাসনব্যবস্থা কতটা ইসলামি শাসন ছিল সেটা অবশ্য বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। তারপরেও মুহাম্মদ ঘোরি যে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, তা তিনি ইসলামি অনুশাসনের উপরে ভিত্তি করেই করেন, যদিও তার শাসনব্যবস্থায় ইসলামের অনেক বিধি বিধান তিনি কার্যকর করতে পারেননি, বা করেননি।

সমসাময়িক মুসলিম ঐতিহাসিক ইবনে আসিরের লেখা থেকে তথ্য দিয়ে প্রখ্যাত আধুনিক ঐতিহাসিক John Keay আমাদের জানাচ্ছেন; মুহাম্মদ ঘোরি কর্তৃক দিল্লি দখল করার অনেক আগে, সুলতান মাহমুদের বাবা সবুক্তিগীনের আমল থেকেই বারনসী ও দিল্লি এবং তার আশপাশের এলাকায় মুসলমান ব্যবসায়ী জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল।[৫৬]

স্থানীয় রাজাগণ এইসব মুসলমানদের ওপরে 'তুরস্ক ট্যাক্স' বা 'তুরস্ক কর' নামে এক ধরনের কর চাপিয়ে দিয়েছিলেন এবং মুসলমানদের এই কর পরিশোধ করতে হতো।[৫৭]

এ করকে 'তুরস্ক কর' হিসেবে নামকরণের কারণ সম্ভবত এটা যে, তুরস্ক ছিল ওসমানীয় খেলাফতের সমার্থক, এর ধারক বাহক। তুর্কি বলতেই মুসলমানদের বা মুসলিম খেলাফত সংক্রান্ত বা ইসলামি খেলাফত সংক্রান্ত কিছু একটা বোঝানো হতো। 'তুরস্ক কর' মানেই হলো ওসমানীয় খেলাফতের নাগরিকদের ওপরে আরোপিত কর। এ নাগরিকরা আফগান বা উজবেক বা

খোদ তুরস্কের বা অন্য যে কোন স্থানেরই হোক না কেন। মোদ্দাকথা হলো, এটা ছিল দিল্লিতে বসবাসরত মুসলমানদের ওপরে আরোপিত কর।

কেবলমাত্র ভিন্নধর্মী হওয়ার কারণে ভিনদেশী বণিক মুসলমানদের ওপরে একটা অন্যায্য কর বসানো হয়েছে ভারতীয় হিন্দু রাজাগণ কর্তৃক, তা বৎসরের পর বৎসর ধরে আদায়ও হয়েছে, সে বিষয়টি নিয়ে কেউ কোনদিন বিন্দু পরিমাণ উচ্চবাচ্য করেনি, সমালোচনা তো দূরের কথা। ইতিহাসের পাতায়ও খুব একটা তুলে ধরেনি।

ঐতিহাসিকদের এই যে নিস্পৃহতা, এটা কিন্তু বজায় থাকবে না মুসলমান রাজা বাদশাহগণ কর্তৃক হিন্দু প্রজাদের উপরে (কেবলমাত্র সক্ষম পুরুষদের উপরে) যিজিয়া ধার্য করার পরে। উল্লেখ্য, এই জিযিয়া কর আরোপ হতো রাষ্ট্রের সাথে করদাতার সুনির্দিষ্ট কিছু শর্তের ভিত্তিতে, অর্থাৎ রাষ্ট্র ও করদাতা উভয়ের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মত একটা বিষয়।

এখানে রাষ্ট্র বাহ্যিক আগ্রাসন বা অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা উভয় ক্ষেত্রে করদাতার সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করবে। এর বিনিময়ে করদাতা রাষ্ট্রের পক্ষ হয়ে সামরিক দায়িত্ব পালন করা হতে অব্যাহতি পাবে। কোনো কারণে রাষ্ট্র যদি এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তা হলে করদাতা অমুসলিম নাগরিক জিযিয়া বাবদ প্রদত্ত সমুদয় অর্থ রাষ্ট্র থেকে ফেরত পাবেন। আর এই কর অক্ষম, বৃদ্ধ, নারী, শিশু এদের উপরে আরোপিত হবে না।

সম্রাট আকবর হিন্দু প্রজাদের উপর থেকে ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে যখন এই কর তুলে দেবেন তখন তিনি একজন প্রজাহিতৈষী শাসক হিসেবে বরিত হবেন।

কিন্তু সেই একই সময়ে এই আকবরই চিতোরে 'সাবাত' নামক দুর্ভেদ্য সামরিক দুর্গ নির্মাণের জন্য তার হিন্দু শ্রমিকদের ঠেলে দেবেন। সেখানে, এই দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে কাজের পরিবেশ এতটাই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল যে, এই নির্মাণ কাজে অংশ নিতে গিয়ে প্রতিদিন গড়ে দুই শত শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছে![৫৮]

দিল্লিতে নবপ্রতিষ্ঠিত এই সালতানাত, নবপ্রতিষ্ঠিত এই 'মুসলিম শাসনব্যবস্থা' থেকে প্রকৃতপক্ষে একটা ইসলামি শাসনব্যবস্থায় রূপ নিতে শুরু করে বস্তুত সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মাধ্যমে, তার শাসনামলে। সেটা ছিল চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়; ১৩৫১ এর দিক থেকে।

মুহাম্মদ বিন তুঘলক ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান একজন সুন্নি মুসলমান। নিজে কুরআনের হাফেজই কেবল ছিলেন না। ছিলেন একজন হাদিস বিশারদ এবং মোটামুটি মানের একজন ফকিহও। প্রিয় রাসূল (সা:) এর সুন্নতের তিনি ছিলেন কঠোর অনুবর্তী। সুন্নতের বরখেলাফ বিন্দুমাত্র সহ্য করতেন না তিনি। তার শাসনামলে নারীর পর্দাকে যেমন তিনি

কঠোরভাবে প্রয়োগ করতেন তেমনি মদ পান, উৎপাদন ও বিপণন থেকে নিজের শাসনব্যবস্থাকে তিনি মুক্ত রেখেছিলেন।

তার সময়ে আইন শৃঙ্খলার ব্যাপক উন্নতি যেমন হয়েছিল তেমনি সাধারণের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করেছিলেন। তিনি হিন্দু প্রজাদের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করেছিলেন, কেবলমাত্র এই কারণেই তিনি সতীদাহ প্রথাকে বিলুপ্ত করতে চেয়েও পারেননি। পাছে সেটা হিন্দু ধর্মের উপরে হস্তক্ষেপ বলে বিবেচিত হয়। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকই সেই শাসক, যিনি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় নামাজ প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত করেন।[৫৯]

যা হোক, আমরা এটা এমন একটা সময়ের কথা বলছি, যে এই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এসে ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রায় পুরো অঞ্চল জুড়েই বিভিন্ন 'সালতানাত' প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

এসব সালতানাত তাদের আশপাশের এলাকায় বিভিন্ন সময় সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছে। জয় পরাজয়ের সূত্র ধরে তাদের হাতে দাস হিসেবে বিভিন্ন নারী-পুরুষ এসেছে। এইসব নারী-পুরুষদেরকে দাস হিসেবে তারা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে বিক্রি করে দিয়েছে, অথবা অন্য কোনোভাবে চালান করে দিয়েছে (বিনিময় বা উপঢৌকন হিসেবে)।

এরই ধারাবাহিকতায় ভারতের মুসলিম সুলতানরা মধ্য এশিয়া থেকে দাস নিয়ে এসে ভারতে তাদের নিজেদের কাজে ব্যবহার করবে। নির্মাণ শ্রমিক থেকে শুরু করে বিশ্বস্ত সৈন্য হিসেবে তাদের কাজে লাগাবে। বিশেষ করে, সৈনিক হিসেবে তাদের নিয়মিতভাবে সামরিক কাজে, তথা যুদ্ধে ও রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধানের কাজে ব্যবহার করবে।

এভাবে ভারতের বাইরে থেকে বিভিন্ন সময় মুসলিম নারী-পুরুষ এসে ভারতের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত সালতানাতগুলোতে আবাস গাড়বে। এভাবেও অনেক মুসলমানের আগমন ঘটবে।

আফগান ইরান তুরস্ক ছাড়াও আফ্রিকার ইথিওপিয়া থেকে কিছু নিগ্রো মুসলমান ভাগ্যচক্রে এসেছিল ভারতে। তারা ভাগ্য সন্ধানে সম্পদ, নাম যশ খ্যাতির জন্য আসেনি। তাদেরকে আনা হয়েছিল তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে; দাস হিসেবে। এনেছিলেন আকবরেরই পূর্বসূরি চেঙ্গিজ খান।

আবার এর বাইরেও একটা চিত্র আছে বটে। নবপ্রতিষ্ঠিত সালতানাতগুলো তথা রাষ্ট্রশক্তিগুলো যখন ক্ষমতা, সম্পদ সুযোগ প্রভাব আর প্রতিপত্তির উৎসস্থল হয়ে উঠলো তখন অনেক স্থানীয় হিন্দু, বিশেষ করে নিম্নবর্ণের হিন্দু, যাদের সামনে ভারতীয় সমাজের জাতিভেদ প্রথার কারণে জীবনেও প্রভাবশালী বা কর্তৃত্বশীল হওয়া সম্ভব ছিল না, নিজের বা নিজেদের

আর্থসামাজিক অবস্থা তথা ভাগ্য বদলের সুযোগ ছিল না, সেই তারাও কেউ কেউ উন্নত সুযোগ সুবিধা, উন্নত জীবন, সামাজিক ও মানবিক মর্যাদা প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখে ইসলাম গ্রহণ করে রাষ্ট্রশক্তির কাছাকাছি চলে আসে। এদের মধ্যে যারা যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছে, তাদের যথাযথ মূল্যায়নও করেছেন মুসলিম শাসকগণ। এরকমই একজন ছিলেন মালিক কাফুর।

দিল্লির সুলতান আলাউদ্দীন খিলজির দাস, মালিক কাফুরকে তিনি যোগ্যতা ও দক্ষতার কারণে নিজের একটা বাহিনীর প্রধান সেনাপতি বানিয়ে ১৩০৯ খ্রিষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য অভিযানে পাঠান। এই মালিক কাফুর একজন হিন্দু ছিলেন এবং গুজরাটের এক যুদ্ধে ১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দে মোগল বাহিনীর হাতে ধৃত হয়ে দাস হিসেবে দিল্লিতে আসেন। পরে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

পরে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি তার সাহস, সামরিক দক্ষতা ও বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হয়ে তাকে সেনাবাহিনীর উচ্চপদে নিয়োগ দেন। আর মালিক কাফুরও তার প্রতি সুলতানের এই আস্থা ও সম্মানের যথাযথ প্রতিদান দেন আমৃত্যু বিশ্বস্ত থেকে। তিনিই দাক্ষিণাত্যে দিল্লির মুসলমান সুলতানের পক্ষ থেকে ইসলামি শাসনকে নিয়ে যান, অন্ততপক্ষে বলা চলে, এর সূত্রপাত করেন, অথচ মালিক কাফুর ছিলেন একজন হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান!

যা হোক, ভারতের বাইরে থেকে ভিন্নধর্মী, ভিন্নভাষী ভিন্ন সংস্কৃতির এসব মানুষের আগমনের ফলে ভারতজুড়ে এক নীরব, কিন্তু সুদূরপ্রসারী সামাজিক পরিবর্তনের ধারা সূচিত হলো। এর প্রভাব ও রেশ যে কতটা ব্যাপক ও গভীর হবে বা হতে পারে এ বিষয়টি উপলব্ধি করাটা সে সময়ে কারো পক্ষেই সম্ভবপর হয়নি। কেউ সেটা চিন্তাও করেনি। ভারতীয় সমাজ কখনই উন্মুক্ত ও উদার সমাজ ছিল না। এ সমাজ ছিল বরাবরই গোষ্ঠী ও বংশধারা কেন্দ্রিক। একই ধারা বিরাজমান ছিল আরবের প্যাগান সমাজেও ইসলামপূর্ব যুগে। সে ধারায় একটা নীরব, কিন্তু গতিশীল পরিবর্তনের সূচনা হয় ইসলামি সমাজ বিস্তারের সাথে সাথে। কারণ, ইসলাম কোনো গোষ্ঠী বা বংশ বা জন্মসম্পর্ক সূত্রে সমাজ তৈরি করে না। ইসলামি সমাজ তৈরি হয় একটা আদর্শকে কেন্দ্র করে। সমাজ গঠন, পরিচালনা ও বিকাশের এ ধারা ভারতের মাটিতে অজানা ছিল। সেই অজানা ধারার সাথেই এখন পরিচিত হতে শুরু করলো শতধা বিভক্ত ভারতীয় সমাজ। এই যে একটা অজানা পরিবর্তনের সূচনা ভারতীয় সমাজ দেখতে শুরু করলো, তার প্রতিক্রিয়াটা কিন্তু ব্যাপক ও প্রগাঢ় হবে ভারতীয় রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা, শিক্ষা-সংস্কৃতিসহ সাবির্ক জনজীবনে, বলা চলে, জীবনের সার্বিক স্তরে।

একটা মাত্র উদাহরণ দেই। ভারতের বাইরে থেকে ভিন্নধর্মী, ভিন্নভাষী একজন মাত্র সাধক পুরুষের আগমনের পথ ধরে পুরো ভারতীয় সমাজ, বিশেষ করে হিন্দু সমাজ কিভাবে এবং কতটা প্রভাবিত হবে, বা হতে পারে বা হয়েছে, সে বিষয়টা উপলব্ধির পথে এ উদাহরণটা সহায়ক হবে বলে মনে করি।

ঠিক এরকম একটা সময়ে প্রখ্যাত সুফী সাধক হযরত খাজা মইনুদ্দীন চিশতী (রহ:) লাহোরে আসেন। সেখান থেকে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মুলতানে যান। মুলতানে তিনি পাঁচ বৎসর অবস্থান করে ভারতীয় এলিট সমাজের সংস্কৃতসহ বেশ কয়েকটি ভারতীয় ভাষা শেখেন।[৬০]

ভারতীয় ভাষা শেখার ফলে ভারতীয়দের মাঝে তাদেরই ভাষায় ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়াটা তার পক্ষে অতি সহজ হয়ে পড়ে। তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, নির্লোভ ও অতি সাধারণ চাল চলন এবং অতি উন্নত ব্যবহারের কারণে নানা ধর্মাবলম্বী ভারতীয় জনগণ তার শিষ্য ও ভক্তে পরিণত হয়। এ সময় তিনি রাজস্থানের আজমিরে আসেন এবং সেখানেই স্থায়ী হন।

ভারতীয় সমাজে এই মহান সাধকের খ্যাতি ও যশ এবং প্রভাবের এতটাই বিস্তার ঘটবে যে, তার ইন্তেকালের পরেও তিনি ভারতীয় সমাজে সাধারণ জনতা থেকে রাজা রাজড়ার জীবনকেও প্রভাবিত করে রাখবেন।

আগেই বলেছি, এর মাত্র বৎসর চারেক আগে, ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঘোরি দিল্লি দখল করে সেখানে ইসলামি সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। আজমির তখন দিল্লি সালতানাতের অংশে পরিণত হয়।

সম্রাট আকবরও চিতোর দুর্গ জয় করার পর প্রায় চল্লিশ হাজার বন্দি রাজপুতকে ঠাণ্ডা মাথায় মৃত্যুদণ্ড দানের মাধ্যমে হত্যা করে তার বিজয়টাকে উদযাপন করতে পায়ে হেঁটে আসবেন দিল্লি থেকে আজমিরে হযরত মইনুদ্দীন চিশতি (রহ:) এর মাজারে![৬১]

চৌদ্দ

প্রসঙ্গত এটাও বলে রাখি যে, এর পরেও তিনি পর পর ছয়বার প্রতি বৎসরই বাৎসরিক ওরসে হাজির হয়েছেন। শুধু তাই নয়, ওরস সম্পাদনে সম্রাট আকবর অঢেল অর্থও বরাদ্দ করেছেন রাজকোষ থেকে। তারই কারণে আগ্রা থেকে আজমির পর্যন্ত পুরো রাস্তাটাই বিশেষভাবে সাজানো হয় সুউচ্চ মিনার ও সেনাচৌকির দ্বারা। [৬২]

স্বয়ং সম্রাটের উৎসাহ ও আগ্রহ দেখে সাম্রাজ্যের আমির ওমরাহ থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণও ওরস নামক এই সব ইসলাম বিরুদ্ধ কর্মকাণ্ডে অতি উৎসাহের সাথে জড়িয়ে পড়ে কালক্রমে। অবস্থা এক সময় এমনই এক পর্যায়ে গিয়ে পৌছায় যে, সাধারণ মানুষ মনে করতে থাকে এইসব ওরস বোধ হয় ইসলাম ধর্মের একটা অনবির্য অনুষঙ্গ!

আকবরের চিন্তা-চেতনার উপরে এই সাধু দরবেশরা এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করে রাখবে বেশ কিছুদিনের জন্য। খাজা মঈনুদ্দিন চিশতীর শিষ্য ও সেই একই মতাদর্শী ফকির শেখ সেলিম চিস্তির এক দারুণ ভক্তে পরিণত হবেন তিনি।

বিভিন্ন রানীর গর্ভে পরপর কয়েকটা সন্তান হয়ে আঁতুড় ঘরেই তারা মৃত্যুবরণ করলে ছাব্বিশ বৎসর বয়সী সম্রাট আকবর তার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকার নিয়ে দারুণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়বেন। ঠিক এ সময়েই তিনি এই সাধক দরবেশ শেখ সেলিমের কাছে তার দোয়া চেয়ে ধরনা দেবেন। আর শেখ সেলিমও তাকে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলবেন যে, আকবরের একটি নয়, তিন তিনটি পুত্র সন্তান হবে।

হয়েছিলও তাই। এর মাত্র কিছুদিন পরেই আকবরের রাজপুত হিন্দু স্ত্রী; রাজপুত রাজা আম্বারের কন্যার গর্ভে এক পুত্র সন্তানের জন্ম নিলে (আগস্ট, ১৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দ) আকবর তার সেই পুত্রের নাম রাখবেন, এই দরবেশের নামানুসারে; সেলিম। ভবিষ্যৎ সম্রাট জাহাঙ্গির।

শেখ সেলিম চিস্তির ভবিষ্যদ্বাণী এক এক করে ফলে গেছে পরের চার বৎসরেই। ১৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় পুত্র মুরাদ এবং ১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় পুত্র দানিয়েল জন্মগ্রহণ করার মাধ্যমে।

এর আগে জন্ম নেয়া শিশুগুলো আঁতুড় ঘরেই মৃত্যুবরণ করেছে বিধায় আকবর এবারে পুত্র সেলিমের জন্মের পরে আর কোনো ঝুঁকি নেননি। তিনি দীর্ঘ পাঁচ মাস শিশু সেলিম ও তার মাকে দরবেশ শেখ সেলিম চিস্তির আখড়াতেই (সিক্রিতে) রেখে দেন রাজদরবারের কর্মচারী, প্রহরীসহ। শেখ বাবার পক্ষ থেকে বরকত ও ফাজায়েল হাসিলের জন্য।

শেখ সেলিমের উপরে আকবরের আস্থা ও বিশ্বাস এতটাই প্রগাঢ় হয়ে উঠলো যে, তিনি আগ্রার তেইশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সেই পল্লীকে একটা অত্যাধুনিক মোগল শহরের রূপ দেয়ার উদ্যোগ নিলেন। রাজকোষ উন্মুক্ত করে অর্থ খরচ করলেন। তৈরি হলো আধুনিক ভারতের ঐতিহাসিক শহর 'ফতেহপুর সিক্রি'।

শাহজাদা সেলিমের (জাহাঙ্গির) জন্ম নেয়ার ঘটনায় আকবর এতটাই খুশি হন যে, তিনি আগ্রা থেকে আজমির পর্যন্ত দীর্ঘ চারশত কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে গেছেন হযরত খাজা বাবার মাজার জেয়ারত ও সেখানে বিশেষ দোয়া করতে![৬৩]

আর নিয়তির কি নির্মম পরিহাস! সেই পুত্র জাহাঙ্গীরই ক্ষমতা পেতে অধৈর্য হয়ে নিজ পিতা আকবরকে বিষ প্রয়োগে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা করবেন, বাবা আকবর মৃত্যুবরণ করলে তিনি সিংহাসনে বসতে পারেন! [৬৪]

সম্রাট আকবরের বহু কাঙ্ক্ষিত এই তিন তিনটি সন্তানই তার গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে সময়ের পরিক্রমায়। তার সাংসারিক ও মানসিক শান্তি যেমন তিরোহিত হবে, তেমনি তিরোহিত হবে ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। আমরা যথাস্থানেই তা আলোচনা করবো।

আপাতত ফিরে যাই আমাদের পূর্ব আলোচনায়। হিন্দু অধ্যুষিত ভারতীয় সমাজে বহির্বিশ্ব হতে ভিন্নভাষী মুসলমান অভিবাসী আসা ও এ সমাজে প্রভাব বিস্তারকারী হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার শত শত ঘটনার মধ্যে আরও একটা উদাহরণ দিতে চাই সেটা হলো মালিক আম্বারের ঘটনা। তিনি ছিলেন একজন আফ্রিকান নিগ্রো।

সেই ইথিওপিয়া থেকে নিগ্রো দাস মালিক আম্বার বাগদাদ হয়ে ভারতে আনীত হবেন তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, একজন বন্দী দাস হিসেবে। নানা হাত বদল হতে হতে তিনি শেষ পর্যন্ত চেঙ্গিজ খানের হাতে পড়েন। একজন আফ্রিকান নিগ্রো হওয়া সত্ত্বেও তিনি ১৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে আহমদনগরের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন।[৬৫]

ভিনদেশি, ভিন্নবর্ণ, ভিন্ন মতাদর্শী মুসলমান ও ভিন্ন বংশীয় হওয়া সত্ত্বেও তার সামরিক যোগ্যতার কদর হয়। এই যে ধারা, এটা ভারতীয় সমাজে এর আগে অপরিচিত ছিল। এ সমাজে একমাত্র স্বীকৃত যোগ্যতা ছিল উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নেয়া।

আর এই যে বংশ পরিচয়, এর উপরে কারো কোনো হাত ছিল না। নিম্নবংশের কারো উপায় ছিল না যে, নিজের চারিত্রিক গুণাবলী বা মানবিক বুদ্ধি, দক্ষতা বা কলাকৌশল কিংবা যোগ্যতা দেখিয়ে বংশের স্তর পরিবর্তন

করবেন তথা, নিম্ন বংশ হতে উচ্চ বংশে উত্তীর্ণ হবেন।

জাত বিচারের এই যে স্তর, তা ছিল অনতিক্রম্য। সমাজের একেবারে নিম্নস্তর বা নিম্ন বংশ হতে উঠে এসেও কেউ যে কেবলমাত্র নিজের যোগ্যতার বলে সমাজ ও প্রশাসনে সম্মানজনক আসন গড়ে নিতে পারে, সেই বোধটাই ছিল এদের কাছে অজানা।

এভাবে এক এক করে পুরো ভারতে মুসলিম মতাদর্শী যেমন ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তেমনি সেইসব মুসলমানরা ভারতীয় রাজনীতিতেও জড়িয়ে পড়তে থাকে এবং একটা সময় সহসা এই সংখ্যালঘু বহিরাগত মুসলমানরাই ভারতীয় রাজনীতি ও ক্ষমতার নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হয়।এরই ধারাবাহিকতায় ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ এসে সামান্য কিছু অংশ ব্যতিরেকে বলা চলে পুরো ভারতবর্ষ সাতটি সালতানাতের মাধ্যমে মুসলিম নিয়ন্ত্রণে এসে যায়।

এই সাতটি সালতানাত হলো; দিল্লি, বাংলা, গুজরাট, দাক্ষিণাত্য, খানদেশ (আধুনিক ভারতের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের বুরহানপুর এলাকা), মুলতান এবং কাশ্মির। এর বাইরে মাত্র দুটো রাজ্য হিন্দু শাসিত ছিল, সেগুলো হলো, উত্তর ভারতের রাজপুতদের মেওয়া (আধুনিক ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যের কাপুরতলা জেলা) এবং দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর (ভারতের ব্যাঙ্গালোর-এর সন্নিকটে)।[৬৬]

এতো গেলো ভারতের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল ও উত্তরাঞ্চলের কথা। আবার দশম শতাব্দীর প্রথমদিকে ভারতের পূর্ব প্রান্তে বাংলাদেশেও যে মুসলমান সম্প্রদায়ের উপস্থিতি রয়েছে, সেটা তো আরব ভূগোলবিদ মাসুদির লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক পন্ডিত রিচার্ড এম ইটন তার 'ইসলামের অভ্যুদয় ও বাংলাদেশ (১২০৪-১৭৬০) নামক গ্রন্থে'।[৬৭]

বাংলা অঞ্চলে, বিশেষ করে, বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা, আরাকান, চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ অঞ্চলে ব্যবসায়ী আরব মুসলমানের উপস্থিতি ছিল সেটা আমরা জানি। এই জনগোষ্ঠী রাজনৈতিকভাবে না প্রতিষ্ঠিত ছিল, আর না তারা সেভাবে সংঘবদ্ধ ছিল, স্থানীয়ভাবে নিয়ামক ভূমিকা পালনের তো প্রশ্নই ওঠে না।

সম্রাট আকবরকেও আফগান সেনাপতি শেরশাহ কর্তৃক বাংলা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত যে ইসলামি রাজনৈতিক শক্তিকে মোকাবেলা করতে হবে, সেই ইসলামি রাজনৈতিক শক্তি নিয়ে বাংলার মঞ্চে আবির্ভূত হন দিল্লির সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার

খিলজী ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে।

তুর্কি-আফগান বংশোদ্ভূত বখতিয়ার খিলজি আফগানিস্তানের দশত-এ-মার্গ-এ জন্মগ্রহণ করেন অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে। গজনীতে সুলতান মুহাম্মদ ঘোরির অধীনে চাকরির প্রত্যাশায় বেশ কিছুদিন সেখানে কাটান কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ভাগ্যের সন্ধানে দিল্লিতে আসেন।

গজনী ছিল তখন মধ্য এশিয়া ও ভারতের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। এখানেই বখতিয়ার খিলজি ফখরুদ্দিন আল রাজির রাষ্ট্রচিন্তার সাথে পরিচিত হন।

একজন দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রখ্যাত পারসিক রাষ্ট্রচিন্তক ফখরুদ্দিন আল রাজি (জন্ম ১১৫০ রাঈ, বর্তমান ইরান-মৃত্যু ১২১০, হেরাত, বর্তমান আফগানিস্তান)। আল রাজির রাষ্ট্রচিন্তা ও দর্শন দ্বারা সমসাময়িক পারসিক সমাজ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিল। সমকালীন গজনীর সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবী মহলের উপর আল রাজির চিন্তাধারা, তার দর্শন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল।

ফখরুদ্দিন আল রাজি তার বিখ্যাত জামি আল উলুম গ্রন্থে রাষ্ট্র, সরকার, ক্ষমতা, সেনাবাহিনী, আইন-আদালত ও রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সে সাথে তাদের বিশেষ করে, রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা অতি সংক্ষেপে কিন্তু চমৎকারভাবে বিবৃত করেছেন, এভাবে;

বিশ্বটা বাগান একটা, রাষ্ট্র হলো মালি যার-
রাষ্ট্রই হলো ক্ষমতা, আইনই অভিভাবক তার।
আইন একটা নীতি, যা রক্ষা করে রাজত্ব-
রাজত্ব একটা নগর, আগলে রাখে সৈন্য সামন্ত।
সৈন্যদল গঠন নিশ্চিত করে সম্পদ; মাল-
সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যম প্রজা; রায়ত-
প্রজাদের সেবক বানায় ইনসাফ, আদালত।
ইনসাফ থাকলেই বাগান হয়ে গড়ে উঠে এ পৃথিবী!
(ফখরুদ্দীন আল রাজি তার জামি আল উলুম গ্রন্থে)

বখতিয়ার খিলজি গজনীতে থাকাবস্থায় মুহাম্মদ ঘোরির সেনাদলে চাকরি না পেলেও জীবনদর্শন হিসেবে এই চমৎকার বোধ আর শিক্ষাটা পেয়েছিলেন। এই দর্শনের ভাবশিষ্য ছিলেন মুহাম্মদ বখতিয়ার।[৬৮]

তিনি বাংলা জয় করে এখানে যে শাসনব্যবস্থা ও প্রশাসন গড়ে তুলবেন সেই শাসনব্যবস্থা ও প্রশাসনে এই দর্শনের প্রভাব পড়বে পুরোমাত্রায়। এ সময়কার শাসনব্যবস্থায়, বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শুরুর

দিকে প্রশাসন, আইন কানুন এবং তার বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াতে ইসলামি বিধি-বিধান ও চিন্তা-চেতনার ছাপ ছিল সুস্পষ্ট। পরবর্তীতে বিকৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই শাসনব্যবস্থা ছিল ইসলামি শাসনব্যবস্থা এবং ভারতীয় সমাজে, বিশেষ করে, বাংলায় অভূতপূর্ব, নতুন এক যুগের সূত্রপাত।

এর কারণও রয়েছে। বাংলায় মুহাম্মদ খিলজির সাথে যাদের সংঘাত হচ্ছে, সেই তারা তথা বল্লাল সেন ছিলেন সেন রাজবংশের রাজা। সেনরা স্থানীয় ছিল না। তারা ছিল দক্ষিণভারতীয় (আধুনিক ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্নাটক রাজ্য) উচ্চবর্ণের হিন্দু ব্রাহ্মণ। এরা একাদশ শতকের মধ্যভাগে বাংলায় এসে পাল রাজবংশকে উৎখাত করার মাধ্যমে নিজেদের হাতে ক্ষমতা নেয়।

ক্ষমতা হাতে পেয়ে সেনরা বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অনুসারী পালদের উপরে ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাযজ্ঞ চালায়। স্থানীয় অধিবাসীদের উপরে হিন্দু ধর্ম চাপিয়ে দেয় এবং হিন্দু জাতপ্রথার নিগড়ে বেঁধে ফেলে।[৬৯]

বস্তুত বাংলার তৎকালীন শাসক এই সেন রাজাদের সাথে স্থানীয় অধিবাসীদের দা-কুমড়া সম্পর্কই বহিরাগত মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির অভিযানকে সহজ করে তোলে। কারণ, সেন রাজাদের সাথে বাংলার জনগণের কোনো আত্মিক বা মানসিক সংযোগ ছিল না। অত্যাচারী রাজা ও তার রাজ্যের প্রতিরক্ষায় স্থানীয় জনগণের কোন রকম অংশ না নেয়াটাই ছিল এত সহজে, বলা চলে একরকম বিনা বাধায় বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বাংলা বিজয়ে সফল হওয়ার পেছনে মূল কারণ।

বহিরাগত সামরিক আগ্রাসনের প্রতি এই যে নীরব সমর্থন, এটাই প্রমাণ করে যে, বখতিয়ার খিলজির সামরিক অভিযানকে বাংলার জনগণ সমর্থন জানিয়েছেন। এটা তো ঐতিহাসিক সত্য যে, তারা কোনো প্রতিরোধই খাড়া করেননি। তারা বরং বখতিয়ার খিলজির বাংলা দখলের ঘটনাকে নিজেদের মুক্তির পথ হিসেবেই দেখছেন। একজন হিন্দু পণ্ডিতের কথাতেও সে সত্যেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

পনের

প্রখ্যাত ভারতীয় পণ্ডিত ঐতিহাসিক এম. এন. রায় এর ভাষায়; 'ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা ভারতীয় জনগণের সমর্থন লাভ করলো। তার কারণ তার পিছনে জীবনের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, হিন্দু দর্শনের চাইতে তা ছিল শ্রেয়; কেননা হিন্দু দর্শন সমাজদেহে এনেছিল বিরাট বিশৃঙ্খলা আর ইসলামই তা থেকে ভারতীয় জনসাধারণকে মুক্তির পথ দেখায়।[৭০]

উদাহরণ দিলে অনেক দেয়া যাবে। ইতিহাসের পাতায় এরকম শত শত দলিল রয়েছে। এমনকি, অমুসলিম পণ্ডিত গবেষকরাই নিরপেক্ষতার স্বার্থে হলেও নিজেদের লেখনীতে, গবেষণায় সে সত্যকে অকপটে ও নির্দ্বিধায় স্বীকার করে গেছেন।

এরকমই একটা উদ্ধৃতি দিয়েছেন প্রখ্যাত হিন্দু ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত শ্রী গোপাল হালদার তার সংস্কৃতির রূপান্তর গ্রন্থে। হিন্দু ও বৌদ্ধ অধ্যুষিত ভারতের মাটিতে ইসলামের এই সহজ বিজয় ও হিন্দুত্ববাদ তথা হিন্দু সমাজের পরাজয়ের কারণ খতিয়ে দেখতে গিয়ে এ পণ্ডিত বলেন; 'এ পরাজয় রাষ্ট্র-শক্তির কাছে নয়, ইসলামের উদারনীতিও আত্মসচেতনতার কাছে।....কারণ ইসলাম কোন জাতির ধর্ম নয়, প্রচারশীল ধর্ম। ইহা অন্যকে জয় করেই ক্ষান্ত হয় না, কোলে তুলে নেয়।' [৭১]

সামাজিক বৈষম্য, অবিচার ও শোষণ থেকে মুক্তির নিশ্চিত সম্ভাবনা ও আহ্বান দেখে বাংলার নিপীড়িত জনতাও দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। সামরিক অভিযান পরিচালনাকারী বাহিনীর আদর্শ গ্রহণ করার ফলে এ জনপদে আগত বাহিনী তথা বখতিয়ারের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর কাজটা সহজ হয়ে পড়ে। বখতিয়ার খিলজি ও তার সভাসদ পর্যাপ্ত সময় পান এতদ্বঞ্চলে প্রশাসনিক সংস্কার কাজে মনোযোগ দেয়ার এবং তারা তা করেছেনও সাফল্যের সাথেই।

বাংলা বিজয় সম্পন্ন করে বখতিয়ার খিলজি এই অঞ্চলের প্রশাসনিক বিন্যাসের দিকে নজর দেন। প্রথমে তিনি পুরো অঞ্চলকে তিনটি বিভাগে ভাগ করে প্রতিটি বিভাগ বা জেলায় একজন করে গভর্নর নিযুক্ত করেন। মুহাম্মদ শিরান খিলজিকে তিনি বীরভূমের, হুসামুদ্দিন খিলজিকে ত্রিহুতের এবং আলি মর্দান খিলজিকে রংপুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গভর্নর নিয়োগ করেন।[৭২] এদের অধীনস্থ এলাকাগুলোকে আবার ছোট ছোট থানায় বিভক্ত করা হয়। বখতিয়ার খিলজি তার বিজয়ের পরে সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন তা হলো, জাত প্রথা তুলে দিয়ে সকলের জন্য সাম্য, ন্যায়বিচার ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম

গ্রহণ করা শুরু করে। তিনি রাজ্যের অধিবাসীদের জন্য খানকাহ, স্কুল, মক্তব, মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

রাষ্ট্রক্ষমতা, শাসক ও শাসন ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক, ন্যায়বিচার নিশ্চিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা এবং আইন ও বিচারের সামনে শাসকের আত্মসমর্পণ, এসব যে কেবল কথার কথা ছিল না, বরং প্রকৃত অর্থেই ভারতবর্ষের আনাচে কানাচে, যেখানেই ইসলাম মতাদর্শী তথা মুসলমান শাসক সম্প্রদায় গেছেন তা বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন, তার বহু প্রমাণ রয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

এই ইতিহাসটাকেই আমাদের সামনে তুলে ধরা হয় না। হয় না তার পেছনেও রয়েছে এক কুৎসিত ও কদর্য মন এবং মানসিকতা। সত্যকে গোপন রাখার বা বিকৃত করার প্রবণতা। সেই স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসকে চেপে রেখে এর পরিবর্তে আকবর যে পক্ষপাতিত্বপূর্ণ, একদেশদর্শী বিচার বা বিচারের নামে প্রহসন চালু করবেন, সেটাকেই ইসলামের ইতিহাস হিসেবে তুলে ধরা হবে।

বখতিয়ার খিলজির পরবর্তী সময়ে বাংলায় মুসলিম শাসকগণ ন্যায়বিচার ও রাষ্ট্র এবং আইনের মধ্যে কেমন সম্পর্ক বজায় রাখতেন, সে বিষয়টা উপলব্ধির জন্যই বাংলায় মুসলিম শাসনের একটা চমকপ্রদ ইতিহাস তুলে দিচ্ছি দেখুন;

সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ, তিনি বাংলা শাসন করেন ১৩৯১ সাল থেকে ১৪২০ পর্যন্ত। আমাদের এই সুলতানকে আমরা একজন শাসক বলেই জানি, কিন্তু তিনি যে কত বড় উঁচুদরের আলেম ও নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন, সেটা অজানাই রয়ে গেছে।

একদিন সুলতান তার প্রাত্যহিক অভ্যাসমত তীর ছোঁড়ার প্র্যাকটিস করছিলেন। হঠাৎ একটা তীর লক্ষচ্যুত হয়ে অদূরে খেলতে ব্যস্ত বিধবার এক কিশোর ছেলের গায়ে বিদ্ধ হয়। আহত ছেলেকে নিয়ে বিধবা ন্যায়বিচারের জন্য কাজীর দরবারে সুলতানের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেন।

তখন বাংলার কাজী ছিলেন সিরাজুদ্দীন। তিনিও অত্যন্ত উঁচুদরের আলেম ছিলেন। কাজী মামলা পেয়ে তার পেয়াদা দিয়ে সুলতানের কাছে ফরমান পাঠান কাজীর দরবারে হাজির হওয়ার জন্য।

আদালতের পেয়াদা সমন নিয়ে রাজপ্রাসাদে গেলেও রক্ষীদের বাধার কারণে সহজে রাজপ্রাসাদে ঢুকতে না পেরে প্রাসাদের সন্নিকটেই উঁচু মাটির ঢিবির উপরে দাঁড়িয়ে আজান দেয়া শুরু করে।

অসময়ে আজান! প্রাসাদের ভেতর থেকে সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ কারণ জানতে চাইলেন। খোঁজ নিয়ে রক্ষীরা তাকে জানান যে, কাজীর পেয়াদা তার সাথে সাক্ষাৎপ্রার্থী ছিলেন। তাকে পরে আসতে বলা হলে সে রাজপ্রাসাদের বাইরে দাঁড়িয়ে এই অসময়েই আজান দেয়া শুরু করে। সুলতানের নির্দেশে রক্ষীরা তৎক্ষণাৎ পেয়াদাকে সুলতানের কাছে নিয়ে গেলে পেয়াদা তার হাতে কাজীর সমনখানা তুলে দেন।

নির্ধারিত তারিখে সুলতান বিবাদি হিসেবে কাজীর দরবারে হাজির হলে কাজী তাকে বিশেষ কোন খাতির যত্ন না করে বরং আর দশজন বিচারপ্রার্থীর মতই দেখলেন। বিচারে বাদির আর্জি, সাক্ষীসাবুদের বর্ণনা এবং সুলতানের স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি শুনে কাজী বিধবার সন্তানকে আহত করার শাস্তি হিসেবে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেন সুলতানকে। বিনা বাক্যব্যয়ে সুলতান তা মেনে নিয়ে বিধবাকে আদালতের নির্দেশমত ক্ষতিপূরণ দেন।

বিচার কার্যটা এখানে শেষ হলেও ঘটনা কিন্তু এখানে শেষ হলো না। এজলাস থেকে কাজী নেমে এলে সুলতান তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সুষ্ঠু বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজ গায়ের উপর থেকে চাদরের এক কোনা সরিয়ে ছোট্ট একখানা খঞ্জর বের করে তা দেখিয়ে বলে উঠলেন;

'মহামান্য কাজী, ন্যায়বিচার করে আপনি আপনার উপরে অর্পিত দায়িত্ব যেমন পালন করেছেন, তেমনি আমার রাজ্যের মৌলিক ভিত্তিটাকে অটুট রেখেছেন। আল্লাহর কসম, আপনি যদি ন্যায়বিচার না করে আমার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতেন, তা হলে আমি আজ এই খঞ্জর দিয়েই আপনার বিচার করতাম।'

সুলতানের এমনতর মন্তব্য শুনে কাজী সিরাজউদ্দীন এক দণ্ড থামলেন, তার পরে এক পা পিছিয়ে তার এজলাসের পাশে রাখা ছোট টেবিলটার উপর থেকে চাদরটা সরালেন, সেখানে রক্ষিত একটা চাবুক দেখিয়ে সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহকে উদ্দেশ্য করে বললেন; 'মহামান্য সুলতান, আপনি যদি আদালতের বিচার না মানতেন কিংবা আদালতের উপরে কোন রকম প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করতেন, তা হলে এই চাবুক দিয়েই আমি আপনাকে শায়েস্তা করতাম।'

এই ছিল বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা। সেখানে একজন সাধারণ নাগরিকও সুলতানের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারত। বিচারকও নির্দ্বিধায় সুলতানকে সমন পাঠাতে পারতেন।

ওইদিকে সুলতানও একজন সাধারণ নাগরিকের ন্যায় অবলীলায় আদালতে হাজির হয়ে নিজের দোষ স্বীকার করে শাস্তি মাথায় পেতে নিতেন। আর কাজীও কোনো ভয়, কোনো রকম পরওয়া না করেই সুলতানের বিরুদ্ধে রায় দিতে এবং রায় না মানলে বা বিচারে কোন প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করলে সুলতানকে চাবুক দিয়ে শায়েস্তা করার কথা বলতে পারতেন!!

এ ঘটনার মাত্র দুই শত বৎসর পরে এসে মোগল সম্রাট আকবর এই বিচার ব্যবস্থাকে ধ্বংস করবেন। ধ্বংস করবেন এরকম বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পেছনে যে মূল চালিকাশক্তি; সেই দর্শন ও চেতনাকেও।

একটি উন্নত দর্শন এবং সার্বজনীন মানবিক দর্শন: ইসলামি চেতনাকেই তিনি তার রাষ্ট্রশক্তি থেকে নির্বাসিত করবেন। এর ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যান্য সেক্টরের মত বিচারব্যবস্থা থেকেও ন্যায়বিচার, সাম্য ও ইনসাফ তিরোহিত হবে। যার মূল্য কেবল সমকালীন ভারতবাসীই দেবে না, বরং দেবে অনাগত দিবসের কোটি কোটি আদম সন্তানও!

বাস্তবিকই প্রজাদের সেবা থেকে যখন আদালত দূরে সরে যায়, রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে তখন ইনসাফ দূরীভূত হয়। ফখরুদ্দিনের সেই তত্ত্বকথা থেকে অনেক অনেক দূরে সরে যায় সমাজ, সভ্যতা ও রাষ্ট্র!

পুরো ভারতভূমি আকবর ও তৎপরবর্তী রাষ্ট্রনায়কদের অধীনে এসে একটি সুশোভিত বাগান থেকে সাক্ষাৎ নরকে পরিণত হবে যখন, তখন সে তত্ত্বকথার বাস্তব অভিজ্ঞতা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করবে। আর আমরা সেই নরকে বসেই আকবরের সে ইতিহাস চর্চা করতে থাকবো তাকে ইতিহাসের নায়ক বানিয়ে!

একটা কথা বলা বোধ হয় সঙ্গত হবে এখানে, তা হলো এই যে, আমরা যেন মনে না করি যে, ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে সব মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, সেগুলো সবই যে পুরোপুরি ইসলামি দর্শন ও বিশ্বাসকে ধারণ করে সামাজিক সাম্য, ইনসাফ ও ন্যায়বিচার, সার্বজনীন মানবাধিকার, অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করেছে বা করতে পেরেছিল।

আমরা যদি তেমনটা মনেকরি, তবে সেটা হবে ইতিহাসের সাথে বা নিজেদের সাথে আত্মপ্রতারণা মাত্র। ইতিহাসের সঠিক ও নিরপেক্ষ পর্যালোচনা ও উপলব্ধির স্বার্থেই আমাদের এ কথাটা মনে রাখতে হবে যে, ভারতে আগত এইসব মুসলমানদের মধ্যে সকলের নৈতিক মান, ইসলামি জ্ঞান, মানসিক পরিপক্কতা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং তাদের মনে আল্লাহভীতি একই মানের ছিল না।

এইসব মুসলিম সুলতান শাসকরাও আবার ছিলেন বহিরাগত, তাদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা, পরিবার ও পরিবেশের মধ্যে যেমন ভিন্নতা ছিল, তেমনি ভিন্নতা ছিল গোত্র বর্ণ ও ভাষাতেও। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি ছিলেন বৈরীভাবাপন্ন। বৈষয়িক উন্নতি, সম্পদ, যশ ও ক্ষমতাপ্রাপ্তি বা শাসকশ্রেণীর নৈকট্য অর্জনের জন্য বা অন্য কোনো স্বার্থে তারা প্রায়শই একে অপরের সাথে সংঘাত, যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছেন সহজেই। সামান্য স্বার্থের জন্যও এদের অনেকেই পক্ষ বদল করেছেন নীতি ও নৈতিকতার পরোয়া না করেই।

পানিপথে স্বয়ং বাবরের প্রতিপক্ষ ছিলেন ইব্রাহিম লোদি, একজন মুসলমান। আর বাবরপুত্র দ্বিতীয় মোগল সম্রাট হুমায়ুনকেও তাড়া করে ভারত ছাড়া করেছিলেন যিনি, সেই তিনিও একজন মুসলমান আফগান, শের শাহ। উদাহরণ দিলে এরকম আরও অনেক উদাহরণ দেয়া যাবে।

আসল কথা যেটা বলতে চাইছি, সেটা হলো, ভারতবর্ষব্যাপী এই যে এতগুলো শাসনব্যবস্থা, এগুলো নানা জায়গা থেকে ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়ে আসা কিছু সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তি ও গোত্রের শাসনব্যবস্থা। এদের আদর্শিক পরিচিতি ছিল এই যে, এরা বেশিরভাগই ছিলেন মুসলিম জাতিসত্তার সদস্য।

প্রথম দিকের দুই একজন ছাড়া এরা কেউই ইসলামি আদর্শের বিস্তার ও প্রচারের লক্ষ্য নিয়ে ভারতে আসেননি। এসেছেন অর্থ, সম্পদ ও ক্ষমতার লোভে।

কাজেই কেবল ইসলাম ধর্মের অনুসারী বলেই এদের শাসনব্যবস্থা ইসলামি শাসনব্যবস্থা নয়। এরা প্রত্যেকে বা সকলেই নিজ নিজ অধিকৃত স্থানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটা ঠিক নয়। এরা কেউই যে অত্যাচারী বা স্বেচ্ছাচারী কিংবা প্রজা নিপীড়ক হয়ে ওঠেননি, তেমনও নয়। এ মৌলিক কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সঠিক উপলব্ধির জন্য।

ষোল

ভারতীয় এ অঞ্চলে উদীয়মান ইসলামি সমাজের এই যে ক্রমবিস্তার তা হঠাৎ করেই এক অপ্রত্যাশিত ঝড়ে তছনছ হয়ে যায় মধ্য এশিয়া থেকে আগত তৈমুর লং কর্তৃক দিল্লির ও তার আশপাশের এলাকায় পরিচালিত নারকীয় তান্ডবে।

সেই ন্যাংড়া লোকটা; তৈমুর লং এসেছিল দিল্লিতে। এসেছিল এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে, ২২ সেপ্টেম্বর শনিবার, ১৩৯৮, এসে থামলো সিন্ধু নদীর পাড়ে। দুই দিন ধরে চললো নৌকার সাথে নৌকা জোড়া দিয়ে ব্রিজ বানানোর কাজ।

তার সে সৈন্যবাহিনী এতটা বড় ও শক্তিশালী ছিল না যে, তারা ভারতের মত ধনাঢ্য দেশের শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীকে মোকাবেলা করার সাহস করতে পারে। কিন্তু তারপরেও ন্যাংড়া লোকটা জেনে শুনেই এসেছিল, সাহসও করেছিল।

সাহস করার যথেষ্ট কারণও ছিল। প্রায় দশ বৎসর হলো সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ইন্তেকাল করেছেন। এরপরে একএক করে রাজ্যের ক্ষমতা হাতে নিতে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংঘাত আর ষড়যন্ত্র চলে আসছে। দিল্লির শাসন ক্ষমতায় আসীন সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুঘলক কোনো কূলকিনারা করতে পারছেন না। কে যে বন্ধু, আর কে দুশমন সেটাই তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র এতটাই জটিল আকার ধারণ করেছে!

প্রায় দশটা বৎসর কোনো শক্তিশালী সরকার দিল্লির ক্ষমতায় নেই। উজির-নাজির, সভাসদরা নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত। দেশ ও সমাজের উন্নতি বা নিরাপত্তার চিন্তা কারও মাথায় নেই। এমনতর খবর বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়েছে কান্দাহার, ইস্পাহান, সমরখন্দ আর মধ্য এশিয়ায়। মোঙ্গলরাও জানলো, শুনলো, প্রলুব্ধ হলো ভারত আক্রমণে ।

এর আগে তাদেরই পূর্বপুরুষ চেঙ্গিস খান ১২২১ খ্রিষ্টাব্দে এই সিন্ধুর তীর থেকেই ফেরত গেছে। সিন্ধুর পুব পাড়ে আর এগোয়নি। কিন্তু তারই বংশধর ন্যাংড়া লোকটা; তৈমুর লং এবারে তার দলবল নিয়ে নদী কেবল পারই হলো না, বরং সে ঝড়ের বেগে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বদিকে ছুটে চললো।

চলার পথে যে জনপদই তার সামনে পড়লো সে জনপদকেই সে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে রক্তের বন্যা বইয়ে দিতে থাকলো। হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ আর লুটতরাজ ছিল যথেচ্ছা! কেবলমাত্র সুস্থ ও সবল জোয়ান পুরুষ, যাদের দাস হিসেবে বিক্রি করা যাবে, শেকলে বেঁধে নিয়ে চললো।

এর বাইরে যারাই তার সামনে পড়লো নারী বৃদ্ধ শিশু, সবাইকেই তার তরবারির নিচে প্রাণ দিতে হলো।

বলা হয়ে থাকে, লাশের পচা গন্ধ থেকে বাঁচতেই তৈমুরের সৈন্যরা দ্রুতবেগে এগিয়েছে! আর এ ভাবেই তারা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের দিকে দিল্লির দোরগোড়ায় হাজির!

দিল্লির মসনদ নিয়ে তখনও অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ সংঘাত চলছে বিভিন্ন দল আর উপদলে। এরকমই একটা উপদলের নেতা, স্বঘোষিত সুলতান মাহমুদ শাহ বাছ-বিচার না করেই তৈমুর লং এর সৈন্যবাহিনীর উপরে আক্রমণ করে বসে। ১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর, বুধবার। মাত্র কয়েক ঘন্টায় সে আক্রমণ ঠেকিয়ে দেয় তৈমুরের সেনাদল।

তবে তৈমুর কেবল তাতেই সন্তুষ্ট থাকেনি। তার সৈন্যদের আক্রমণ করা হয়েছে, এটা জানার পরে সে এতটাই ক্রোধান্বিত হয় যে, তৎক্ষণাৎ সে দিল্লিবাসীর উপরে এর প্রতিশোধ নেয়ার নির্দেশ দেয়।

আহা কি করুণ দিন-ই না ছিল সে বুধবারটা! দিল্লিবাসীর উপরে নরক নেমে এসেছিল যেন। মাত্র একটা ঘন্টার মধ্যে দিল্লিতে পঞ্চাশ হাজার লোককে হত্যা করে তারা। এমনকি, তৈমুরের দলে অশীতিপর বৃদ্ধ ইমাম, যে নিজের হাতে ভারি তরবারিটাও ধরতে অক্ষম, সেই তাকেও বাধ্য করা হয়েছে বন্দী ভারতীয়র মাথা কাটতে!

মাহমুদ শাহ পালিয়ে গেলেও অচিরেই তার প্রধানমন্ত্রী মালু খানের নেতৃত্বে দশ হাজার অশ্বারোহী, চল্লিশ হাজার পদাতিক এবং বিরাট এক হস্তিবাহিনী নিয়ে আবারও মাঠে আসলেন, কিন্তু এবারেও তারা সফল হলো না। কারণ, ঐ যে, নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, দ্বন্দ্ব আর বিদ্বেষ!

ফলাফল কি হলো? তৈমুর লং এর এক একজন সৈন্য গড়ে প্রায় কুড়িজন ভারতীয়কে শেঁকলে বেঁধে বন্দী হিসেবে ক্যাম্পে আনলো। সারা রাত ধরে দিল্লির প্রতিটি অলিতে গলিতে, প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে চললো লুট-তরাজ আর ধর্ষণ! লাশের পর লাশ দিল্লির পথে ঘাটে, যেখানে সেখানে পড়ে থাকলো! প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও সেই সব লাশে পচন ধরতে শুরু করলে পচা লাশের গন্ধে টেকা দায় হয়ে উঠলো! শেষ পর্যন্ত আর টিকতে না পেরে প্রায় নয় দিন থাকার পরে দশম দিনে তৈমুর তল্পিতল্পা গুটাতে শুরু করলো। আসার সময় তারা ঝড়ের বেগে এসেছিল পেছনে পচা লাশের গন্ধের হাত থেকে বাঁচার জন্য। এবার যাবার সময়ও ঠিক সেই একই অবস্থা, বাতাসে লাশের পঁচা গন্ধ! কিন্তু তৈমুরের সেনাবাহিনী দিনে চার মাইলের বেশি এগোতে পারেনি!

কারণ, তারা দিল্লি থেকে এত সম্পদ লুট করেছে যে, তাদের ঘোড়াগুলোও সে সম্পদ টেনে নিতে হিমশিম খেয়েছে! বলা হয়ে থাকে; দিল্লি ও তার আশপাশে এতটাই দুর্গন্ধ ছড়িয়েছিল যে, ঐ দুই মাসে দিল্লির আকাশে একটা পাখিও ওড়েনি! এ সবই এক দুঃসহ স্মৃতি।

আরও একটা স্মৃতি আছে বটে! তৈমুর লং এর সেই বৃদ্ধ ইমাম, যে মানুষ হত্যা করতে না চাইলেও তাকে দিয়ে জোর করে ভারতীয় বন্দীর মাথা কাটানো হয়েছে, সেই বৃদ্ধ ইমাম ১৪ ডিসেম্বর শুক্রবার দিল্লির মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়ান। সেখানে তিনি দিল্লিজয়ী তৈমুর লং এর নামে খুতবাও দেন। সেই খুতবায় তার মহান মনিব তৈমুর লং এর প্রশংসা করে খুতবায় যা বলেছিলেন, তা স্মৃতি নয়।

স্মৃতি হলো, তিনি তার সেই খুতবায় অশ্রুসিক্ত নয়নে কম্পিত কণ্ঠে বলেছিলেন; যে জাতি আল্লাহর অবাধ্য হয়, যে জাতি আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে আঁকড়ে ধরে না, তার পাবন্দি করে না, সেই জাতির উপরে আল্লাহ আজাব নাজিল করেন। আর আল্লাহর আজাব যখন আসে, তখন তা হতে পালিয়ে বাঁচার কোনো পথ থাকে না। আল্লাহর পাকড়াও হতে কেউ বাঁচতে পারে না।

এরপরে ইতিহাস সাক্ষী। সাক্ষী এই জনপদ, এমনকি, পুরো ভারতবাসী সকলেই, দিল্লিবাসী সেদিন সেই খুতবা থেকে শিক্ষা নেয়নি। শিক্ষা যে নেয়নি, তার প্রমাণ পরবর্তী সমাজচিত্রই আমাদের বলে দেয়।

তৈমুর যুদ্ধোন্মোদনা এবং রাজ্য ও সম্পদের লোভে এর পরে পশ্চিমের দিকে তেড়ে গেছেন, এক এক করে তার সেনাবহিনী নিয়ে সেই দামেশ্‌ক পর্যন্ত। সেখানে তার সাথে দেখা ও আলোচনা করেছিলেন প্রখ্যাত মুসলিম পরিব্রাজক ইবনে বতুতা। ইবনে বতুতা তার আত্মজীবনীতে তৈমুরকে একজন মহাশক্তিধর সম্রাট হিসেবে অভিহিত করেছেন, বলেছেন; জ্ঞান আহরণ ও যুক্তি পাল্টাযুক্তি দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায় তিনি খুবই উৎসাহী'।[৭৩]

তৈমুর ছিলেন প্রচণ্ড সাহসী, সামরিক দিক বিচারে অত্যন্ত দক্ষ যোদ্ধা জেদি এবং একরোখা মানুষ, সে প্রমাণ তার প্রতিটি যুদ্ধ ও সামরিক আগ্রাসনের ইতিহাসের সাথে সাথে জড়িয়ে আছে। বিশ্বের কোন ঐতিহাসিকই সে বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেননি। সেটা আমাদের, তথা ভারতবাসীরও জানা। আমরা তৈমুরের চরিত্রের উপরোক্ত দিক, যা ইবনে বতুতা তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন সেটার ব্যাপারে আগ্রহী সম্রাট আকবর ও তার চরিত্রকে বোঝা ও উপলব্ধির জন্য। কারণ, ঠিক এই গুণটির উপস্থিতি

আমরা দেখতে পাই মোগল সম্রাট আকবরের চরিত্রে। তিনিও তার রাজদরবারে জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিতদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা, যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি উপস্থাপন ও তাদের মধ্যে বিতর্ক উপভোগ করতেন। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সম্রাট নিজেও বড় আগ্রহভরে তাতে অংশও নিতেন। আকবরও ছিলেন তৈমুরেরই বংশধর। আকবরের দাদা; বাবরের বাবা উমর শেখ ছিলেন তৈমুরের বংশধর, আর তার মা ছিলেন চেঙ্গিজ খানের বংশধর। এই দুই বংশধারার রক্ত মিশেছে বাবর হয়ে আকবর তথা পুরো মোগল সম্রাটদের রক্তধারায়।[৭৪]

বলা বাহুল্য মধ্য এশিয়ার মরুচারী এই গোষ্ঠীর চরিত্রে সাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা, একইসাথে কঠোরতা ও কোমলতার সংমিশ্রণ। তারা বংশগতভাবেই প্রচণ্ড জেদি। মধ্য এশিয়ার তুর্কি বংশোদ্ভূত এই জনগোষ্ঠী প্রচণ্ড রসিক, আড্ডাবাজ, সঙ্গীতপ্রিয় ও বিলাসী ধরনের হয়ে থাকে। আজও যারা তুর্কিদের চেনেন কাছে থেকে, দেখেছেন বা জেনেছেন, তারা আমার এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে জানেন।

তৈমুরের চমকপ্রদ সাফল্যকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত Lord Kinross বড় চমৎকারভাবে কিন্তু অতি সংক্ষেপে বিষয়টা চিত্রিত করেছেন এভাবে;...He was endowed with high courage, fierce energy, a unique gift of leadership, and supreme military genius. Building up a military army, he rode at the head of it in a career of spectacular conquest, to become sovereign three empires-Persia, Tartary (Turkistan), and India. Within a generation Timur had extinguished nine dynasties to reign from Samarkand as lord, in the name of Islam, of a great part of Asia.

ভাবানুবাদঃ তিনি প্রকৃতিগতভাবেই প্রচণ্ড সাহস, সীমাহীন প্রাণশক্তি, নেতৃত্বের ব্যতিক্রমধর্মী গুণ পেয়েছিলেন। একটা দক্ষ সেনাদল গঠন করে তিনি নিজে নেতৃত্ব দিয়ে পারস্য, তুর্কিস্থান ও ভারত; তিনটি সাম্রাজ্যের অধিপতি হতে এক চমৎকার বিজয়াভিযানে বের হন। সমরখন্দে বসেই তৈমুর তার এক জনমেই নয়টি সাম্রাজ্যকে বিলীন করে দিয়ে এশিয়ার এক বিরাট অংশের উপরে ইসলামের নামে রাজত্ব করেছেন! [৭৫]

তৈমুর শারীরিকভাবে কিছুটা বিকলাঙ্গ ছিলেন। তিনি খোঁড়া ছিলেন। কখনও কখনও এটা তার স্বাভাবিক চলা ফেরাকেও ব্যাহত করতো। এরকমটাই ঘটেছিল বাগদাদ অভিযানের সময়, এক ঐতিহাসিকের মন্তব্যে সেটা ফুটে উঠেছে এভাবে;

... And indeed at times his infirmity was such that, as in the advance of his army on Baghdad, he was unable to sit on a horse and was carried by his men in a litter.

ভাবানুবাদ: কোন কোন সময় তার বিকলাঙ্গতা এতটাই প্রকট হতো যে, বাগদাদ আক্রমণের সময় তো তিনি ঘোড়ার পিঠে ঠিক মত বসতেই পারেননি, ফলে তার লোকজন তাকে কাঁধে (মাচায়) করে টেনে নিয়ে গেছে।[৭৬]

এটা তার জন্মগত না কোন সামরিক অভিযানে আহত হওয়ার মাধ্যমে ঘটেছে সে ব্যাপারে বিতর্ক রয়েছে। তবে যে বিষয়টা নিয়ে বিতর্ক নেই তা হলো, তার এই শারীরিক দুর্বলতা তাকে যুদ্ধের ময়দানে কিংবা রাজনীতি বা কূটনীতির ক্ষেত্রে তাকে দুর্বল করতে পারেনি।

মোগল বংশধারায় তাদের মনস্তত্ব, বংশীয় ঐতিহ্যধারা, তাদের পারিবারিক ও বংশীয় কৃষ্টি কালচার, এগুলো বুঝতে হলে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে আরও একটু পেছনে। সেটা হলো তৈমুর যে সময়টায় ভারতে আসছেন এবং দিল্লির সালতানাত তছনছ করছেন, তারও ঠিক একশত চল্লিশ বৎসর আগে।

সতের

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে; ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে আকবরের পূর্বপুরুষ চেঙ্গিজ খানের নাতি হালাকু খানের আক্রমণ ও সে আক্রমণের সূত্র ধরে বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রতাপশালী, ধনাঢ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও কৃষ্টিকালচারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক আব্বাসীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস করা হলে তার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব মুসলিম বিশ্বসহ পুরো বিশ্বজুড়েই পড়ে। এ প্রভাবের অন্যতম ও তাৎক্ষণিক শিকার হলো মধ্যপ্রাচ্য, পারস্য, মধ্যএশিয়া এবং ভারত।

আমরা আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র সীমিত রাখতে কেবলমাত্র ভারতীয় সমাজ কিভাবে প্রভাবিত হয়েছে, সে বিষয়টার দিকেই অতি সংক্ষেপে নজর দেবো। কারণ, সেই প্রভাবের ফলেই সম্রাট বাবরের প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্য এবং ভারতবর্ষে ইসলামি শাসনব্যবস্থা পথভ্রষ্ট হবে তারই নাতি; আর এক মোগল সম্রাট, আকবরের হাত ধরে।

এই পথভ্রষ্টতার জন্য আকবরকে দোষারোপের আগে যে পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটে এই বিপর্যয় বা পথভ্রষ্টতার জন্ম ও সূচনা হয়েছে বা হতে পেরেছে, সেই পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটকে জানতে হবে। সেটা না জেনে বা সেই পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটকে না বুঝেই আকবরের উপরে দোষ চাপানোটা আর যাই হোক না কেন, ইনসাফ নয়।

এখানে প্রসঙ্গত একটা কথা বলে রাখা দরকার। আকবর যে সময়কালে ভারতের সিংহাসনে বসেছেন, তার মাত্র একটি শতাব্দী আগে আন্দালুসের পতন ঘটেছে স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ খ্রিষ্টানদের হাতে। সেখানে মুসলমানদের কি পরণিতি হয়েছে বা মুসলমানদের সাথে কি আচরণ করা হয়েছে? সে ইতিহাস, কিংবা 'স্প্যানিশ রিকংকাস্টা'র পেছনে খ্রিষ্টানদের মনস্তাত্বিক ও আদর্শিক যে উন্মাদনা ছিল, সেটা যদি তিনি জানতেন, যদি জানতেন সেই একই উন্মদনায় উজ্জীবিত স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ খ্রিষ্টানরা আটলান্টিকের ওপাড়েও খ্রিষ্টের বাণী ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে জাহাজ ভাসিয়েছে কতটা ব্যগ্রতার সাথে, তবে তিনি ঠিকই বুঝতেন, কেন সেই পর্তুগিজরাই ঐ একই সময়কালে হাজার হাজার মাইল পথ পেরিয়ে মাদ্রাজ উপকূলে ভিড়েছে?

আরও বুঝতেন, তিন তিনজন পর্তুগিজ পাদ্রিই বা কেন তার রাজদরবারে বাইবেল হাতে এসে হাজির হয়েছেন? আর তা বুঝলেই তিনি সাবধান হতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আকবরের, সেই সাথে ভারতবাসীরও, ইতিহাসের এই পাঠ এবং উপলব্ধি অশিক্ষিত আকবরের জানা ছিল না। থাকলে তিনি সাবধান হতেন।

যা হোক, সম্রাট আকবরের উপরে আরোপিত অপবাদ ও অভিযোগগুলোর মধ্যে অন্যতম একটা হলো; তিনি নিজে যেমন হিন্দুত্ববাদী দর্শনের অনুবর্তী হয়েছেন, তেমনি মুসলিম সমাজে হিন্দুত্ববাদী দর্শন ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়া বা ইসলামি দর্শন ও সংস্কৃতির সাথে হিন্দু দর্শন ও সংস্কৃতির একটা গোঁজামিল সংমিশ্রণ ঘটিয়ে পুরো ভারতবাসীর আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে চিরদিনের জন্য কলুষিত করেছেন।

এভাবে তিনি একইসাথে হিন্দু ও ইসলাম, উভয় ধর্মাবলম্বীদেরই ক্ষতি করেছেন। কেবল তাই নয়, এর মাধ্যমে তিনি এই উভয় সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হয়েছেন।

আকবরের প্রতি আরোপিত এই অভিযোগ অমূলক বা অতিরঞ্জিত নয়। বরং বাস্তব সত্য। তবে তার পাশাপাশি এটাও সত্য যে, এ দোষে একমাত্র আকবরই দোষী নন। তিনি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য অংশ, বলা চলে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ। আর তার চেয়েও বড় সত্য যেটা, সেটা হলো, এ প্রক্রিয়ার সূচনা সম্রাট আকবর করেননি। অন্তত তিনি সূচনাকারী নন।

আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, সময়কালের নিরিখে মোগল সাম্রাজ্যের পরিধি, তার সম্পদ ও সম্ভাবনা, আকবরের দীর্ঘ রাজত্বকাল (এক নাগাড়ে আটচল্লিশ বৎসর), আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ভূরাজনৈতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে বিচার করে দেখলে ভারতের সামনে একটা অপার সম্ভাবনা ছিল যে, সে পূর্ব এশিয়ার এই বিরাট ভূ-খণ্ডটি নিয়ে বিশ্বে আর একটি 'আন্দালুস' তথা স্পেন হয়ে উঠবে। বিশ্বে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুপার পাওয়ার হয়ে উঠবে। সেই অপার সম্ভাবনা আকবর নিজের হাতে ধ্বংস করেছেন। তার পুরো কর্মকাণ্ড বিবেচনা করলে সে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যা হোক, আমরা বলছিলাম, আকবরের উপরে আরোপিত অভিযোগের কথা। উপরে উল্লিখিত অভিযোগে অভিযুক্ত হবার মত আরও মুসলিম শাসক বা সুলতান ভারতের মাটিতে রয়েছেন আকবরের পূর্বসূরি হয়ে।

আকবরের আগে এই উপমহাদেশে কোন কোন মুসলিম শাসক, রাজা বাদশাহ ও সুলতান কর্তৃক হিন্দু পৌত্তলিক সংস্কৃতির নিষ্ঠাবান অনুবর্তী হওয়ার ঘটনা রয়েছে। তারা ভারতের মাটিতে ইসলাম ও হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতির সংমিশ্রণে এমন এক মিশ্র সংস্কৃতির সূচনা করেছিলেন, যা সময়ের পরিক্রমায় শিরকযুক্ত নানান রসম রেওয়াজের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে ইসলামি জনজীবনে, এমনকি ইসলামি আক্বিদার গভীরে।

আর এরই সংক্রমণে কলুষিত হয়েছে মুসলিম মানস। আকবর প্রথমত হলেন সেই সংক্রমণের শিকার, তারপরে তিনি নিজেই এ রোগটাকে ছড়িয়েছেন মহামারীরূপে। আর অপসংস্কৃতির এই মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মুসলিম সমাজের চিন্তা-চেতনা গেছে, গেছে তাদের ধ্যান-ধারণা, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি।

মুসলমানরা যে একটা বৃহৎ ও উন্নত মহৎ দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে তা তিরোহিত হওয়ার পরে তার রেশ ধরে অনিবার্যভাবে তাদের জীবনধারা পাল্টে গেছে, অন্তত ভারতের মাটিতে।

আর সেই পরিবর্তিত জীবন ধারাতেই এসেছে পতন! এই আমরা, ভারতীয় উপমহাদেশীয় মুসলমানরা আজও তারই রেশ বয়ে চলেছি আমাদের আর্থসামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে কাজেই পুরো বিষয়টিকে যথাযথভাবে বুঝতে হলে আমাদের এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ার গভীরে যেতেই হবে। এ ছাড়া সহজ কোন রাস্তা নেই।

আকবর ভারতীয় উপমহাদেশীয় যে পরিবেশ ও কাল-এ নিজেকে পেয়েছেন সেই কাল ও সেই পরিবেশে এতদ্বঞ্চলে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক বলয়ের প্রভাবকে কিভাবে এড়াবেন?

ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর থেকে এদেশে (তারও আগে অবশ্য কেউ কেউ এসেছেন) আফগানরা নিজেদের ভাগ্য সন্ধানে আসা শুরু করে। তারা কেউবা আসে দাস হিসেবে, কেউবা শ্রমিক বা ব্যবসায়ী হিসেবে। আবার কেউ কেউ স্থানীয় রাজা বাদশাহদের সৈন্যবাহিনীতে চাকরিও নেন।

এভাবেই কালক্রমে তারা প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের হাত ধরে, আবার কখনও কখনও নিজেদের যোগ্যতা ও শক্তির জোরে সুলতান হিসেবে আবির্ভূত হন। তারা ছিলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। অনেক দূর থেকে এসেছেন এ দেশে। সংখ্যাগুরুর উপরে নিজেদের শাসন ও কর্তৃত্বকে বজায় রাখতে তারা অনেক রকম কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন।

বহিরাগত হিসেবে সংখাগরিষ্ঠ হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভারতবাসীর মনোজগতে নিজের বা নিজেদের অবস্থানকে সংহত করে তুলতে তারা নিজেদেরকে সংখ্যাগুরু লোকজনের কাছে আপন করে তুলতে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়েছেন, কখনও বা ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়েছেন।

ক্ষমতায় থাকাবস্থায় স্থানীয় কোন কোন গোষ্ঠীকে অতিমাত্রায় সুযোগ সুবিধা প্রদানের বিনিময়ে তাদের দিয়েই অপরাপর স্থানীয় গোষ্ঠীর উপরে নিজেদের শাসনব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছেন, তাদের নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

এ ছাড়াও তারা স্থানীয়দের মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করেছেন তাদের সংস্কৃতি

ও জীবনাচারকে নিজেদের জীবনে মেনে চলার মাধ্যমে। এরকম ঘটনা আমরা দেখতে পাই বিজাপুরের আফগান মুসলিম সুলতান ইব্রাহিম আদিল শাহ্-এর জীবনে।

তিনি একজন মুসলমান হয়েও কেবলমাত্র তার হিন্দু প্রজাদের খুশি করার জন্যই হিন্দু সাধুদের ন্যায় রুদ্রাক্ষের মালা গলায় চড়িয়েছিলেন। সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন এবং এই ভাষাতেই হিন্দু দেবী সরস্বতী ও মুসলমানদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা:) কে নিয়ে প্রায় একই ভাষায়, একই মাপে স্তুতি বর্ণনা করেন।

তিনি 'জগৎগুরু' নাম ধারণ করে গেরুয়া রং এর কাপড় পরিধান করতেন এবং একজন হিন্দু সাধুর ন্যায় জীবন যাপন করতেন। তার দৈনন্দিন জীবনাচার এমনই ছিল যে, রাজ্যের হিন্দু প্রজারা তাকে প্রকৃতপক্ষেই একজন হিন্দু মনে করতো।[৭৭]

এটা একটা মাত্র ঘটনা। কিন্তু সমকালীন ইতিহাসের পাতায় খুঁজলে এমন অনেক ঘটনাই পাওয়া যাবে মুসলিম শাসক ও তাদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কিংবা সামাজিক জীবনে।

আফগান বা মধ্য এশিয়ান তুর্কি মোগলরা কেন এবং কখন ভারতের মাটিতে ভাগ্যের সন্ধানে আসা শুরু করলো বা করতে বাধ্য হলো? সে বিষয়টা খুঁজে দেখতে গেলে আমাদের নজরে পড়ে পারস্য, মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ায় মুসলমানদের ভাগবিড়ম্বনার বিষয়টা।

ভাগ্যবিপর্যয় ঘটেছিল বলেই তারা ভাগ্যের সন্ধানে আশপাশে ছুটে এসেছে। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করেছে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়ধারায়। অতএব, আসুন আকবরের আলোচনা ছেড়ে আপাতত কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমরা আকবরের পুর্বপুরুষদের আলোচনায় ফিরে যাই।

নবম শতাব্দী থেকেই তুর্কিরা ইসলাম গ্রহণ শুরু করে। তুর্কিদের সামরিক দক্ষতা, সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতা দেখে আব্বাসীয় সুলতানরা তাদেরকে সামরিক কাজে ব্যবহার শুরু করে। মুসলিম সেনাবাহিনীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তুর্কি সৈনিকদের দ্বারা পূরণ হতে শুরু করে। এ ছাড়া দাস হিসেবেও অনেক তুর্কি আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে।

নবম শতাব্দী শেষ হতে না হতেই পুরো আব্বাসীয় ও আরব সাম্রাজ্যের বেশিরভাগ সেনাপতি, জেনারেল, মন্ত্রী, উজির'সহ বড়বড় পদে তুর্কি নওমুসলিমরা জায়গা করে নেয়।

একাদশ শতাব্দী নাগাদ এসে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য অভ্যন্তরীণ কলহ বিবাদ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ক্রমশই দুর্বল হতে শুরু করে। আর এই দুর্বলতার কারণে প্রশাসনে সৃষ্ট অযোগ্যতাজনিত শূন্যতা পুরণ করে তুর্কিরা।

সৃষ্টির শুরু থেকে হাজার হাজার বৎসর মধ্য এশিয়ার মরু অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এইসব মরুচারীরা ইসলামের সান্নিধ্যে এসে মাত্র কয়েকটি দশকের মধ্যেই হয়ে উঠলো বিশ্বসেরা স্টেটস্টম্যান! প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও গবেষক প্যাট্রিক কিনরস (Patrcik Kinross) অনেকটা বিস্ময়ের সাথেই সে কথা বলেছেন;...Seljuk Turk rose, in a durable and productive sense, to the challenges of sedentary life. Adapting their own traditions and institutions to the ends of a settled civilisation, they emerged as empire-builders with with a constructive sense of statecraft, making a positive contribution to history as the old Muslim world evolved into a new phase of social and economic, religious and intellectual advancement. These shepherds and warrioirs of the stepp became town-dwellers-administrators, merchants, manufatureres, artisans, holders and tillers of land, builders of roads, caravanceries, mosque, schools and hospitals. They came to cultivate and scholarships- the philosophy and sciences, the literature and arts in which the Persians and Arabs befor them had set an example.

ভাবানুবাদঃ মরুচারী যাযাবর জীবনের প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা করে সেলজুক তুর্কিরা টেকসই এবং উৎপাদনোক্ষম জীবনের দিকে ফিরে আসে। পুরনো মুসলিম সাম্রাজ্য যখন একটি নতুন আর্থসামাজিক, আদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরে পদার্পণ করছে, ঠিক তখন এরা (সেলজুক তুর্কি) নিজেদের ঐতিহ্য ও সামাজিক অবকাঠামোকে ঠিক রেখেই শহুরে জীবনে এসে সুনিপুণ প্রশাসনিক দক্ষতায় রাজ্যগঠনকারী হিসেবে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে আসে।

পাহাড়ি মালভূমির এইসব পশু পালনকারীগণ শহরের অধিবাসী হয়ে প্রশাসক, শিল্পী, ব্যবসায়ী, জমির মালিক, শ্রমিক রাস্তা-ঘাট, মসজিদ, স্কুল, হাসপাতাল, সরাইখানা নির্মাণকারী হয়ে উঠলো। আরব ও পারসিকরা শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের যে ধারা সৃষ্টি করেছে, এরা সেসবেরও পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠলো। [৭৮]

আঠার

ভারতবর্ষ ও পারস্যের মধ্যে (এবং এই পথে আরব ভূমির সাথেও) বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল প্রাচীনকাল থেকেই। এমনকি, সেই ব্যাবিলনীয় যুগেও বর্তমান ওমান এবং বাহরাইন (প্রাচীন নাম 'দিলমুন') এবং শাতিল আরব উপকূলের সকল ছোট বড় বন্দরই ভারতের সাথে বাণিজ্যিক কারণে সংযুক্ত ছিল। ভারত থেকে তুলা, সিল্ক বা রেশম, সুগন্ধী, চন্দন কাঠ, মূল্যবান পাথর ও রত্ন, আদা, গুড়, মধু, ময়ূর, কাপড়ে দেবার রং, মরিচ ও সেগুন কাঠ ইত্যাদি রপ্তানি হতো। খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) এর আমলে এই ভারতবর্ষ থেকেই সেগুন কাঠ গেছে মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ কাজের জন্য।[৭৯] এমনকি, গ্রিক ঐতিহাসিক স্ট্রাবো (Strabo, মৃত্যু ২১ খ্রিষ্টাব্দ) স্বয়ং তার লেখায় ব্যবসায়িক এই সংযোগের এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।[৮০]

এই বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক ছিল পুরোপুরি আরব, তথা মুসলিম বণিকদের নিয়ন্ত্রণে। তারাই ছিল এর মূল চালিকাশক্তি। ওমান, হরমুজ, বাহরাইন, এডেন, জেদ্দা এ পাঁচটা প্রাচীন বাণিজ্যিক নৌবন্দর ছিল আরব বা পারসিক মুসলমানদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে।[৮১]

আর এসব বন্দরের সাথে প্রধান বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল চীনের ক্যান্টন, দক্ষিণ ভারতের গুজরাট, মাদ্রাজ, সিংহল (বর্তমান শ্রীলংকা) এবং ইন্দোনেশিয়ার আর্চিপেলাগো (Archipelago) বন্দরগুলো সারা বৎসরই ব্যবসায়িক সম্পর্কের কারণে সংযুক্ত থাকতো। এসব বন্দরগুলোর প্রতিটিতেই আরব বণিকদের ইসলামপূর্ব যুগ থেকেই ব্যবসা ও উপস্থিতি ছিল।

যুগ প্রাচীন এই বাণিজ্যিক ঐতিহ্য ও নৌ বাণিজ্যপথে কর্তৃত্ব মুসলমানদের একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে দেয়ার পাশাপাশি পুরো ইসলামি সাম্রাজ্যের পুরো এলাকাজুড়ে স্থায়ী অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এনে দেয়।

সমৃদ্ধ এই জনপদকে ঘিরেই গড়ে উঠে মুসলিম সাম্রাজ্য, আব্বাসীয় সাম্রাজ্য তার সূচনালগ্নে আরব প্রভাবিত থাকলে পরবর্তিতে সময়ের সাথে সাথে তা পারসিক, তুর্কি ও মোঙ্গল বা মধ্য এশিয়া হতে উদ্গত তুর্কিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে।

মধ্য এশিয়ার এই তুর্কি গোষ্ঠীর লোকজনকে বীরত্ব, সাহস, অশ্বারোহণে দক্ষতার জন্য আব্বাসীয় খলিফারা নিজেদের দেহরক্ষী ও প্রাসাদের রক্ষী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া শুরু করেন। ক্রমেই তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে রাজদরবারে, সেনাবাহিনীতে এবং ১০৪০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ দলে দলে সেলজুক

তুর্কি গোষ্ঠী ইসলাম গ্রহণ শুরু করে এবং তারাও খেলাফতের বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন পেশায় আসন করে নেয়।
সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে ক্রমেই তারা প্রভাবশালী হয়ে উঠতে থাকে এবং একটা সময় আসে যখন তারা অপ্রতিরোধ্যভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠে। তাদের শক্তি ও প্রভাবের কাছে আব্বাসীয় খলিফারাই এক সময় নিষ্প্রভ হয়ে তাদের হাতের পুতুলে পরিণত এবং এই তুর্কি সেলজুকরাই এক সময় খেলাফতের কেন্দ্রে নিয়ামক ভূমিকায় উঠে আসে।
এটা একটা সময়কাল, যখন সফল রাজা রাজড়াদের ব্যাপারে জনসাধারণের ধারণাটাই এমন যে, কে কতটা বীরত্ব প্রদর্শন করতে পারলো, কে কতটা রাজ্য বিস্তার করতে পারলো তার উপরে ভিত্তি করেই একজন রাজা বাদশাহর জীবনের সফলতা নিরূপিত হতো। এক্ষেত্রে তার রাজ্যের প্রজাদের জীবনমান উন্নয়নের বিষয়টা মুখ্য নয়, বরং গৌণ। এ নিরিখে এতদঞ্চলে, বিশেষ করে মধ্য এশিয়া, পারস্য, ভারতবর্ষ, চীন, এমনকি, ইউরোপেও রাজা-রাজড়াদের সফলতা ব্যর্থতাকে বিচার করা হতো।
এটা ছিল নিছক একটা আগ্রাসী ও সম্প্রসারণবাদী রাজ্যনীতি। জোর যার মুল্লুক তার ধরনের। দুঃখের বিষয় হলো, মুসলিম সাম্রাজ্য ও সালতানাতগুলোর বেশির ভাগই ততদিনে এমন বিকৃত ধারণাকে নিজেদের বিশ্বাস ও কর্মনীতি বানিয়ে নিয়েছে!
আব্বাসীয় বা উমাইয়া, ফাতেমি বা মামলুক, সেলজুক বা সাফাভি সকলের ক্ষেত্রেই এরকম পরিস্থিতি ছিল একটা নিরেট বাস্তবতা। ব্যক্তিগতভাবে হয়তো কোন কোন সুলতান বা আমির বা খলিফা এ নীতিকে পরিহার করার চেষ্টা করেছেন, তবে অধিকাংশদের ক্ষেত্রে সেটা ঘটেনি।
আর যারা এরকম আগ্রাসী নীতি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছেন, তারাও সেটা পুরোপুরি করতে পারেননি, কারণ, তারা আক্রান্ত হয়েছেন বা প্রলুব্ধ বা প্ররোচিত হয়েছেন, চাইলেও এড়িয়ে যেতে পারেননি।
এ সময়কালটায় একটি রাজ্যের আর্থিক বুনিয়াদ চারটি বিষয়ের উপরে নির্ভরশীল ছিল। এগুলো হলো; এক-অভ্যন্তরীণ উৎপাদন তথা কৃষি ও শিল্প, প্রধানত কুঠির শিল্প, কারণ, তখনও শিল্প বিপ্লব হয়নি। দুই-বৈদেশিক বাণিজ্য, তিন-কর বা রাজস্বব্যবস্থা এবং চার-সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমে পরাজিত জনপদ থেকে প্রাপ্ত লুণ্ঠিত সম্পদ বা করদ রাজ্য থেকে প্রাপ্ত বাৎসরিক কর।
যে রাজার রাজ্য যত বড় হবে, সেই রাজার সম্পদও তত বেশি হবে। যে রাজা যত বেশি যুদ্ধ জয় করতে পারবেন, সেই রাজা তত বেশি সম্পদ লুট

করে নেয়ার সুযোগ পাবেন বা বার্ষিক কর আদায় করতে পারবেন বিজিত রাজ্য থেকে। আকবরও তার দীর্ঘ চার যুগের শাসনামলে ঠিক এই নীতিই মেনে চলবেন। আগ্রাসী ও সম্প্রসারণবাদী সামরিক নীতি পালনের ক্ষেত্রে সম্ভবত আর কোন মোগল সম্রাটই তার সমকক্ষ হবেন না।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ তৈমুরের রাজত্ব ছড়িয়ে পড়েছে পুবের দিকে চীনের প্রাচীর থেকে শুরু করে পশ্চিমের পারস্য, আর্মেনিয়া, ইউফ্রেতিসের তীর হয়ে এশিয়া মাইনর, অর্থাৎ ওসমানিয় সাম্রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত। উত্তরে রাশিয়ার সীমান্ত থেকে শুরু করে দক্ষিণে পারস্য সাম্রাজ্য ও ভারতবর্ষের গঙ্গার তীর পর্যন্ত।

এটা এমন একটা সময়, অটোম্যান সুলতান মুরাদ ও তারপরে তারই পুত্র সুলতান বায়েজিদ যখন পর পর শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন এদের ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলেছেন; 'তৈমুর তার সমকক্ষ একজন যোদ্ধা পেতে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষারত ছিলেন, অপরদিকে, তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ (যোদ্ধা বা সেনাপতি) যে কেউ আছেন, সে বিষয়ে সুলতান বায়েজিদ ছিলেন একেবারেই অজ্ঞ!'। [৮২]

এখানে এসে আমরা তৈমুর কর্তৃক অটোমান সাম্রাজ্য; বাগদাদ, আলেপ্পো ও দামেশকসহ আশপাশের অঞ্চল আক্রমণ ও ইতিহাসের বর্বরতম ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনার বিষয়টির নিয়ে সামান্য আলোচনা করবো। এটা করবো এ বিষয়টা দেখানোর জন্য যে, রাজা-রাজড়াদের আত্মসম্মানবোধ, অহংবোধের কারণে তুচ্ছ ঘটনাও কতটা ভয়াবহ ও বিপর্যয়কর হয়ে উঠতে পারে! পারসিক ঐতিহাসিক শরফুদ্দিনের বরাত দিয়ে প্রখ্যাত গবেষক ও ঐতিহাসিক লর্ড কিনরস এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন তার এক গবেষণায়।[৮৩]

সুলতান বায়েজিদ তখন আনাতোলিয়ায় ওসমানীয় সামরিক অভিযান পরিচালনায় ব্যস্ত। তিনি আনাতোলিয়ার বেশ কিছু অংশ ইতোমধ্যেই দখলও করেছেন, আনাতোলিয়ার পরাজিত রাজার কয়েকজন সন্তান তৈমুরের কাছে আশ্রয় নিয়েছে প্রাণ বাঁচাতে। তুরস্কের 'সিভাস' দখল করে নিলে বায়েজিদের অটোমান সাম্রাজ্য তৈমুরের প্রতিবেশী হয়ে পড়ে।

এখানে ইউফ্রেতিস নদীর পূর্ব-দক্ষিণ পাড়েই ছিল তৈমুরের ছোট্ট একটা করদরাজ্য; তৈমুরের পক্ষ থেকে ক্বারা ইউসুফ নামে এক তুর্কি শাসক এ এলাকার শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। সুলতান বায়েজিদ 'সিভাস' শহর থেকে এখানে সামরিক অভিযান পরিচালনা করলেন এবং ঐ এলাকার শাসক ক্বারা ইউসুফকে বন্দী করলেন, এটি ছিল ১৩৯৯ সালের ঘটনা।

নিজ রাজ্যের সীমান্তে ওসমানীয় সুলতান বায়েজিদের এ ধরনের উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড দেখে তৈমুর বড় বিরক্ত বোধ করলেন এবং তিনি বায়েজিদের কাছে দূত পাঠালেন চিঠি দিয়ে, দাবি করলেন সুলতান বায়েজিদ যেন ক্বারা ইউসুফকে সসম্মানে মুক্তি দেন এবং তৈমুরের রাজ্যে নাক গলানো বন্ধ করেন।

তৈমুর একজন প্রকৃত বীরের মত বায়েজিদের বীরত্ব ও সাফল্যকে স্বীকৃতি দিয়ে লেখেন;

'আপনার এ ধরনের বোকামি আর হঠকারিতার ভিত্তি কি? আপনি আনাতোলিয়ার অরণ্যে কিছু ছোটখাটো যুদ্ধ করেছেন, ছোটখাটো বিজয়ও পেয়েছেন। ইউরোপেও আপনি খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে বিজয় পেয়েছেন, আল্লাহ আপনার তরবারিতে বরকত দিয়েছেন। আর কাফেরদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে আল কুরআনের বিধি বিধান মেনে চলার ক্ষেত্রে আপনার নিষ্ঠা দেখেই আমরা আপনার দেশ ও রাষ্ট্র, একটি মুসলিম জনপদ আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকছি। এখনও সময় আছে, ভেবে দেখুন এবং আপনার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হউন। আর এ ভাবেই আপনি আপনার ঘাড়ের উপরে নিঃশ্বাস ফেলতে থাকা এই আমাদের আক্রোশ থেকে বাঁচতে পারেন। আপনার সেনাবাহিনী তো একটা পিঁপড়ার দলের মত, অযথা কেন হাতির পদতলে পিষ্ঠ হবার সাধ জাগছে?'

এ চিঠির সাথে সাথে সুলতান বায়েজিদ কর্তৃক বন্দী করে নিয়ে যাওয়া ক্বারা ইউসুফকেও ফেরত চাইলেন তৈমুর।

সুলতান বায়েজিদ তখন ইউরোপের মাটিতে ওসমানীয় সেনাবাহিনী নিয়ে এক অভিযানে ব্যস্ত। তার কাছে তৈমুরের এই চিঠি পৌছানো হলে তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তৈমুরের চিঠির জবাব দিলেন অত্যন্ত প্ররোচনামূলক ও অপমানজনক ভাষায়;

'তোমার সৈন্যসংখ্যা অগুনিত, সেটা সত্য, কিন্তু তাতে হয়েছে কি? আমার অদম্য, অজেয় এই সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তাতার মোগলদের খঞ্জর কোন কাজে আসবে? আমার কাছে আশ্রিত রাজপুত্রদের আমি অবশ্যই নিরাপত্তা দেবো (এখানে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া ক্বারা ইউসুফকে বোঝানো হচ্ছে-লেখক)। পারলে তাকে উদ্ধার করতে আমার সেনাছাউনিতে এসো।

আমি যদি তোমার অস্ত্রের মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে পালিয়ে যাই, তা হলে আমার স্ত্রীরা যেন পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। আর তুমি যদি উন্মুক্ত ময়দানে আমার মুখোমুখি হওয়া থেকে পালাও, তবে মনে রেখো, ফিরে গিয়ে দেখবে তোমার স্ত্রীকে এক বিদেশি (অর্থাৎ সুলতান বায়েজিদকে বোঝানো হচ্ছে-

লেখক) ইতোমধ্যেই আলিঙ্গন করেছে!' বায়েজিদ কর্তৃক লেখা চিঠিতে এ ধরনের প্ররোচনামূলক ও অসংযত ভাষা তৈমুরকে রাগে দিশেহারা করে তুললো। এটুকু ছাড়াও তার জন্য আরও অপমানের আয়োজন করা হয়েছিল উক্ত চিঠিতে।

চিঠির সমাপ্তিটা যেভাবে টানা হয়েছে, তাও ছিল তৈমুরের জন্য অপমানজনক। তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। চিঠির নিচে সুলতান বায়েজিদের নাম ও স্বাক্ষর লেখা হয়েছে বড় বড় অক্ষরে সোনা দিয়ে মোড়ানো হরফে। আর চিঠির প্রাপক হিসেবে তৈমুরের নাম লেখা হয়েছে নিচে, ছোট্ট করে, কালো কালিতে।[৮৪]

চিঠির উপস্থাপনা, তাতে ব্যবহৃত ভাষা, চিঠির বিষয়বস্তু, বিশেষ করে তৈমুরের স্ত্রীদের সম্মানহানি করে, তার আত্মসম্মানে আঘাত করে লেখা বাক্যগুলো তৈমুরের মত একজন সম্রাট, একজন বীর যোদ্ধার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছিল না। আর সেটা যে সুলতান বায়েজিদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও ছিল না, সেটা তার চিঠিতে ব্যবহৃত ভাষা দেখেই বোঝা যায়।

ফলে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠলো। তৈমুর খুবই কম কথা বলতেন, স্বল্পভাষী এবং নিষ্ঠাবান ধার্মিক ছিলেন। সুলতান বায়েজিদের পক্ষ থেকে এরকম একটা চিঠি পেয়ে তিনি আর একটা মুহূর্তও দেরি করেননি। ওসমানীয় খেলাফতের সীমানায় তার সেনাবহিনীকে আক্রমণ পরিচালনার আদেশ দিলেন।

তৈমুর সুলতান বায়েজিদের কেন্দ্র, আধুনিক তুরস্কের 'সিভাস' শহর আক্রমণ করলেন। বায়েজিদের পুত্র সুলেমান এ আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পালিয়ে বাঁচলেন। সুলতান বায়েজিদ তখন বহুদূরে; ইউরোপের মাটিতে আর এক অভিযানে ব্যস্ত।

এদিকে ক্রমাগত আঠারো দিনের অভিযানে তিনি বায়েজিদের সৈন্যবাহিনীর হাজার হাজার আর্মেনীয় খ্রিষ্টান সৈন্য হত্যা করলেন। পুরো শহরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন। তৈমুর এবারে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এক এক করে আলেপ্পো, দামেশক এবং এর পরে বাগদাদের দিকে এগুলেন প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে চুরে!

উনিশ

পুরো মধ্য এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের এই যে বিবর্তন ও পরিবর্তন তা কিন্তু ইতঃপূর্বে ঘটে যাওয়া একটা আর্থসামাজিক, ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক পরিবর্তনের সূত্র ধরে ঘটে যাওয়া আরও একটি পরিবর্তনের উপরেই ঘটে চলেছে। এবারের এই পরিবর্তন যেমন নতুন নয়, তেমনি এটা শেষও নয়।

মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম সমাজের স্থিতাবস্থার বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে তাতার হালাকু খানের বাগদাদ আক্রমণের সূত্র ধরে। আর হালাকু খানের সে আক্রমণটা ঘটেছিল আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের চরম দুশমন ইসমাইলি শিয়া মতাদর্শীদের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে। তাদের দ্বারাই আমন্ত্রিত ও প্ররোচিত এবং একইসাথে সহায়তাপ্রাপ্ত হয়েই হালাকু খান বাগদাদ আক্রমণ করেন ১২৫৮ সালে।

বিশ্ব ইতিহাসের সে এক বর্বর উপমাহীন নৃশংসতা। মাত্র চার সপ্তাহ সময়কালে তাতাররা বাগদাদে যে নৃশংসতা চালিয়েছে তা বর্ণনাতীত। এমনকি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নৃশংসতা ঘটাতে যুদ্ধমান সকল পক্ষের অন্তত সাড়ে চারটা বৎসর সময় লেগেছে! কিন্তু বাগদাদে মাত্র চার সপ্তাহের মধ্যে তাতাররা 'প্রাণ' আছে, এমন প্রতিটি দৃশ্যমান প্রাণী, যা তাদের নজরে পড়েছে, হত্যা করেছে। বিশ্ব ইতিহাস কোনদিনই সে নৃশংসতার সঠিক চিত্র বর্ণনা করতে পারেনি।

তাতারদের আক্রমণ পরবর্তী সময়কালে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক চিত্র পাল্টে যায়। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিন্যাস হতে না হতেই এর মাত্র একশত চল্লিশ বৎসর পরে এসে ঐ একই জনপদে সামরিক আগ্রাসন চালালেন তৈমুর। মাত্র দেড় শত বৎসরের মধ্যে পরপর দুই দু'টি বিধ্বংসী আগ্রাসনের ফলে এতদঞ্চলের ভূ-রাজনীতি, আর্থসামাজিক ভারসাম্য ও চিত্রপট চিরদিনের জন্যই বদলে যায়।

প্রায় হাজার বৎসর বা তার কাছাকাছি সময়কাল ধরে যে সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল, সেই সমাজব্যবস্থা এবং এর অবকাঠামো মাত্র এক বা দেড় শতকের মধ্যেই আমূল বদলে গেল।

এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ দিক যেটি, সেটি হলো, এই প্রথমবারের মত ইসলাম ও ইসলামি সমাজের চালকের আসন হতে আরব প্রাধান্য খর্ব হলো। সে স্থলে পারসিক, মোগল, তুর্কি, কিবত্বি, কুর্দি ও উত্তর আফ্রিকার বার্বাররা এসে দাঁড়ালো! এই পরিবর্তনের ফলে পুরো ইসলামি আদর্শই কেবল নয়, বিশ্বজুড়ে ইসলামি সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা, এর

রাজনৈতিক চেহারার উপরেও একটা সুস্পষ্ট ছাপ পড়বে। আমরা ইতঃপুর্বে আরব তথা মুসলিম বাণিজ্যিক নেটওয়ার্কের কথা বলেছি, মোঙ্গল আক্রমণের ফলে পুরো মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া দূরপ্রাচ্যের বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক ভেঙে পড়ে। এর ফল হয়েছে মারাত্মক ধরনের।

প্রথমত, এই বিশাল বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক ভেঙে পড়ার কারণে এতদঞ্চলের আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে যায়। অনেক প্রতিষ্ঠিত বণিক পরিবার ও গোষ্ঠী নিঃশেষ হয়ে যায়। বিশাল আব্বাসীয় সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার পরে সে স্থলে পুরো মুসলিম এলাকাজুড়ে ছোট বড় নানান গোত্রের শাসন চালু হয়।

তার মানে হলো, এককালের বিশাল আব্বাসীয় সাম্রাজ্য বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এইসব রাজ্যগুলোর প্রায় প্রতিটিই ছিল পরস্পর পরস্পরের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন, ফলে তাদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সংঘাত লেগে থাকতো নিত্যই।

ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতের আরও একটা বড় কারণ ছিল ধর্মীয় ও আদর্শিক দ্বন্দ্ব। একই ইসলাম ধর্মের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও উমাইয়া-আব্বাসীয়, শিয়া-সুন্নি, খারেজি-মুতাজিলা, বাতেনি-বিশারিয়া এরকম নানা দল উপদলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব-সংঘাত ছিল এ সময়কালে অতি সাধারণ ঘটনা।

প্রাণ নিয়ে তারা বা তাদের পরবর্তী বংশধররা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে হিজরত করতে থাকে ভাগ্যের সন্ধানে। এরকম ভাগ্যের সন্ধানেই দলে দলে পারসিক, উজবেক, মোগল, আফগানসহ নানান গোষ্ঠীর লোকজন পাড়ি জমায় ভারতে।

আকবরের পূর্ব পুরুষ, তার দাদা বাবর এবং বাবা হুমায়ুন, মা হামিদা বানু প্রমুখ এভাবেই ভাগ্যের সন্ধানে ভারতে আসবেন। একইভাবে আসবেন আবুল ফজল, বৈরাম খান এরকম হাজার হাজার পারসিক বা উজবেক বা তুর্কি কিংবা মোগল মুসলমান। এরা কেউ মতাদর্শ বিচারে হবেন সুন্নি (যেমন বাবর, হুমায়ুন), কেউ হবেন শিয়া (যেমন, বৈরাম খান, হামিদা বানু), কেউবা হবেন মুতাজিলা (যেমন আবুল ফজল ও তার বাবা শেখ মুবারাক)

ধর্মীয় মতাদর্শজনিত পার্থক্যের কারণে সংঘাত এই জনপদে বেড়ে যায় আব্বাসীয় খলিফা মামুনের আমল থেকে। শেষ উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান মুতাজিলা গোষ্ঠীকে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে সমর্থন দেয়া শুরু করলেও সেটা অনেকটাই ছিল কেবলমাত্র আদর্শগত সমর্থন। কিন্তু এর

কিছুকাল পরে এসে আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন ক্ষমতায় থাকাকালীন তিনি এই মতবাদকে কেবল নৈতিক সমর্থনই প্রদান করেননি, বরং তিনি এটাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তথা বল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করার বা চাপিয়ে দেয়ারও চেষ্টা করেন।

বসরার প্রখ্যাত সুফি সাধক হযরত হাসান বসরীর সাগরেদ ও তাঁর ছাত্র ওয়াসিল ইবনে আতা'আ চিন্তা ও মতাদর্শগত কারণে তারও গুরু হযরত হাসানের কাছ থেকে পৃথক হয়ে এসে এই উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর জন্ম দেন।

অতি প্রাচীন এই (অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝিকাল থেকে) মুতাজিলা গোষ্ঠী ইসলামের ভেতরে এক অনৈক্য ও বিভেদের পথ খুলে দেয়।

এরা গ্রিক বা হেলেনিক চিন্তাধারাকে ইসলামি চিন্তাধারার সাথে মিশিয়ে এক হযবরল পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়ে পড়ে। আল্লাহ, কুরআন, প্রিয় রাসূল (সাঃ) এর উপরে আগত অহি এসব নিয়ে এমন সব বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা ও বিতর্ক শুরু করে যা এক কথায় ইসলামি চিন্তার জগতে ভয়াবহ পরিস্থিতি টেনে আনে।

খলিফা মামুনের ছোট ভাই খলিফা মু'তাসিম (৮৩৩ খ্রিঃ-৮৪১ খ্রিঃ) মামুনের মতই মুতাজিলা সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা দিতে থাকেন। আবার খলিফা মামুনের ভাতিজা খলিফা মুতাওয়াক্কিল (শাসনকাল ৮৪৭ খ্রিঃ-৮৬১ খ্রিঃ) এসে এই গোষ্ঠীসহ বিভিন্ন শিয়া দল-উপদলের বিরুদ্ধে দমনাভিযান শুরু করেন।

এ অচলাবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে। আমরা সে ইতিহাসের আলোচনা এখানে করতে পারবো না বিষয়বস্তুর গভীরতা, প্রাসঙ্গিকতা ও বিশালত্বের বিবেচনায়। তবে প্রয়োজনের খাতিরে কেবলমাত্র এতটুকুই বলে রাখা ভালো যে, এই বিতর্ক ও দ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতায় বাগদাদভিত্তিক আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের পতনই কেবল ত্বরান্বিত হয়নি (১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ), বরং বহু রাজনৈতিক উত্থান-পতনও ঘটেছে মুসলিম বিশ্বজুড়ে।

এরকম রাজনৈতিক উত্থান আর পতনের প্রক্রিয়াতেই পারস্যের বুকে সুন্নি আব্বাসীয় খেলাফতের স্থলে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে 'সাফাউই' বা 'সাফাভি' নামক কট্টর ও উগ্রপন্থী শিয়া গোষ্ঠী। উগ্রপন্থী ও কট্টর সুন্নিবিরোধী এই শিয়া গোষ্ঠী ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিকে কখনও ইচ্ছায় আবার কখনও তাদের নিজেদের অজান্তেই প্রভাবিত করবে গভীরভাবে।

বিখ্যাত ক্বাদেসিয়ার যুদ্ধের মাধ্যমে সেই ৬৫৩ খ্রিষ্টাব্দ ও তার পরবর্তী সময়কালে ইরান বা পারস্য সাম্রাজ্য ইসলামের ছায়াতলে আসে। আর সে

থেকেই এই জনপদটি ছিল সুন্নি ইসলামের এক লীলাভূমি। বাগদাদ, কুফা, হিরা, খোরাসান, ইস্পাহান ও বসরা শহরগুলো সাহিত্য, শিল্পকলা, দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এরকম কয়েকটি তীর্থস্থান গড়ে উঠে এ অঞ্চলে যা পুরো মুসলিম বিশ্বের পাশাপাশি পুরো বিশ্বকেই চমকিত ও সমৃদ্ধ করেছে যুগের পর যুগ ধরে।

দীর্ঘ সাড়ে আটশত বৎসর পরে এসে এই সাফাউই গোষ্ঠীই এই জনপদ ইরান; তথা পারস্যকে সেই গৌরবজনক অবস্থান থেকে বিচ্যুত করে। সেটা ছিল ১৫০১ সাল; তথা ষষ্টদশ শতাব্দীর একবারে শুরুর দিকের ঘটনা।

শাহ ইসমাইল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ রাজবংশ প্রথম থেকেই কট্টর শিয়ামতাদর্শী ও সুন্নিবিরোধী। তারা তাদের কর্মপন্থায়ও খুব উগ্র ছিল। এই শাহ ইসমাইলই সম্রাট আকবরের দাদা, ভারতের মোগল শাসনের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবরকে সমরখন্দ দখলে সহায়তা প্রদানের পরিবর্তে তিনটি পূর্বশর্ত আরোপ করেছিলেন, সে কথা আমরা ইতঃপূর্বেই আমাদের আলোচনায় বলেছি।

সেই তিনটি শর্তের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুইটি শর্ত ছিল; বাবর নিজে শিয়ামতাদর্শে দীক্ষা নেবেন এবং একই সাথে সমরখন্দ জয় করার পরে সেখানেও শিয়া মতাদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করবেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

বাবর প্রথমে সে সব শর্তে রাজি হয়েও পরবর্তীতে শিয়া মতাদর্শ প্রচার ও সমরখন্দের সুন্নি আলেমদের হত্যা করতে অস্বীকার করলে শাহ ইসমাইল সমরখন্দের উজবেক শিয়াদের উসকে দিয়ে বাবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়েছেন, উজবেকদের সামরিক সহায়তা দিয়ে বাবরকে উচ্ছেদও করিয়েছেন সমরখন্দ থেকে, সেটাও আমরা ইতোমধ্যেই আলোচনা করেছি।

এই শাহ ইসমাইলই পরবর্তীতে এসে পুরো ইরানকে এক শিয়া মতাদর্শের অধীনে একত্রিত করেন এবং ১৫০১ খ্রিষ্টাব্দে শিয়া ধর্মকে ইরানের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করার জন্য। [৮৫]

পাশাপাশি পারস্যের সুন্নি মতাদর্শীদের বিরুদ্ধে এক জঘন্য দমনাভিযান পরিচালনা করেন।

শাহ ইসমাইলের সন্তান শাহ তাহমাসাব'ও বাবার মতই দাবি জানিয়েছিলেন আকবরের বাবা সম্রাট হুমায়ুন যখন রাজ্য হারিয়ে সাহায্যের আশায় তার কাছে এসেছিলেন। সেই একই দাবি; হুমায়ুন যেন পারসিক সাহায্যের বিনিময়ে নিজে শিয়া মতাদর্শ গ্রহণ এবং দিল্লি পুনরুদ্ধার হলে সেখানে এই মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করেন ।

ইরানের বাইরে শিয়া মতাদর্শকে ছড়িয়ে দেয়ার এই যে ব্যগ্রতা, এটা থেকে আমাদেরকে ঐতিহাসিক শিক্ষা নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সংঘটিত অনেক রাজনৈতিক পরিবর্তনের পেছনে এই ব্যগ্রতা ও সুন্নি মুসলমানদের প্রতি তাদের বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে। এখানে একটা কথা জেনে রাখা দরকার, সেটা হলো এই যে, শিয়া মতাদর্শে পরিবর্তিত ইরানকে সুন্নি ওসমানীয় খেলাফতের পেছনে লেলিয়ে দেয়ার পেছনে তৎকালীন ইংল্যান্ডের, তথা, ইংরেজ সরকারের প্রত্যক্ষ মদদ ও উস্কানি ছিল। প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত বার্নাড লুইস তার সুবিখ্যাত What Went Wrong নামক গ্রন্থে সে কথা নির্দ্বিধায় বলেছেন।

বার্নাড লুইস সুস্পষ্ট তথ্য ও দলিলের ভিত্তিতে জানাচ্ছেন যে, শাহ আব্বাস এই দুই ভাই-এর পরামর্শ ও সহায়তায় ইংল্যান্ডসহ বিভিন্ন ইউরোপীয় সরকারের সাথে যোগাযোগ করার মাধ্যমে অস্ত্র সংগ্রহ করে ওসমানীয় খেলাফতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন। [৮৬]

ইতিহাসের সচেতন পাঠক মাত্রই জানেন, এই ইংল্যান্ড সরকারই সময়মত তাদের আর এক চর; টি.ই. লরেন্সকে (T. E Lawrence যিনি 'লরেন্স অব আরাবিয়া' নামে সমধিক পরিচিত) হেজাজে শরিফ হুসেইন ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী সউদের কাছে বন্ধু (!) হিসেবে পাঠিয়েছে এবং উভয়কেই ওসমানীয় খেলাফতের বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধে নেমে পড়ার জন্য সবরকম উসকানি ও রসদ, এমনকি, অর্থ সাহায্যও দিয়েছে! [৮৭]

যা হোক, পারস্যের এই রাজনৈতিক অস্থিরতা আর বিরোধী মত দমনের সময় রাষ্ট্রের নির্যাতন থেকে বাঁচতে অনেকেই আশপাশের বিভিন্ন রাজ্যে হিজরত করেছে। এর মধ্যে উঠতি মোগল সাম্রাজ্য ছিল প্রথম গন্তব্যস্থল, এর সম্পদ ও সম্ভাবনার জন্য।

ইরান থেকে মোগল ভারতে এবং বলা চলে পুরো ভারতবর্ষে ভাগ্যান্বেষণে আসা এইসব ব্যক্তিদের চাহিদা তখন তুঙ্গে। কারণ, আফগান বা পারসিক বা উজবেক বা তুর্কি থেকে ভারতে আসা প্রতিটি সুলতান বা বাদশাহ ও তার সভাসদদের ভাষা ছিল ফার্সি। সঙ্গত কারণেই প্রশাসন চালাতে এইসব ফার্সিভাষী লোকগুলোকে তারা লুফে নেয়।

এ ছাড়াও, স্থানীয় ভারতীয় হিন্দুদের চেয়ে প্রথমদিকে স্বজাতি ও স্বভাষী পারসিক বা আফগানদের সেনাবাহিনীতে চাকরি দেওয়াটাও ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি নিরাপদ ও সহজ। অকল্পনীয় ধনী রাষ্ট্র ভারতের সম্রাট বা সুলতানদের অধীনে যে কোন ধরনের একটা চাকরি জোগাড় করতে পারা যে কেবল আর্থিক নিরাপত্তার কারণ ছিল তাই নয়, বরং দ্রুত বর্ধনশীল সালতানাতের অধীনে প্রভাবশালী পদে অধিষ্ঠিত হবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

বিশ

বাড়ির পাশে পারস্য বা ইরানে যখন এই পটপরিবর্তন ও তার রেশ ধরে ভারতভূমিতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো, উভয়ের মধ্যে আমরা যোগসূত্র খুঁজছি, ঠিক তখনই আমাদের সামনে আরও একটি ঘটনা এসে দাঁড়ায়। এ ঘটনাটিও আমাদের এ জনপদ; ভারতবর্ষ হতে বহু দূরের কোন এক দেশে ঘটে চলেছে, কিন্তু তার এক বিধ্বংসী রেশ এসে এই উপমহাদেশে পড়বে এবং তা সম্রাট আকবরের জীবন ও তার শাসনকালকে প্রভাবিত করবে। কেবল যে সম্রাট আকবর ও তার পরবর্তী শাসকদের জীবন ও শাসনকালকেই প্রভাবিত করবে, তা নয়, প্রভাবিত করবে এতদঞ্চলের পুরো সমাজব্যবস্থা, এর রাজনীতি ও সামাজিক অবস্থান এবং ভবিষ্যৎকেও। আজও আমরা তার রেশ কাটিয়ে উঠতে পারিনি। বিষয়টা যখন এতটাই গুরুত্বপূর্ণ, তখন ইতিহাস বিশ্লেষণের স্বার্থেই সেটাকে একটু খতিয়ে দেখবো।

এ ঘটনাটিও আমাদের ইতঃপূর্বের আলোচনায় বলা মধ্য এশিয়া, বা আব্বাসীয় সাম্রাজ্য ও তার আশপাশের অঞ্চলে পরিচালিত হালাকু খান, চেঙ্গিজ খান এবং সবশেষে তৈমুর লংয়ের আক্রমণের ফলে এতদঞ্চলীয় নৌবন্দর ও বাণিজ্য রুটের উপরে মুসলিম কর্তৃত্ব ভেঙে পড়া ও সে স্থলে একটা শূন্যতা সৃষ্টি হওয়া বা প্রতিষ্ঠিত শক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটার সূত্র ধরে ঘটেছে।

আরব মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বন্দরসমূহের উপর থেকে বণিক ও দেশসমূহের নিয়ন্ত্রণ মুসলিম হ্রাস পাওয়ার কারণে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণে এগিয়ে আসে তিনটি ইউরোপিয়ান শক্তি। পর্তুগাল, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স। এই তিন শক্তি আরব মহানগর ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নৌবন্দর গুলোতে এই সুযোগে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে উঠে পড়ে লাগে। এদের মধ্যে পর্তুগাল ছিল সবচেয়ে অগ্রগামী ভূমিকায়।

শাহ ইসমাইল ১৫০১ সালে ইরানে শিয়া মতবাদকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করে সুন্নি মুসলমানদের (এমনকি, মধ্যপন্থী অন্যান্য শিয়াদের বিরুদ্ধেও) দমনাভিযান চালাচ্ছেন তার মাত্র বৎসর সাতেক আগে আন্দালুসিয়ার শেষ ঘাঁটি গ্রানাডার পতন হয়েছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন যুদ্ধ চালিয়ে শেষে ১৪৫২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ জানুয়ারি বুধবার দুপুরের পরপরই রাজা ফার্ডিনাণ্ড ও রানী ইসাবেলা বিজয়ীর বেশে গ্রানাডায় প্রবেশ করেন।

পুরো স্পেন, পর্তুগাল ও বিশেষ করে খ্রিষ্টবাদের প্রাণকেন্দ্র রোমসহ পুরো ইউরোপ তখন এক অবর্ণনীয় উল্লাসে ভাসছে! আব্বাসীয় সাম্রাজ্য মুসলমানদের নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বে ধসে গেছে।

প্রায় সাড়ে সাতশত বৎসরের মুসলিম শাসনের অবসান ও স্পেনের মাটিকে সাফল্যের সাথে মুসলিমশূন্য করতে পেরে পোপের আশীর্বাদ পেয়ে ফার্ডিনান্ড ইসাবেলা দম্পতি তখন নিজেদেরকে খ্রিষ্টবাদের রক্ষক' 'ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহভাজন' ভাবতে শুরু করেছেন। তাদের আগ্রহ উদ্দীপনা যেমনি গগনচুম্বী তেমনি আত্মবিশ্বাসও প্রচণ্ড। রোম থেকে স্বয়ং পোপও তখন তাদেরকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে শুরু করেছেন।

পোপের মনে যেমন, তেমনি ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলাসহ পুরো খ্রিষ্টবিশ্বের মনে তখন এক দগদগে ঘা হিসেবে বিরাজমান অস্থিরতা হলো; মাত্র চল্লিশ বৎসর আগে (১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে) মুসলমানদের হাতে (ওসমানীয় সাম্রাজ্যের হাতে) খ্রিষ্টবাদের দ্বিতীয় পবিত্র নগরী কন্সটান্টিনোপল বা ইস্তাম্বুল হারানোর বিষয়টি। আর তাছাড়া সেই ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ২ অক্টোবর শুক্রবার মুসলমানদের হাতে জেরুজালেম হারানোর দুঃখ তো রয়েছেই।

স্পেন বিজয়ের সাফল্যে উজ্জীবিত এই দম্পতি তখন নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। তারা পরিকল্পনা করলেন আটলান্টিকের ওপারে মিশন পাঠাবেন, দেশ জনপদ খুঁজে বের করার সাথে সাথে সেখানেও খ্রিষ্টের বাণী পৌঁছে দেবেন।

আবার পূর্ব দিকেও তারা মিশন পাঠাবেন, খ্রিষ্টের বাণী ছড়িয়ে দিতে এবং একইসাথে ওসমানীয় খেলাফতের উপরে আক্রমণ পরিচালনার জন্য পূর্ব দিক দিয়ে যদি কোনো নৌরুট বের করা যায়, তা হলে সেটা হবে এক দারুণ আবিষ্কার! সে পথে কেবল ইস্তাম্বুলের উপরেই নয়, বরং জেরুজালেমের দিকেও সামরিক অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব হবে। আর এ সম্ভবনার ব্যাপারে রানী ইসাবেলার আগ্রহ ছিল সীমাহীন।[৮৮]

এ কাজের জন্য রানী ইসাবেলা ক্রিস্টোফার কলম্বাসকে 'গ্র্যান্ড অ্যাডমিরাল' পদে নিযুক্তি দিয়ে রানী তার অধীনে মাত্র তিনটি জাহাজ ও অষ্টাশি জন নাবিক দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন পূবের দিকে।[৮৯]

কলম্বাসের একটা দাবি ছিল; তিনি যদি কোনো ভূ-খণ্ড দখল করতে পারেন তবে, সেখান থেকে আয়ের শতকরা দশ ভাগ আয় ব্যক্তিগতভাবে তাকে দিতে হবে। রানী বিনা বাক্যব্যয়ে তার সে দাবি মেনে নিলেন। উল্লসিত কলম্বাস নতুন এক দিগন্ত উন্মোচনের জন্য পাল ভাসালেন তার ছোট্ট নৌবহর নিয়ে।

অবশ্য তার মাত্র কয়েক বৎসর আগে ১৪৯৮ ভাস্কো ডা গামা ভারতের কেরালার কালিকটে এসে নোঙর করেন। ভাস্কো ডা গামা'র এই সফলতার খবর বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে পড়লো পুরো পর্তুগালে।

পর্তুগালের সামনে খুলে গেল সম্পদ, বিত্ত আর বৈভবে ভরপুর এক স্বর্গরাজ্যের দুয়ার। খ্রিষ্টরাজ্যের জন্য প্রয়োজন অঢেল সম্পদ আর লোকবলও প্রয়োজন ছিল। আর তারা তা যথাযথভাবেই পূরণ করেছে ভারত থেকে যেমনি, তেমনি সদ্য আবিষ্কৃত আটলান্টিকের ওপার থেকেও। এ ছাড়াও তারা একই সাথে সন্ধান পেলো দূরপ্রাচ্যের ক্যান্টন (চীন) ও জাভা দ্বীপপুঞ্জে যাবার পথ।

চীনের ক্যান্টন পর্যন্ত পৌছানোর মানে হলো আরব মুসলমান ও ওসমানীয় সম্রাটদের প্রভাবাধীন মধ্য এশিয়ার মরুময়, ব্যয় ও ঝুঁকিবহুল সড়কপথ এড়িয়ে বিকল্প পথে সহজেই বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন সিল্করোডের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারা। প্রাচীন বিশ্বের গ্রিক ও রোমান সভ্যতার আমল থেকেই বিশ্ব বাণিজ্যের লাইফ লাইন ছিল এই সিল্করোড। রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রানী ইসাবেলার নেতৃত্বে স্পেন ও পর্তুগালের নব প্রতিষ্ঠিত খ্রিষ্টরাজ্য দারুণভাবে উজ্জীবিত ও উল্লসিত।

এর পরের বৎসর থেকেই এক এক করে ছুটে আসলো পর্তুগিজ বণিক। তাদের প্রতিটি জাহাজই যেন এক একটি যুদ্ধজাহাজ, প্রতিটি বণিকই যেন এক একজন দক্ষ যোদ্ধা! ১৪৯৮ থেকে ১৫০৩ মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যেই তারা কোচিনে তৈরি করে নিল প্রথম দুর্গ। বললো, এটা তাদের বাণিজ্য কুঠি। কেরালার রাজার কোনো ক্ষমতা হলো না এতে বাধা দেয়ার, অথবা মিনমিনে গলায় বাধা দিলেও লাভ হলো না। কেরালার রাজা নিজেই তখন পর্তুগিজ বণিকদের হাতের পুতুল হয়ে উঠলো।

আর এর মাত্র বছর চারেকের মধ্যেই বিজাপুর মুসলিম সালতানাতের কাছ থেকে বাণিজ্য করতে আসা পর্তুগিজ বণিকরা (!) গায়ের জোরে কেড়ে নিল গোয়া। ভারতের মাটিতে প্রথম পর্তুগিজ কলোনি!

আকবরের দাদা সম্রাট বাবর তখন সমরখন্দ থেকে কাবুল এবং পরিশেষে কাবুল থেকে দিল্লির দিকে তার সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ব্যস্ত, আর ঠিক এই সময়টাতেই; ১৫১০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে আটলান্টিকের পূর্ব উপকূল; পর্তুগাল থেকে পর্তুগিজ জেনারেল ও নাবিক আফোনসো ডি আল বুকার্ক দক্ষিণ ভারতের উপকূলীয় এলাকা গোয়া দখল করেন।

কালক্রমে এই গোয়া'ই হয়ে উঠবে ভারতের মাটিতে পর্তুগিজ বেনিয়াদের কেন্দ্র ও প্রধান কর্মস্থল। এখান থেকেই তারা পুরো ভারত মহাসাগর ও আরব সাগরের উপরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি চীন ও দূর প্রাচ্যের সাথে তাদের বাণিজ্যিক ও সামরিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে।

ভারতের দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও পশ্চিম উপকূল জুড়ে আরব সাগরের উপরে নিজেদের নৌ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারাটা পর্তুগিজদের জন্য এক বিরাট সফলতা হিসেবে বিবেচিত হবে। খ্রিষ্টবাদ প্রতিষ্ঠা এবং পুরো বিশ্বকে খ্রিষ্টবাদের আওতায় নিয়ে আসার এক অলীক স্বপ্নে বিভোর পর্তুগিজরা এবারে তাদের আসল উদ্দেশ্য ও চেহারায় আত্মপ্রকাশ করবে অচিরেই।

বাণিজ্যের নামে বেরিয়ে এলেও তাদের উদ্দেশ্য যে সৎ ছিল না, সেটা প্রথম থেকেই পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল। এতদঞ্চলের নৌপথে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে তারা এবারে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহার শুরু করবে।

এ ব্যাপারে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক J. H. Elliott বলেন; The Portuguese have the dubious distinction of introducing politics into the (Indian) ocean. Maritime trade had hitherto been considered as open to all and subject only to competitive pressures and and local insentives. The Muslim traders and Islamic shipping interests had gained a near monopoly of the sea-routs to the west and to the east had not therefor been cause for alarm. But as of the early sixteenth century the freedom of the seas and of the monsoon winds was called in question. Thanks to development in navigation and naval gunnery, oceaning trade was suddenly revealed as susceptible to state direction and subject to military control. By demonstrating that maritime empire was a paying and a political proposition, the Portuguese has indeed politicised the Indian Ocean. Land based empires which in any way depended on overseas trade would have to come to terms with it.

ভাবানুবাদ: পর্তুগিজরা ভারত মহাসাগরে প্রতারণাপূর্ণ রাজনীতি প্রবর্তন করে। এতদিন নৌবাণিজ্য সুবিধা স্থানীয় শক্তির উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে সকলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। মুসলিম নৌবাণিজ্য পূর্ব বা পশ্চিমে সকল নৌরুটেই প্রায় একচ্ছত্র কর্তৃত্ব অর্জন করেছিল কারো মনেই কোনো আতঙ্ক বা দুশ্চিন্তার উদ্রেক না করে।

কিন্তু আধুনিক নেভিগেশন যন্ত্র আবিষ্কার (দিকনির্ণয় যন্ত্র আবিষ্কার এর মধ্যে অন্যতম-লেখক) এবং জাহাজে কামান সংযোজনের কারণে ষষ্টদশ শতাব্দীর শুরুতেই নৌবাণিজ্যের এই সুযোগ প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়লো। হঠাৎ করেই

নৌবাণিজ্যের এই সুযোগ রাষ্ট্র এবং সামরিক শক্তির ইচ্ছাধীন হয়ে পড়লো। নৌবাণিজ্য সুবিধা প্রদান বা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্থ আদায় করা যায়, সে বাস্তবতা প্রয়োগ করে পর্তুগিজরা বাস্তবিকই ভারত মহাসাগরকে রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত করে ফেললো। এর ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপরে নির্ভরশীল আশপাশে এমন প্রতিটি রাষ্ট্রকেই এদের (পর্তুগিজ) সাথে বোঝাপড়া (নিরাপদে নৌবাণিজ্য করার জন্য- লেখক) করতে হবে।[১০]

আমরা যারা ইতিহাসের এই দৃশ্যপট থেকে শিক্ষা নিতে চাই, তারা এখানে এটা ভেবে দেখতে পারি যে, বিশ্ব ইতিহাসের যে সময়কালে ভারতের উত্তর সীমান্ত দিয়ে সম্রাট আকবরের পূর্বপুরুষ, তার দাদা বাবর ও বাবা হুমায়ুন, মা হামিদা বানু মধ্য এশিয়ার সমরখন্দ থেকে, পারস্যের ইরান থেকে আর ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্ত কাবুল থেকে ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতি, শিয়া ও সুন্নি মতাদর্শ, ইসলামি শাসন নিয়ে ভারতের মাটিতে পা রাখছেন, ঠিক সেই একই সময়কালে ঐ একই ভারতের দক্ষিণ সীমান্তে সেই সুদূর ইউরোপ থেকে আরও একটা বৈরী শক্তি, বৈরী মতাদর্শ খ্রিষ্টবাদও এসে নিজেদের উপস্থিতি সরবে জানান দিচ্ছে।

ভারতের বাইরে থেকে আগত পরস্পর বৈরী এই দুই গোষ্ঠীর দর্শন ও জীবনাচার, তাদের সমাজব্যবস্থা, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক লেনদেন, সামরিক, বৈষয়িক ও কূটনৈতিক আচার আচরণ, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এসব কেবলমাত্র আকবরসহ ভারতের রাজা বাদশাহদেরই প্রভাবিত করবে তাই নয়, প্রভাবিত করবে পুরো ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকেও। প্রতিটি ভারতবাসীর চিন্তা ও চেতনাকে, তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে, জীবন ও বিশ্ব সম্বন্ধে বোধ ও বিশ্বাসকেও নাড়িয়ে দেবে প্রবলভাবে।

নড়বড়ে হয়ে যাওয়া ও প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকুনি খাওয়া কলুষিত বা পরিবর্তিত, বিকৃত অথবা শানিত এই বোধ বিশ্বাস আর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই পরবর্তী ভারতীয় সমাজ বিচার করবে আকবরকে, শাহজাহানকে, আওরঙ্গজেবসহ হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান প্রত্যেকেই একে অপরকে। এই দৃষ্টিভঙ্গির বিচারেই আকবর কারো কাছে হবেন ভিলেন, আবার কারো কাছে বা হিরো!

একুশ

পর্তুগিজরা যেমন ভারতের মাটিতে বিদেশি, তেমনি বিদেশি ছিলেন আরব, মোঙ্গল বা তাতার বা ইরানি কিংবা তুর্কিরাও। পর্তুগিজরা ভারতবর্ষে আসার অন্তত হাজার বৎসর আগে এইসব বিদেশীরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে এসে বসবাস শুরু করেছেন।

এইসব বিদেশিদের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে, আরব বা অনরাব মুসলমানদের ক্ষেত্রে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, তারা ভারতবর্ষে এসেছেন এবং এখানে শান্তির সাথেই বসবাস করেছেন।

এদের সাথে সংঘাত তখনই ঘটেছে যখন আরব বা তুর্কি বা মোঙ্গল কিংবা আফগান মুসলমানরা সামরিক আগ্রাসনের অংশ হিসেবে এসেছে, তখন। জাতি ধর্ম বর্ণ বা স্থান কাল পাত্র নির্বিশেষে যে কোন দেশ ও সমাজের জন্য এটা একটা অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনা।

এসব আগ্রাসনের ফলাফল যাই হোক না কেন, ভারতবর্ষে মুসলমানরা স্থানীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মাবলম্বীদের সাথে পাশাপাশি শান্তি ও সম্প্রীতির সাথেই বসবাস করেছেন। ঐতিহাসিক এ বাস্তবতার স্বীকৃতি আমরা দেখতে পাই ভারতীয় হিন্দু ঐতিহাসিকের বর্ণনায়। বাঙালি ভারতীয় ও একজন হিন্দু ঐতিহাসিক সুকুমারী ভট্টাচার্য বলেন; 'দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত মুসলমান ভারতবর্ষে হিন্দুর সঙ্গে শান্তিতে সহাবস্থান করতেন।' [৯১]

তবে দক্ষিণ উপকূলে পর্তুগিজদের আগমনে সেই ধারা খুব শিগগিরই ভেঙে পড়বে। সে স্থলে জায়গা করে নেবে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও অনাস্থা আর বৈরিতা। গোষ্ঠী সংঘাত হয়ে পড়বে অনিবার্য এক বাস্তবতা। আর এর সূত্রপাত হবে দাক্ষিণাত্য, তথা কেরালার স্থানীয় হিন্দু রাজাদের নিজেদের উদ্যোগে, অনেকটা তাদের নিজেদের অজান্তেই।

পর্তুগিজরা যে সময়কালে ভারতের মাটিতে এসে ঘাঁটি গাড়ছে, সে সময়কালে দক্ষিণ ভারতের পরস্পর বৈরী বিভিন্ন হিন্দু রাজারা প্রতিপক্ষ রাজার উপরে নিজের কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার করার কাজে বহিরাগত এই পর্তুগিজ শক্তিকে ডেকে এনে ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাবার সুযোগ করে দেবে। সর্বনাশা এই ধারা সর্বপ্রথম শুরু করে মালাবার (কেরালা) উপকূলীয় কোচিন হিন্দু রাজাগণ।[৯২]

এ ছাড়াও স্থানীয় ছোটখাটো রাজারা যেমন; Kolathiri, Quilon এবং Purakkad এরাও প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার জন্য বা তাদের হাত থেকে নিজেদের রাজ্য রক্ষা করার জন্য পর্তুগিজদের আহ্বান করেছে, তাদের সহায়তা নিয়েছে। এর বিনিময়ে অবশ্যই পর্তুগিজরা সুবিধা নিয়েছে। তারা কেরালা বা মালাবার উপকূল জুড়ে নিজেদের ব্যবসার জন্য কুঠি নির্মাণের

নামে দুর্গ গড়ে তুলেছে।

ভাস্কো ডা গামা ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে সর্বপ্রথম যখন কালিকটের হিন্দু জামুরিন রাজার সাথে দেখা করে সেখানে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি চান, রাজা বিনা শুল্কে তাকে সেখানে ব্যবসা করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। ফলে ভাস্কো ডা গামা আগস্ট মাসে সেখান থেকে তার নৌবহর উঠিয়ে পার্শ্ববর্তী ছোট্ট রাজ্য কোলাথিরি'র রাজার আমন্ত্রণে সেখানে যান এবং উক্ত রাজা তাকে ব্যবসা করার পাশাপাশি কুঠি নির্মাণেরও অনুমতি দেয়।

পর্তুগিজরা তাদের মালপত্র বেচাকেনা করে ১৪৯৮ সালের নভেম্বর মাসে যাত্রা করে ১৪৯৯ লিসবনে পৌছায়। ভারত অভিমুখে এই নৌ যাত্রায় যত খরচ হয়েছিল পর্তুগাল সরকারের, তার মোট ষাট (৬০) গুণ লাভ নিয়ে ভাস্কো ডা গামা লিসবনে পৌছালে তাকে বীরোচিত সম্মান দেয়া হয়।[১৩]

এ পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল। কিন্তু বিপত্তি ঘটলো এর পরের বার! পরের বৎসর ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে অপর এক পর্তুগিজ Pedro Alvarez-এর নেতৃত্বে ৩৩টি জাহাজে ১৫০০ জন পর্তুগিজ নাবিক এসে কালিকট বন্দরে ভিড়ে। ব্যবাসয়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্র ধরে এবারে তারা সরাসারি স্থানীয় আরবদের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। বিনা উসকানিতেই তারা বন্দরে নোঙর করে থাকা আরব বণিকদের কয়েকটি জাহাজ জব্দ করে সকল আরব বণিককে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করে।[১৪]

ভারতের মাটিতে এ ধরনের ঘটনা একেবারেই নতুন। কালিকটের স্থানীয় হিন্দু মুসলিম জনতা এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে পর্তুগিজদের উপরে চড়াও হয় এবং তারা তাদের বাণিজ্য কুঠি ধ্বংস করাসহ প্রায় অর্ধেক পর্তুগিজ বণিককেই হত্যা করে ফেলে। প্রাণ ভয়ে Pedro Alvarez সেখান থেকে নোঙর তুলে কোচিন বন্দরে এসে ভিড়ে। এখানে কোচিনের স্থানীয় রাজা তাকে সাদরে গ্রহণ করে সেখানে ব্যবসা কুঠি নির্মাণ ও ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি দেন।[১৫]

লক্ষণীয় বিষয় হলো; একই ভারতীয় সমাজে মাত্র কয়েক শত কিলোমিটারের ব্যবধানে একই হিন্দু ধর্মাবলম্বী রাজাদের মধ্যে একজন বিদেশি তস্করকে ঝেঁটিয়ে তাড়াচ্ছেন ঠিক তখন সেই একই সমাজে তারই স্বগোত্রীয় আর এক রাজা ঐ একই তস্করকে মাথায় তুলে নিচ্ছেন, আশ্রয় দিচ্ছেন মহাসমারোহে, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গের উদ্দেশ্যে! আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির এই যে আত্মবিধ্বংসী ধারা, এর রেশ আমরা এখন থেকে দেখতে পাবো পুরো ভারতীয় সমাজে। আকবরের

জীবনে যেমনি, তেমনি আকবরের পরবর্তী বংশধরগণসহ এতদঞ্চলের অপরাপর রাজা-রাজড়াদের জীবনেও।

এখানে এসে আমাদের একটু ভেবে দেখা দরকার। যারা ইতিহাসের টার্নিং পয়েন্ট বা ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার ঘটনাটা জানতে চান, এটা হলো সেই ঘটনা, সেই মুহূর্ত, যেখান থেকে ইতিহাসের গতিধারা ভিন্ন দিকে মোড় নেবে। ভারতের মাটিতে পারস্পরিক সহাবস্থান, রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, সামাজিক ও মানবিক সাম্য, সৌহার্দ্য এবং সম্প্রীতি তিরোহিত হতে থাকবে। পরবর্তী ঘটনাসমূহ এ কথাটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে।

পর্তুগাল থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে, ভারতের মাটিতে কয়েকশত পর্তুগিজ প্রাণ হারানোর ঘটনায় স্পেনের মাটিতে সদ্য মুসলিম রাষ্ট্র ধ্বংসে সফলতা প্রাপ্ত উল্লসিত পর্তুগিজ খ্রিষ্ট সম্প্রদায় ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলো।

তাদের রাগ গিয়ে পড়লো ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থানরত মুসলিম সম্প্রদায়ের উপরে। তারা কোনমতেই সদ্য আবিষ্কৃত এই নৌরুট এবং স্বর্ণপ্রসবিনী ভূ-খণ্ড ভারতে ব্যবসা হারানোর ঝুঁকি নিতে রাজি না। যে কোনো মূল্যে ভারত ও আশপাশে নিজেদের ব্যবসায়িক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।

রাগে ক্ষোভে ফুঁসতে ফুঁসতে এর পরে এক বৎসরের মাথায় ভাস্কো ডা গামা আবার এলেন দক্ষিণ ভারতের উপকূলে। এবারে তিনি প্রস্তুতি নিয়েই আসলেন, সাথে আনলেন ১৫টি জাহাজ ভর্তি আটশত যোদ্ধার এক বাহিনী, আর সেই সাথে পর্তুগিজ রাজা Dom Manuel-এর থেকে প্রয়োজন হলে সামরিক অভিযান পরিচালনার অনুমতি।

১৫০২ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকেই এসে পশ্চিম দক্ষিণ ভারত মহাসাগরের 'অন্‌জদিবা' বন্দরে ভিড়লেন। সেখানে আগে থেকেই অবস্থানরত আরব বাণিজ্য জাহাজগুলোকে জোর করে দখল করে নিলেন এবং এর পরে তিনি কনৌরের বন্দরে ভিড়লেন তার জাহাজ নিয়ে। সেখানে কনৌরের হিন্দু রাজা তাকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং তার সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পন্ন করলেন, যে চুক্তির বলে পর্তুগিজরা কুঠি নির্মাণসহ বাণিজ্য করার অধিকার পেলো।

একের পর এক সফলতায় উজ্জীবিত ভাস্কো ডা গামা এর পরে কালিকটের দিকে এগুলেন। এখানে তিনি জামুরীনের রাজার কাছে সরাসরি দাবি জানালেন তিনি যেন তার রাজ্য থেকে সকল আরব বণিকদের বের করে দেন। জামুরীনের রাজা তার এ আবদার মানতে অস্বীকার করলে ভাস্কো ডা

গামা তার আসল চেহারায় আত্মপ্রকাশ করলেন। তিনি এক নাগাড়ে তার জাহাজ থেকে পর পর কয়েকদিন গোলা নিক্ষেপ করে শহরটাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিলেন।

এ বর্বরতা দেখে, নিজের ও পরিবার পরিজনের জান, মাল ও সম্মান বাঁচাতে কালিকটের রাজা এক রকম বাধ্য হয়েই ভাস্কো ডা গামার সাথে চুক্তি করলেন। চুক্তি বলে পর্তুগিজরা কালিকটে কুঠি নির্মাণ ও বাণিজ্য করার জন্য অনুমতি পেলো। নামমাত্র মূল্যে রাজা পর্তুগিজদের কাছে মালপত্র বিক্রি করতে বাধ্য থাকবেন। আর চুক্তি অনুযায়ী এইসব মালপত্রের মূল্য নির্ধারণ করবেন পর্তুগিজ থেকে ক্রয় করতে আসা বণিকরাই![৯৬]

ভারতের মাটিতে জনগণ ইউরোপীয় প্রকৃতির, নতুন ধাঁচের বর্বরতা দেখলো এখানে। কালিকট বন্দরে চাল ও ধান ভর্তি ভারতীয় ও আরব বণিকদের জাহাজগুলো দখল করে নিলো আর নাবিক বা বণিকদের ধরে ধরে তাদের হাত-পা, কান-নাক কেটে নৃশংসতার সাথে হত্যা করে আনন্দে ফেটে পড়লো!

বর্বরতা আর নৃশংসতার নতুন উপখ্যানের সাথে পরিচিত হতে তখনও বাকি ভারতবাসীর। তবে তার আগে ততদিনে পর্তুগিজরা ১৫০৩ খ্রিষ্টাব্দে কোচিন, ১৫০৫ কান্নালৌর, ১৫১০ খ্রিষ্টাব্দে গোয়া এবং পরের বৎসর ১৫১১ খ্রিষ্টাব্দে মালাক্কা প্রণালী দখল করে নিয়ে দূরপ্রাচ্যের ইন্দোনেশিয়া থেকে আফ্রিকার মোজাম্বিক পর্যন্ত এক বিশাল নৌরুটের উপরে নিজেদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। আর এই সাম্রাজ্যের রাজধানী বা কেন্দ্রস্থল হলো 'গোল্ডেন গোয়া'। ভাস্কো ডা গামা বা আলপানসো আল বুকার্ক এবং তাদের সাথে আগত বণিকরা, দু-একটা ব্যতিক্রম ছাড়া এদের সকলেই ছিল অর্থলোভী তস্কর। ধর্ম-কর্ম নিয়ে এদের অতটা মাথা ব্যথা ছিল না, যতটা তাদের নজর ছিল অর্থ, সম্পদ আর বিত্তের প্রতি। কিন্তু এদেরকে যারা পাঠিয়েছে পূর্ব দিকে; ভারত পানে, তাদের অর্থাৎ সেই রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রানী ইসাবেলা, বিশেষ করে, রানী ইসাবেলার দৃষ্টি অর্থ ও সম্পদের চেয়েও বেশি ছিল বিশ্বব্যাপী খ্রিষ্টের বাণী ছড়িয়ে দেয়ার দিকে। জোর করে হলেও বিশ্ববাসীকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করে যাওয়ার দিকে।

এ কারণেই ১৫০৪ সালে পর্তুগিজ নাবিকরা যখন ভারতের দক্ষিণ উপকূলে স্থানীয় রাজা-রাজড়াদের সাথে দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত, ঠিক তখন রানী ইসাবেলা মৃত্যুশয্যায় শায়িতাবস্থায় তার স্বামী রাজা ফার্ডিন্যান্ডকে নিজের অন্তিম ইচ্ছা জানাচ্ছেন; 'আমার মৃত্যুর পরে যেন আমার স্বামী রাজা ফার্ডিন্যান্ড তার বাকি জীবন এবং এই রাজ্যের সমস্ত শক্তি ও সম্পদকে খ্রিষ্টের বাণী

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার কাজে ব্যয় করেন।'[৯৭]

রানী ইসাবেলার এই যে মাত্রাতিরিক্ত মিশনারি জযবা, তা আগাগোড়াই তার মনে কাজ করেছে। সারাটা জীবন তিনি খ্রিষ্টবাণী ছড়িয়ে দেয়ার প্রচণ্ড এই ইচ্ছা ও সংকল্প, আবেগ আর উদ্দীপনা নিয়ে বেঁচেছিলেন, একটা দিনের জন্যও তিনি তার সংকল্প ভুলে যাননি।

এমনকি, Carvera তে ১৪৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই মার্চ রবিবার বিশেষ প্রার্থনার মাধ্যমে সমাধা করা বিয়ের সময়ও এই নারী স্বামী বেছে নেয়ার এবং বিয়েতে সম্মতি দেবার ক্ষেত্রে যে ক'টা শর্ত উত্থাপন করেছিলেন তার মধ্যে এটাকেও শর্ত হিসেবে উত্থাপন করেছিলেন যে, তার স্বামী বিয়ের পরে কেবল যে, ইসাবেলার সাথে Castile এ বসবাসই করবেন, তাই নয়, তিনি আজীবনই ইসাবেলার ইচ্ছা পূরণে কাজ করে যাবেন।[৯৮]

আজ মৃত্যুর সময় এই অন্তিম মুহূর্তেও রানী ইসাবেলা তার সেই আবেগ থেকে এক বিন্দু পরিমাণও টলে যাননি। আর এ কারণেই লিসবন উপকূল হতে ভারত অভিমুখে ছেড়ে আসা প্রতিটি পর্তুগিজ জাহাজে দুই চারজন পাদ্রিও চড়িয়ে দিতেন যেন যেখানেই তাদের জাহাজ থামুক না কেন, এইসব পাদ্রিরা যেন স্থানীয় অখ্রিষ্ট অধিবাসীদেরকে খ্রিষ্টের বাণী শোনাতে বা শেখাতে পারে।

এটাই তার জীবনের একমাত্র মিশন ছিল, সে বাস্তবতারই প্রমাণ তিনি দিয়ে গেলেন তার শেষ অসিয়তে! তার সেই অসিয়ত পূরণেই ভারতের মাটিতে এক হাতে বাইবেল আর অন্য হাতে বন্দুক নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন ভাস্কো ডা গামা আর আলফান্সো আল বুকার্কের দল ।

বাইশ

খ্রিষ্টবাদ প্রচারের এই উদ্দীপনার যে রূপটা মাত্র তিন বা চারটি দশক আগে খোদ স্পেনের মাটিতে প্রতিভাত হয়েছিল, যে কদর্য নৃশংসতা আমরা দেখেছি মুসলিম নিধনের ক্ষেত্রে, ঠিক সেই একই চেহারা ভারতের মাটিতে প্রকাশ পাবে বণিক হিসেবে বাণিজ্য (!) করতে আগত এইসব পর্তুগিজদের আচারে, আচরণে। তাদের এ ধর্মপ্রচারের মধ্যে ক্ষমা, মহত্ত্ব, সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব বা মনুষ্যত্বের কোনো লেশমাত্র দেখা যাবে না, বরং ভারতবাসীর সামনে তারা উপমা পেশ করবে এক জঘন্য নৃশংসতা আর বর্বরতার।

ইতিহাসের পাতা থেকে সে দৃশ্যগুলো জানতে আমাদের আরও একটু খতিয়ে দেখতে হবে। দেখতে হবে ভারতের মাটিতে মুসলিম বিরোধিতার বীজ কিভাবে প্রোথিত হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে কোন কোন ভারতীয় হিন্দু রাজন্যবর্গের ভূমিকা কি ছিল, সে বিষয়টাও।

কারণ, এইসব আচরণের ধারাবাহিকতার রেশ ধরেই ভারতের মাটিতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা ও সংঘাত একরকম স্থায়ী একটা ধারা তৈরি করে নেবে। অথচ এই দু'টি সম্প্রদায় হাজার বৎসর ধরে এই জনপদে সহাবস্থান করে আসছে উল্লেখযোগ্য কোন সমস্যা ব্যতিরেকেই।

হাজার বৎসরের সেই ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে উপলব্ধি করা, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃশ্যমান তিক্ততা এবং বৈরিতার কারণ বিশ্লেষণ করার মত গভীর দৃষ্টি আকবরের ছিল না। এ সমস্যা ও সংঘাতের প্রেক্ষাপট, ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা উপলব্ধি করার মত পর্যাপ্ত সময়, সুযোগ ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা আকবরের না থাকলেও তিনি এই দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে বিচলিত হবেন, বা তাকে বিচলিত করা হবে তার নিজ রাজ্যের স্থিতিশীলতা ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার প্রয়োজন দেখিয়ে।

ফলে আকবরের সমসাময়িক ভারতীয় সমাজ তার মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, আর তিনিও এই দুই সম্প্রদায়ের মহামিলনের জন্য উদ্যোগ নেবেন, এক ও অভিন্ন ধর্ম সৃষ্টির মাধ্যমে। আর এর মাধ্যমে তিনি প্রথম যে কাজটি করবেন, তা হলো, মুসলিম ও ইসলাম বিরোধিতার সকল মাত্রা ছাড়িয়ে যাবেন ইচ্ছা বা অনিচ্ছায়।

যা হোক, আমরা আপাতত ফিরে আসি ভাস্কো ডা গামাসহ দক্ষিণ ভারতে পর্তুগিজ নাবিকদের আচরণের দিকে। মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের বন্দরসমূহকে ঘিরে হাজার বৎসরের ধারাবাহিকতায় গড়ে ওঠা মুসলিম নৌ বাণিজ্য নেটওয়ার্কের প্রতি হঠাৎ করেই আসা এই আঘাতকে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার মত কোন ইসলামি শক্তি তখন টিকে নেই।

নৌবাণিজ্য পূর্ব বা পশ্চিমে সকল নৌরুটেই প্রায় একচ্ছত্র কর্তৃত্ব অর্জন করেছিল কারো মনেই কোনো আতঙ্ক বা দুশ্চিন্তার উদ্রেক না করে। কিন্তু আধুনিক নেভিগেশন যন্ত্র আবিষ্কার (দিকনির্ণয় যন্ত্র আবিষ্কার এর মধ্যে অন্যতম-লেখক) এবং জাহাজে কামান সংযোজনের কারণে ষষ্টদশ শতাব্দীর শুরুতেই নৌবাণিজ্যের এই সুযোগ প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়লো। হঠাৎ করেই নৌবাণিজ্যের এই সুযোগ রাষ্ট্র এবং সামরিক শক্তির ইচ্ছাধীন হয়ে পড়লো। নৌবাণিজ্য সুবিধা প্রদান বা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্থ আদায় করা যায়, সে বাস্তবতা প্রয়োগ করে পর্তুগিজরা বাস্তবিকই ভারত মহাসাগরকে রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত করে ফেললো। এর ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপরে নির্ভরশীল আশপাশে এমন প্রতিটি রাষ্ট্রকেই এদের (পর্তুগিজ) সাথে বোঝাপড়া (নিরাপদে নৌবাণিজ্য করার জন্য- লেখক) করতে হবে। (সূত্রঃ India: A History. John Keay, পৃঃ ৩০৫-৩০৬)

আমরা যারা ইতিহাসের এই দৃশ্যপট থেকে শিক্ষা নিতে চাই, তারা এখানে এটা ভেবে দেখতে পারি যে, বিশ্ব ইতিহাসের যে সময়কালে ভারতের উত্তর সীমান্ত দিয়ে সম্রাট আকবরের পূর্বপুরুষ, তার দাদা বাবর ও বাবা হুমায়ুন, মা হামিদা বানু মধ্য এশিয়ার সমরখন্দ থেকে, পারস্যের ইরান থেকে আর ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্ত কাবুল থেকে ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতি, শিয়া ও সুন্নি মতাদর্শ, ইসলামি শাসন নিয়ে ভারতের মাটিতে পা রাখছেন, ঠিক সেই একই সময়কালে ঐ একই ভারতের দক্ষিণ সীমান্তে সেই সুদূর ইউরোপ থেকে আরও একটা বৈরী শক্তি, বৈরী মতাদর্শ খ্রিষ্টবাদও এসে নিজেদের উপস্থিতি সরবে জানান দিচ্ছে।

ভারতের বাইরে থেকে আগত পরস্পর বৈরী এই দুই গোষ্ঠীর দর্শন ও জীবনাচার, তাদের সমাজব্যবস্থা, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক লেনদেন, সামরিক, বৈষয়িক ও কূটনৈতিক আচার আচরণ, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এসব কেবলমাত্র আকবরসহ ভারতের রাজা বাদশাহদেরই প্রভাবিত করবে তাই নয়, প্রভাবিত করবে পুরো ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকেও। প্রতিটি ভারতবাসীর চিন্তা ও চেতনাকে, তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে, জীবন ও বিশ্ব সম্বন্ধে বোধ ও বিশ্বাসকেও নাড়িয়ে দেবে প্রবলভাবে।

নড়বড়ে হয়ে যাওয়া ও প্রচন্ডভাবে ঝাঁকুনি খাওয়া কলুষিত বা পরিবর্তিত, বিকৃত অথবা শানিত এই বোধ বিশ্বাস আর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই পরবর্তী ভারতীয় সমাজ বিচার করবে আকবরকে, শাহজাহানকে আওরঙ্গজেবসহ হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান প্রত্যেকেই একে অপরকে। এই দৃষ্টিভঙ্গির বিচারেই আকবর কারো কাছে হবেন ভিলেন, আবার কারো কাছে বা হিরো!

আমরা আগেই বলেছি, চেঙ্গিজ খান, হালাকু খান, তৈমুর লং এবং তারও আগে ক্রুসেডারদের উপর্যুপরি আক্রমণ ও মুসলিম দেশসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণে ততদিনে প্রায় প্রতিটি মুসলিম সাম্রাজ্যই ধ্বংস হয়ে গেছে, আর না হয় দুর্বল হয়ে পড়েছে। ওসমানীয় খেলাফতও তার ভেতর থেকেই দুর্বল হতে শুরু করেছে।

ফলে পর্তুগিজ বণিকরা ইচ্ছামত ভারতের মাটিতে তাদের দাবি-দাওয়া পেশ করতে থাকে। বিনাশুল্কে অথবা নামমাত্র শুল্কে ব্যবসা করার অধিকার দাবি করার পাশাপাশি তারা এতদঞ্চলে মুসলিম শক্তিকে ধ্বংস করতে উঠে পড়ে লাগে।

এই মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই দক্ষিণ ভারতের প্রতিটি সংঘাতে পর্তুগিজরা মুসলিম সৈন্য বা রাজা-বাদশাহ, এমনকি, সাধারণ মুসলমানদের প্রতিও আক্রোশে ও সীমাহীন বর্বরতা এবং নৃশংসতার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি যে, ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজ নাবিক Pedro Alvarez-এর নেতৃত্বে কালিকট বন্দরে মুসলিম বণিকদের ধরে নৃশংসভাবে হত্যা করার ঘটনায় হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে স্থানীয় ভারতীয় জনতা পর্তুগিজদের কচুকাটা করেছে।

এভাবেই এরপরে প্রায় প্রতিটি সংঘাতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়েছে। পর্তুগিজদের উন্নত নৌজাহাজ এবং সদ্য আবিষ্কৃত উন্নতমানের বন্দুক এবং সেই সাথে জাহাজে সংযোজনকৃত কামান ব্যবহারের সুবিধা প্রায় প্রতিটি যুদ্ধেই তাদের বাড়তি সুবিধা দিয়েছে। আর সেই সাথে অবশ্যই রয়েছে কোন কোন ভারতীয় হিন্দু রাজা কর্তৃক আগ্রাসী পর্তুগিজদের সহায়তা প্রদান।

অবশ্য সেই সব স্থানীয় হিন্দু রাজাগণ তাৎক্ষণিকভাবে নিজেদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্যও হাসিল অর্জন করতে পেরেছিল। উদাহরণস্বরূপ কোচিনের রাজার কথা বলা যেতে পারে। প্রথম থেকেই কোচিনের এই রাজা পার্শ্ববর্তী কালিকটের রাজা জামুরিনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করার জন্য পর্তুগিজদের সার্বিক সহায়তা দিয়ে আসছিলেন।

কালিকটের রাজা জামুরিন ও পুরো দক্ষিণ ভারত উপকূলজুড়ে আরব মুসলিম বণিকরা যৌথভাবে পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সময় নিজ দেশের প্রতিবেশী একজন হিন্দু রাজা কর্তৃক বাইরের আগ্রাসী শক্তিকে সহায়তা প্রদান করার ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় ভারতীয় সমাজ ভালোভাবে নেয়নি। ফলে তারা কালিকটের রাজা জামুরিন কোচিনের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন।

দক্ষিণ ভারতের প্রতিবেশী দুই রাজ্যের বিবদমান দু'টি বাহিনী ১৫০৩ খ্রিষ্টাব্দের ১লা মার্চ বুধবার এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সম্মুখীন হলে কোচিনের রাজা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান এবং পর্তুগিজদের কাছেই আশ্রয় নেন। তবে তার আগে তার তিন তিনটি রাজপুত্রকে যুদ্ধের মাঠে কালিকটের রাজা ও মুসলিম বণিকদের যৌথ বাহিনীর হাতে প্রাণ দিতে হয়।

দক্ষিণ ভারতে, একই ধর্মাবলম্বী দুই প্রতিবেশী রাজ্য, যারা এতদিন মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছিল, সেই তাদের মধ্যে বিদেশি বেনিয়া পর্তুগিজদের পক্ষ নেয়া বা না নেয়ার কারণে রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধই প্রমাণ করে যে ভারতের রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থা একটা পরিবর্তনের প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছে ততদিনে।

এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় আরও নতুন কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি মাত্রা যোগ হবে ঐ বৎসরেরই সেপ্টেম্বরে। যখন পর্তুগিজ সেনাপতি আলফান্সো আলবুকার্ক তার পুরো বাহিনী নিয়ে কালিকটের রাজা জামুরিন ও মুসলিম বণিকদের যৌথশক্তি আক্রমণ করে কালিকটকে উপর্যুপুরি কামানের গোলার আঘাতে প্রায় ধ্বংস করে ছাড়বেন এবং মাত্র ছয় মাস আগে এই জামুরিন ও আরব মুসলিম বণিকদের সাথে যুদ্ধে নেমে নিজের তিন তিনটি সন্তান হারিয়ে পালিয়ে গিয়ে তাদের কাছে আশ্রয় নেয়া কোচিনের রাজাকে পুনরায় কোচিনে ফিরিয়ে এনে রাজা হিসেবে বসাবেন।

আর সেই সাথে পর্তুগিজরা কোচিনের রাজাকে সাহায্য করা, তথা তার হৃত রাজ্য ফিরে পেতে সাহায্য করার বিনিময়ে নিজেদের অনুকূলে চুক্তি করে নেবে, অবাধে বাণিজ্য করা ও নিজেদের কুঠি নির্মাণের অনুমতিসহ। তড়িঘড়ি করে পর্তুগিজরা ঐ একই বৎসর; ১৫০৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর, বুধবার কোচিনে তাদের নিজেদের দুর্গ বা কুঠির নির্মাণের জন্য কাজ শুরু করে দিবে। ভারতের মাটিতে প্রথম পর্তুগিজ বাণিজ্য কুঠি! ভারতবাসী এবং সেই সাথে পর্তুগিজদের সামনেও এক নতুন বাস্তবতার দ্বারোন্মোচন হয়ে গেল !

এ ঘটনা ভারতের স্থানীয় রাজা-রাজড়াদের সামনে এই বার্তা পরিষ্কার করে দিল যে, এ দেশের রাজা বাদশাহদের সিংহাসনের লোভ বা প্রলোভন দেখিয়ে বা তা হস্তগত কিংবা করায়ত্ত করতে সহায়তা প্রদানের বিনিময়ে নিজেদের স্বার্থ আদায় করে নেওয়া সম্ভব। এ দেশের রাজা বাদশাহ পরিবর্তনের ক্ষমতা ও সক্ষমতা এ দেশবাসীর হাতে নয়, বরং তা চলে গেছে বিদেশি বেনিয়াদের হাতে!

এই লজ্জাজনক বাস্তবতাটাকে খুব কাছে থেকে এবং খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করবেন ভারতে বেড়াতে আসা ইংলিশ পর্যটক ও দূত, ভবিষ্যৎ মোগল সম্রাট আকবরের বন্ধু ও সুহৃদ, রালফ ফিচ। আর তার এই উপলব্ধি ভারতের কপালে আর এক দীর্ঘমেয়াদি দুর্গতি ডেকে আনবে নিকট ভবিষ্যতে, সেটা আমরা অচিরেই দেখতে পাবো।

ইংলিশ পর্যটক রালফ ফিচ (Ralph Fitch) যে সময়কালে ভারতে এসেছিলেন সেটা ছিল ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ। আর্থসামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ইংল্যান্ড অত্যন্ত পশ্চাৎপদ, অনুন্নত একটি অঞ্চল। তদুপরি পর পর তিনবার প্লেগ মহামারীর ফলে (১৫৩৫, ১৫৪৩, ১৫৬৩) পুরো ইংল্যান্ডের অবস্থা শোচনীয় এবং অমানবিক পর্যায়ে চলে গেছে। পুরো এলাকা জুড়ে ভিক্ষুকের দল কেবলমাত্র একবেলা খাবারের জন্য, গোটাকয়েক আলু কিংবা এক টুকরো রুটির জন্য দ্বারে দ্বারে ধরনা দিয়ে বেড়াচ্ছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ঠাণ্ডার মধ্যে অভুক্ত লোকজন ক্ষুধা আর রোগে শোকে কাতর হয়ে মরে পড়ে থাকছে।

শতকরা নব্বই ভাগ জনগোষ্ঠী গ্রামে বাস করতো কারণ এক লন্ডন ছাড়া আর তেমন কোনো শহর ছিল না। কল কারখানা ছিল হাতেগোনা কয়েকটা মাত্র। গ্রামের লোকজন যে শহরে গিয়ে ভিড় করবে তারও কোনো জো ছিল না, কারণ ভূস্বামী ও ধনিক শ্রেণীর লোকজন শহরে প্রবেশের জন্য গ্রামের গরিব লোকজনের উপরে কর বসাতো। একবেলা পেটের খাবার জোগাড়ে যেসব লোকজনের সামর্থ্য নেই সেইসব লোকেরা কর দিয়ে শহরে যাবে সে ক্ষমতা তাদের কই?

ষোড়শ শতাব্দীর এমন একটা জনপদের পঁচিশ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা প্রায় পঁচাত্তর ভাগ থেকে আশি ভাগ লোকই দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করতো। পুরো জনপদ জুড়ে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ভূস্বামীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগে থাকতো অহরহ। পুরো ইংল্যান্ড জুড়ে প্রায় দশ হাজার পেশাদার খুনি চষে বেড়াতো পুরো ইংল্যান্ড। তাদের একমাত্র জীবিকাই ছিল টাকার বিনিময়ে খুন করে বেড়ানো। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে, অনাহারে, অপুষ্টিতে ভোগা ইংল্যান্ডের এই জনগোষ্ঠী নিত্যই ভুগতো প্লেগ, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, বসন্ত ও পেটের পীড়ায়। এদের গড় আয়ু ছিল মাত্র আটত্রিশ বৎসর! প্রসূতি ও শিশু মৃত্যুর হার ছিল আকাশচুম্বী।[৯৯]

এরকম একটা অবস্থায় রানী প্রথম এলিজাবেথ চোখে মুখে সর্ষেফুল দেখছিলেন। তিনি কোনো কূল কিনারাই পাচ্ছিলেন না। সহসাই অর্থনৈতিক

ও সামাজিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন করতে না পারলে তার নিজের সিংহাসনই যে হুমকির মুখে পড়বে গণ-অসন্তোষের কারণে সে বিষয়টা তিনি খুব ভালো করেই জানতেন। জানতেন কারণ তাঁর নিজ জন্মদাত্রী মমতাময়ী মা রানীকে ইংলিশ রাজনীতির কূটিল চক্রান্তে পড়ে নিজ পিতার রাজা হেনরীর বিরাগভাজন হয়ে শেষ পর্যন্ত শিরশ্ছেদের মাধ্যমে (১৫৩৬) নিজের প্রাণ দিয়ে সে কথা প্রমাণ করতে হয়েছে। সেই হতভাগিনী মা ও রানীর সন্তান হয়ে রানী প্রথম এলিজাবেথ এ বাস্তবতা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলেন। কিছু একটা করার জন্য তিনি মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন।

ঠিক এরকম একটা সময়ে এগিয়ে এলেন তারই এক উপদেষ্টা ইহুদি পণ্ডিত John Dee, বৃদ্ধ এ পণ্ডিত রানীকে পরামর্শ দিলেন এই পঁচিশ লক্ষ জনগোষ্ঠীকে খাওয়ানো, তাদের জীবনের প্রয়োজন মেটানোর মত পর্যাপ্ত রসদ ইংল্যান্ডে নেই, তাই রানীর উচিত হবে, তিনি যেন ইংল্যান্ডের বাইরে নজর দেন। তিনি যেন বিশ্বজুড়ে একটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন।

ইংলিশরা ঠিকমত দ'বেলা পেট পুরে খাবার পাচ্ছে না, এমন একটা সময়ে এই বৃদ্ধ ইহুদি পণ্ডিত বিশ্বজুড়ে ব্রিটিশ এম্পায়ার বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখালেন, তা দেখে ষোড়শ শতাব্দীর ইংল্যান্ড মুখ টিপে হেসেছে, নানা টিটকারী করতেও কেউ ভুল করেনি।

উপায়ান্তর না দেখে রানী প্রথম এলিজাবেথ বৃদ্ধ পণ্ডিতের পরামর্শমত লন্ডনের এক কুখ্যাত দাসব্যবসায়ী Francis Drake-এর নেতৃত্বে প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় একটা নৌবহর পাঠালেন। উদ্দেশ্য হলো, ব্যবসার নতুন কোনো উৎস বের করা।

সে সময় প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল এলাকায় স্পেন একচেটিয়াভাবে দাস ব্যবসা করে চলছিল। কোনো রকম পুঁজি বিনিয়োগ না করেই কেবল মাত্র আফ্রিকার মানুষগুলোকে ধরে ধরে জোর করে আটলান্টিকের ওপারে দাস শ্রমিক হিসেবে বিক্রি করে দেয়াটা অর্থ উপার্জনের এক সহজ পথ ছিল। সেই সহজ পথেই ভাগ বসানোর অভিপ্রায়ে Francis Drake কে রানী পাঠালেন। ইতিহাস সাক্ষী Francis Drake রানীকে নিরাশ করেননি, সে নিজে ও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবর্তী ইংরেজ দাস ব্যবসায়ীগণ আফ্রিকা মহাদেশের লক্ষ লক্ষ বনি-আদমের ঘর-সংসার-জীবন বরবাদ করে ইংল্যান্ডের টাঁকশাল ভরেছে।

একই সময়ে রানী আরও একজনকে আয় উপার্জনের নতুন উৎস সন্ধানে পাঠালেন, তিনি ছিলেন লন্ডনের এক ব্যবসায়ী Ralph Fitch। পর পর

কয়েকটা ব্যবসায় লোকসান গুনে Ralph ততদিনে পথে বসেছেন। ঠিক এরকম একটা সময়ে রানীর কাছ থেকে একটা জাহাজ, কিছু নাবিক, শ্রমিক আর রসদ পেয়ে তিনি সমুদ্রে তার জাহাজের পাল তোলেন, গন্তব্য, আপাতত পারস্য।

সেটা সেই ১৫৭৭ সালের কথা, দুই বৎসর পরে ১৫৭৯ সালে পারস্য হয়ে Ralph Fitch তার বহর নিয়ে পৌঁছে যান ভারতে। তখন ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলে একচেটিয়া বাণিজ্য করে চলেছিল পর্তুগিজ বাণিজ্য বহরগুলো। ধুরন্ধর Ralph নিজ যোগ্যতা বলে খুব শিগগিরই স্বয়ং মোগল সম্রাট আকবরের খাসমহলে ঠাঁই করে নিলেন।

সম্রাট আকবর তখন তার আটশত রক্ষিতার সান্নিধ্য উপভোগে ব্যস্ত। ভারতেশ্বর সম্রাটের এসব রক্ষিতাদের থাকার জন্য গড়ে উঠেছে আলাদা একটা শহর; ফতেহপুর সিক্রি! ভারতেশ্বর সম্রাটের মহা আয়োজনই বটে!!

নারীলিপ্সু সম্রাটের ভোগে নতুন এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করলেন চতুর Ralph Fitch ইংলিশ মদের মাধ্যমে। ইংলিশ মদের মদীর স্বাদে মহামতি আকবর সারাদিন বুঁদ হয়ে পড়ে থাকেন। পুরো রাজ দরবার জুড়ে ইংলিশ মদের কি সুনাম! সম্রাটের রসনা বাজিমাত করা এক পানীয়ের একটি ফোঁটা চেখে দেখার জন্য সভাসদ থেকে শুরু করে আকবরের সেনাপতি, এমনকি তার তিন সন্তান জাহাঙ্গির, মুরাদ আর দানিয়েলের মধ্যে সে কি প্রতিযোগিতা!

ভারতীয় সমাজে 'ঘুষ' নামক মহৌষধের সেই শুরু! সাত সমুদ্র পেরিয়ে ভাগ্যের সন্ধানে আসা Ralph Fitch মহামতি আকবরের পরমাত্মীয়, হরিহর আত্মা! সম্পদ, বিত্ত আর বৈভব এবং সে সাথে ইন্দ্রীয় সুখ উপভোগের এমন অবারিত সুযোগ আর আয়োজন দেখে Ralph Fitch-এর চোখ কপালে উঠার উপক্রম!

দুই বৎসর পরে দেশে ফিরে রানীর কাছে যখন স্বপ্নরাজ্য ভারতের গল্প বলছিলেন, ভারতের বাজারগুলোতে সারি সারি গরুর গাড়ি ভর্তি সোনা, মসলিন, রেশম, মসলা, সুগন্ধি আর কস্তুরির ছড়াছড়ি। কেবলমাত্র এক সম্রাট আকবরের জন্যই আগ্রা ও ফতেহপুর সিক্রিতে সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত (Standby) থাকে এক হাজার হাতি, তিরিশ হাজার সুঠামদেহী ঘোড়া, আর তার রয়েছে আট শত রক্ষিতা। হেরেম ভর্তি রয়েছে ময়ূর, হরিণ, দুর্লভ জাতের পাখি, আলিশান মহল, স্বর্ণমোড়া সিংহাসন![১০০]

রানী এলিজাবেথ Ralph এর মুখে ভারতে তার দেখা বিত্ত আর বৈভবের গল্প নয়, যেন রূপ কথার গল্প শুনছিলেন! যেন কল্পনায় স্বর্গ দেখছিলেন! রানীর প্রত্যক্ষ উৎসাহ ও ইন্ধনে তড়িঘড়ি করে গঠন করা হলো

Elizabeth's Levant Company আর অবশ্যই Ralph কে উক্ত কোম্পানির গভর্নর নিয়োগ করে আবার ভারতে পাঠালেন তিনি। এবারে সম্রাট আকবরের কাছে ইংল্যান্ডের রানী একটা চিঠি লিখে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন Ralph Fitch কে ভারতে ইংল্যান্ডের দূত হিসেবে গ্রহণ করেন। দুই বসর আগের সফরে সম্রাট আকবরের সাথে চতুর Ralph এর গড়ে ওঠা বন্ধুত্বের সূত্র ধরে সম্রাট আকবর বিনা বাক্য ব্যয়ে রানীর অনুরোধ রক্ষা করে তাকে ভারতের মাটিতে ইংল্যান্ডের দূত হিসেবে বরণ করে নিলেন।[১০১]
ইউরোপ থেকে আগত ইংরেজ দূত ভারতের মোগল দরবারে বসে বসে আর এক ইউরোপীয় শক্তি পর্তুগিজদের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করে নিজ দেশে সরকারের কাছে প্রতিবেদন পেশ করতে থাকবেন। আর তাদের সরকারও ভারতের মাটি থেকে পর্তুগিজদের সরিয়ে কিভাবে সেখানে নিজেদের কর্তৃত্ব ও প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা যায়, সে পরিকল্পনায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে এই সময় থেকেই।

এ দিকে এর পরের কয় বৎসর পুর্তগিজরা উপকূলীয় অঞ্চলে নিজেদের জন্য আরও কয়েকটি কুঠি নির্মাণ ও আরব বা তুর্কি মুসলিম বণিকদের প্রভাব খর্ব করতে সবরকম চেষ্টা প্রচেষ্টা করে গেল। এ পর্যায়ে এসে তাদের দৃষ্টিতে প্রাধান্য পেলো; যে কোন ভাবে এতদঞ্চল থেকে মুসলিম প্রভাব ধ্বংস করা। আলবুকার্কের নেতৃত্বে ১৫০৯ খ্রিষ্টাব্দে কালিকট আক্রমণ ও শহরটিকে ধ্বংস করার পরে পরাজিত জামুরিন রাজার সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে তার আরোপিত শর্ত ও যুদ্ধ পরবর্তী সময়কালে কর্মকাণ্ডের দিকে তাকালেই তাদের উদ্দেশ্য ও স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি পোষিত দৃষ্টিভঙ্গি টের পাওয়া যায়। উক্ত যুদ্ধের পরে পর্তুগিজরা বন্দী মুসলিম পুরুষ, যুবক ও শিশুদের ধরে ধরে আটলান্টিকের ওপারে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়।
আলবুকার্ক তার সৈন্যদের নির্দেশ দেন তারা যেন, মুসলিম নারীদের বিয়ে করে। পর্তুগিজ নাবিকরা মহোল্লাসে মুসলিম নারীদের জোর করেই বিয়ে করে এবং তাদের প্রত্যেককেই ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ক্যাথলিক খ্রিষ্টান হিসেবে ধর্মান্তরিত করা হয়। এরকম কয়েকটি বিয়ের অনুষ্ঠানে আলবুকার্ক নিজে উপস্থিত থেকেছেন।[১০২]
ভারতে নিজেদের শাসন ও প্রভাবকে দৃঢ় ও নিরুপদ্রব করতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে একটা শংকর প্রজন্ম উৎপাদনের অংশ হিসেবেই এ কাজটা তিনি করেছেন। তদুপরি ধর্মান্তরিত নব্য ভারতীয় খ্রিষ্টান ও স্থানীয় নারীদের গর্ভে জন্ম নেয়া পর্তুগিজ নাবিকদের সন্তানদের খ্রিষ্টবাদে শিক্ষা দেয়ার জন্য আলবুকার্ক তার প্রভাবাধীন কোচিন ও তার পার্শ্ববর্তী

এলাকাগুলোতে মিশনারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলোই হলো ভারতের মাটিতে প্রথম খ্রিষ্টান মিশনারি স্কুল।

এই সব মিশনারি স্কুল প্রতিষ্ঠা ও একটি মিশ্র, শঙ্কর প্রজন্ম জন্মানোর ফলাফল কি হয়েছে, তা দেখতে হলে আধুনিক ভারতের গোয়া, কোচিন, কালিকটসহ দক্ষিণ ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক, আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও পরিবেশকে গভীরভাবে বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে দেখতে হবে।

ভাস্কো ডা গামা বা আলবুকার্ক এর পরবর্তী দিনের ভারতের রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থার গতিধারা নির্দেশ, হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিষ্টানসহ বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের রূপরেখা প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠায় এই প্রজন্ম একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। এখনও এই বিংশ শতাব্দীতেও সে ধারা চলমান।

যা হোক, আলবুকার্ক ও তার পরে ভাস্কো ডা গামা তৃতীয়বারের মত ভারতে এসে পর্তুগিজ অধিকৃত অঞ্চলে কেবল যে মুসলমানদের উপরেই নির্যাতনের মাধ্যমে খ্রিষ্টবাদ চাপিয়ে দেবেন, তা নয় বরং তারা যে হিন্দুরা ভারতের এই অঞ্চল অধিকারে তাদের সহায়তা করেছে, সেই হিন্দুদের জীবনকেও অত্যাচার ও নির্যাতনের মাধ্যমে অতিষ্ঠ করে তুলবে।

এ ব্যাপারে একটা চমকপ্রদ ঘটনা রয়েছে ভাস্কো ডা গামার জীবনেই। কালিকটে ভাস্কো ডা গামাকে সাদরে ডেকে এনে আপ্যায়ন করে স্থানীয় কিছু ব্রাহ্মণ। এরই এক পর্যায়ে উক্ত ব্রাহ্মণগণ তাকে নিজেদের একটা মন্দির পরিদর্শনে নিয়ে যায়।

ভাস্কো দা গামা মন্দিরে গিয়ে নারী মূর্তি দেখে ভেবে বসেন, স্থানীয় হিন্দুরা বোধ হয় খ্রিষ্টবাদেরই কোন একটা গোষ্ঠী এবং উক্ত মূর্তি বোধ হয় যিশু মাতা মেরির মূর্তি। তাই তিনি ভক্তির সাথে উক্ত মূর্তির সামনে হাঁটু গেড়ে বসেন এবং বুকের দু দিকে ও কপালে খ্রিষ্টবাদের প্রথা অনুযায়ী ক্রস চিহ্ন টানেন হাত দিয়ে।[১০৩]

নিজের অনুসৃত ধর্ম খ্রিষ্টবাদ নিয়ে অতি উচ্চ ধারণা পোষণকারী একজন খ্রিষ্টানের জন্য এ ঘটনা অত্যন্ত বিব্রতকর ছিল। আর তার প্রতিফলন খুব শিগগিরই দেখা যাবে তার কাজকর্মে! হিন্দুদের ধর্মপালনেও তারা বাধা দেবে। লবণ ছাড়া ভাত রান্না করা, বাড়িতে তুলসী গাছ লাগানো, ধুতি পরা, শূকরের মাংস খেতে অস্বীকার করাটা অপরাধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করবে।[১০৪]

এমনকি, ভারতের মাটিতে স্পেনের মত ইনকুইজিশন কোর্ট চালু, তথা আগুনে পুড়িয়ে মারার অনুমতি চেয়ে পর্তুগিজ পাদ্রিরা তাদের ধর্মগুরু ও সরকারের কাছে আবেদনও জানাবে।

তেইশ

গোত্র গোষ্ঠী বিশেষে প্রতিশোধ গ্রহণ ও নৃশংসতার ধরনের মধ্যেও বিরাট তারতম্য দেখা গেল। পর্তুগিজরা ভারতীয় মুসলমান, বিশেষ করে, আরব ও তুর্কি মুসলমানদের বেলায় হয়ে উঠলো বর্বরতমভাবে হিংস্র।
উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে বালিয়া হাসানের কথা। কনৌরের রাজা ভাস্কো ডা গামার সাথে যুদ্ধে পরাস্ত হলে সন্ধির শর্ত হিসেবে ভাস্কো ডা গামা তার কাছে দাবি জানালেন; কনৌরের নৌবাহিনীর প্রধান, মুসলিম সেনাপতি বালিয়া হাসানকে পর্তুগিজদের হাতে তুলে দিতে হবে।
এই বালিয়া হাসান একজন দক্ষ মুসলিম নৌকমান্ডার ছিলেন। স্বয়ং ভাস্কো ডা গামা, আলফান্সো আলবুকার্ক এবং অপর পর্তুগিজ কমান্ডার লরেঞ্জো মরেনো (Lorenzo Moreno) এই বালিয়া হাসানের হাতে নাস্তানাবুদ হয়েছেন। বহু পর্তুগিজ নাবিকের প্রাণ ও জাহাজ তার কারণেই বিনষ্ট হয়েছে।
দক্ষিণ ভারতীয় উপকূলের বিভিন্ন বন্দরে পর্তুগিজ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে প্রায় প্রত্যেকটি পর্তুগিজ আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অভিযান পরিচালনা করেছেন। বালিয়া হাসানের উপরে প্রায় প্রতিটি পর্তুগিজ যোদ্ধার আক্রোশ ছিল সীমাহীন।
উপায়ান্তর না দেখে কনৌরের রাজা সে শর্তেই রাজি হলেন নিজের রাজ্যকে পর্তুগিজ সৈন্য কর্তৃক মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়ার হাত থেকে বাঁচাতে। আর ভাস্কো ডা গামার সহকারী 'হেনরিক ডি মেনেজিস' বালিয়া হাসানকে হাতের নাগালে পেয়েই এক পৈশাচিক উল্লাসে দুর্গের উপর থেকে নিচে ছুঁড়ে ফেলে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করেন।[১০৫]
ভারতের মাটিতে কোন কয়েদিকে এ ধরনের পৈশাচিকতার সাথে হত্যা করার প্রচলন ছিল না। পর্তুগিজরা এই যে নৃশংস প্রথার প্রচলন করলো, যে উদাহরণ পেশ করলো ভারতবাসীর সামনে, এর পরে অনেক ভারতীয় রাজা-বাদশাহই এ পদ্ধতির উপর আমল করবেন বড় উৎসাহের সাথেই! এমনকি, আমাদের মহান সম্রাট আকবরও এ থেকে পিছপা হবেন না, নিজের দুধ ভাই ও বন্ধু, শৈশবের খেলার সাথী আদম খাঁকেও তিনি এই একই কায়দায় হত্যা করবেন।
আর তার সন্তান, পরবর্তী মোগল সম্রাটগণ তো নৃশংসতার ভয়াবহতা বিচারে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে যাবেন। তারা কেবলমাত্র ক্ষমতার জন্যই বাইরের অনাত্মীয় ব্যক্তিবর্গ তো বটেই, এমনকি, নিজের ভাই ব্রাদার, রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজনকেও নৃশংস কায়দায় হত্যা করতে মোটেও

পিছপা হবে না। বলা চলে, সেটাই হবে ক্ষমতাপ্রাপ্তি বা সংহত করার পথে অন্যতম এক অনুসৃত, স্বীকৃত পন্থা। এ পন্থায় ঘটিত প্রতিটি হত্যাকাণ্ডই থাকবে বিচারের বাইরে এবং প্রতিটি ঘাতকই থাকবেন ধরাছোঁয়ার উর্ধ্বে!

এই একই সময়ে বর্বরতা, অমানবিক এবং নৃশংসতার অভিযোগ তুলে আলফান্সো আলবুকার্ক পর্তুগিজ নিয়ন্ত্রিত এলাকায় হিন্দু বিধবাদের মৃত স্বামীর চিতায় জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে সহমরণ প্রথা বন্ধ করে দেন।[১০৬]

বিষয়টা যদিও হিন্দুদের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ বলে বিবেচিত হতে পারে, তার পরেও এই একটা ভালো কাজ আলফান্সো করেছিলেন, সেটা স্বীকার করতেই হবে।

এর বিপরীতে আমাদের মহামতি আকবর কিন্তু হিন্দু সভাসদ, শত শত রানী ও হাজার হাজার রক্ষিতা পরিবেষ্টিত থেকেও, প্রজাহিতৈষী, মহৎপ্রাণ উপাধি নিয়েও এই বিশাল ভারতভূমিতে এই অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটা পর্যন্ত করেননি। তিনি ইচ্ছা করলেই তার দীর্ঘ আটচল্লিশ বৎসরের শাসনামলে হাজার হাজার হতভাগ্য নারীর জীবন বাঁচাতে পারতেন।

হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক ও পারস্পরিক আস্থার ক্ষেত্রে এ সময় এক মারাত্মক ধস নামে। যে দু'টি সম্প্রদায় শত শত বৎসর পাশাপাশি বন্ধুর মত বসবাস করে এসেছে, তাদের সেই সম্পর্ক ও সম্প্রীতিতে অবিশ্বাস এমনভাবে দানা বাঁধবে এই পর্তুগিজদের কারণে যে, তার প্রভাব থেকে ভারত নিকট ভবিষ্যতে বের হয়ে আসার পথ খুঁজে পাবে না।

বিষয়টার সূত্রপাত করবেন কালিকটের জামুরিন রাজা। যে জামুরিন রাজা দাক্ষিণাত্যে পর্তুগিজ আগমনের একেবারে শুরু থেকেই তাদের বিরোধিতা করে আসছেন এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন আশপাশের সকল মুসলমান বণিক ও যোদ্ধাদের নিয়ে, যার বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছে মুসলিম সেনাপতি কুঞ্জ আলি এবং কুট্টি আলি মারক্কার; সেই জামুরিন রাজাই মাত্র কয়েকটি দশকের মধ্যে এসে জানবাজি রেখে যুদ্ধরত এইসব মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে পর্তুগিজদের সাথে সন্ধি চুক্তি করবেন!

জামুরিন রাজার এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাৎক্ষণিকভাবে পুরো মুসলমান সম্প্রদায় এক চরম অবমাননাকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী আরব ও ভারত মহাসাগরের যাতায়াতকারী কালিকটের সকল আরব জাহাজ ও যাত্রীদেরকে পর্তুগিজদের সরবরাহ করা বিশেষ পাসপোর্ট ব্যবহার করতে হবে। এরকম পাসপোর্ট ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দ হতে চালু করা হয়।[১০৭]

সমুদ্রগামী প্রতিটি জাহাজ ও যাত্রীকে তার যাত্রার পূর্বেই পর্তুগিজদের বিশেষ অংকের অর্থ দিয়ে এই পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে হতো, তা না হলে যাত্রাপথে সকল কিছুই তারা লুট করে নিত, এমনকি, জীবনহানি কিংবা দাস হিসেবে আটলান্টিকের ওপারে চালান হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি তো ছিলই।

প্রসঙ্গত আরও একটা কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। ভাস্কো ডা গামা যখন ভারতের মাটিতে তার ও তার সরকারের প্রভাব প্রতিষ্ঠায় তৎপর ঠিক তখনই পর্তুগালের সরকার রোমের ভ্যাটিকানে পোপের কাছে দূত পাঠান উপহার সামগ্রীসহ।

স্পেনের মুসলিম শাসন ধ্বংসে ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলার সফলতা এবং স্পেনের মাটিতে খ্রিষ্টবাদকে একমাত্র স্বীকৃত ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারার ঘটনা এই দম্পতিকে এক অনন্য উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছে। তাদের মর্যাদা এবং প্রভাব কেবল পোপের কাছেই নয়, বরং বলা চলে, পুরো খ্রিষ্টবিশ্বেই একবাক্যে স্বীকৃত ও সমাদৃত। সেই তারাই পোপের কাছে দূত পাঠালেন।

পোপের জন উপহার হিসেবে প্রেরিত বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে অন্যতম একটা দর্শনীয় বস্তু, বস্তু ঠিক নয়, প্রাণী; ভারতীয় হাতি। ইতঃপূর্বে পোপ জীবনে কখনও হাতি দেখেননি, এই বিচিত্র ও প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রাণী সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছেন বটে।

পোপ হাতি দেখে তো অবাক! গল্পে রূপকথায় হাতির কথা শুনেছেন কিন্তু জীবনে দেখা হয়নি। এই প্রথম দেখলেন তিনি। কল্পকথার হাতি দেখে তিনি বিগলিত হয়ে পর্তুগিজ দূতকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি সম্মানিত দূতকে কিভাবে সম্মানিত করতে পারেন?

পর্তুগিজ দূত বেশি কিছু চাইলেন না। তার কেবল একটা মাত্র আবদার; মহামান্য পোপ যদি দয়া করে ঘোষণা দেন এই মর্মে যে, 'আটলান্টিকের ওপারে দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলে পর্তুগিজ বণিকদের ব্যবসার অধিকার আছে' তা হলেই তারা কৃতজ্ঞ থাকবে।

বিস্ময়কর প্রাণী হাতি উপহার পেয়ে, জীবনে প্রথমবারের মত হাতি দেখে আমোদিত ও উৎফুল্ল পোপ বিনাদ্বিধায় সে ঘোষণা দিলেন।[১০৮]

পর্তুগিজরা অনুমতি পেলো। আর আজও ব্রাজিল ও তৎসংলগ্ন উপকূলীয় অঞ্চল যে কেবল খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী, তাই নয়, তারা সেই সাথে পর্তুগিজভাষীয়ও বটে!

পোপের কাছ থেকে আটলান্টিকের ওপারে আমেরিকার মাটিতে ব্যবসার অনুমতি পেয়ে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো পর্তুগিজ সরকার, ভাস্কো ডা

গামা এবং তার দলবলও। এর পর থেকেই কেবল সেই স্পেনের মাটি থেকেই নয়, বরং এই ভারতভূমি থেকেও পরাজিত মুসলিম পুরুষদের ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে দাস হিসেবে ওপারে বিক্রি করে দেয়ার মাধ্যমে অঢেল অর্থ কামানোর সুযোগ সৃষ্টি হলো!

ভাস্কো ডা গামা ভারতে এসে তার প্রথম ট্রিপ শেষ করে ফেরত যাওয়ার মাত্র বৎসর চারেকের মধ্যেই ইউরোপের বাজারে, ইতালির ভ্যালেন্সিয়াতে দাস হিসেবে ভারতীয়দের বিক্রি করা হয়। ১৫১৫-১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজ বণিকদের দ্বারা উক্ত শহরে কয়েকজন ভারতীয় দাস বিক্রির এরকম একটা ঘটনার কথা প্রখ্যাত গবেষক ও লেখক Hugh Thomas তার বিখ্যাত 'The Slave Trade, The History of the Atlantic Slave Trade 1440-1870' নামক গবেষণাগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১০৯]

দুঃখবোধের আরও একটা কারণ পরবর্তীতে যোগ হবে, সেটা হলো, মালাবার উপকূলের হিন্দু রাজাগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত ও পরাজিত মুসলমানগণ, যাদের ধরে ধরে পর্তুগিজরা হত্যা করছে বা দাস হিসেবে বিক্রি করে দিচ্ছে, সেই পর্তুগিজ বণিকদের সাথে দাস ব্যবসায় যোগ দেবে হিন্দু ব্রাহ্মণগণও! The agents were often Hindus (Banyans) from Portuguese port of Gujerat - - -.[১১০]

এ যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা! এই ব্রাহ্মণ হিন্দুরাই এতদিন এইসব আরব ও তুর্কি মুসলমান ও তাদের স্থানীয় প্রজন্ম মুসলমানদের সাথে প্রতিবেশী হিসেবে, একই সমাজে শান্তিতে বসবাস করে এসেছে!

স্থানীয় হিন্দু ব্রাহ্মণদের পাশাপাশি ততদিনে ভারতের মাটিতে হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত বা ভারতীয় নারীর গর্ভে জন্ম নেয়া পর্তুগিজ বণিকদের ভারতীয় খ্রিষ্টান সন্তানরাও এই ঘৃণ্য ব্যবসায় নেমে আসে। তারই প্রমাণ আমরা পাই উক্ত গবেষকের দেয়া তথ্য থেকে; One of the biggest traders was a Christian from Goa who lived in Rio।[১১১]

আজ বিদেশি আগ্রাসনের মুখে হিন্দু মুসলমান সকলে মিলে যখন যৌথভাবে প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করেছে, ঠিক তখন স্বদেশি কিন্তু ভিন্নধর্মী একটা গোষ্ঠী কর্তৃক এ ধরনের অপ্রত্যাশিত, অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ সত্যিই বড় বেদনাদায়ক।

ভারতীয় সমাজে হিন্দু মুসলিম পারস্পরিক আস্থা ও সম্প্রীতির ক্ষেত্রে এ ঘটনা যে এর পর থেকে বড় ধরনের নেতিবাচক ভূমিকা রাখবে তা আমরা পরবর্তী ভারতীয় রাজনীতিতে বার বার লক্ষ্য করবো, এমনকি, পর্তুগিজদের পরবর্তী সময়ে ইংরেজরা যখন এ ভূ-খণ্ডে এসে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা

করার চেষ্টা করবে, সেই তখনও কিছু ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান নিজ দেশ ও সমাজের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তাদের দখলদার শক্তিকে সার্বিকভাবে সহায়তা করে যাবে।

কোন ইউরোপীয় দখলদার শক্তি কর্তৃক সাফল্যজনক ভাবে ভারতের একটি গোষ্ঠীকে অপর কোন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে কার্যসিদ্ধির ধারাও এখান থেকেই শুরু।

যা হোক, এইসব পর্তুগিজ পাসপোর্টে 'ঈশ্বরপুত্র' যিশুখ্রিষ্টের ছবি অংকিত থাকতো। ভারত থেকে প্রতি বৎসর হজে যাতায়াতকারী হাজার হাজার মুসলমানের জন্য এ ছিল চরম এক বিব্রতকর অবস্থা, কারণ, মুসলমানরা যিশু তথা হযরত ঈসা (আঃ) কে ঈশ্বরপুত্র হিসেবে স্বীকারই করে না।

পর্তুগিজদের সাথে স্থানীয় ভারতবাসীর এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের ক্রমধারায় এক সময় (১৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে) বিজাপুরের মুসলিম সুলতান আদিল শাহ এবং আহমেদ নগরের নিজাম শাহও জড়িয়ে যাবে। কিন্তু এরই মধ্যে আবার পর্তুগিজদের পতন প্রক্রিয়াটাও ত্বরান্বিত হতে শুরু করেছে।

মাত্র কয়েক বৎসর আগে পর্তুগিজরা কালিকটের জামুরিন রাজার সাথে মৈত্রী চুক্তি করেছে এবং জামুরিন রাজাও মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে পর্তুগিজদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন, কালিকটে তাদের বাণিজ্য কুঠি বানাতে অনুমতি দিয়েছেন এবং সেখানে চার্চ তৈরির জন্য জমিও প্রদান করেছেন, কেবল তাই নয়, সেই চার্চের ভিত্তি প্রস্তুরও স্থাপন করে দিয়েছেন নিজ হাতে, সেই জামুরিন রাজার সাথেও পর্তুগিজরা সুযোগ বুঝে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

ফলে ১৫৬৪ সাল নাগাদ এসে জামুরিন রাজা বিজাপুরের সুলতান আদিল খান এবং আহমেদ নগরের শাসক নিজাম শাহ-এর সাথে মিলে পর্তুগিজদের দুর্গ শালিয়াম (Chalyam) আক্রমণ করে তা মাটির সাথে মিশিয়ে দেন। দক্ষিণ ভারতীয় ঐতিহাসিক শ্রীধারা মেননের মতে, এ ঘটনাই হলো ভারতের মাটিতে পর্তুগিজদের পতনের শুরু।[১১২]

চব্বিশ

পর্তুগিজদের এই পতনের প্রক্রিয়াটা নিয়ে আমাদের এই আলোচনায় বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই। তবে এর কারণটা নিয়ে দুই কথা বলতেই হবে, কারণ, তা হলো ভারতীয় সমাজের মৌলিক চরিত্রের সাথে সম্পর্কিত। আমরা সেটা নিয়ে একটু পরেই দুই কথা আলোচনা করবো।

তবে তার আগে এ পর্যায়ে ঠিক এ সময়টাতে, তথা পর্তুগিজদের পতন প্রক্রিয়ার সূত্র ধরে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করতেই হয়। কারণ ঘটনাটি ভারতের মাটিতে যে কেবল হিন্দু মুসলমান দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনাকর পরিস্থিতির বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তাই নয়, বরং এ ঘটনার মাধ্যমে এই প্রথমবারের মত পর্তুগিজরা মূল ভারতের মুসলিম সালতানাতের (দক্ষিণ ভারতের বিজাপুর ও বিজয়নগর সালতানাত) সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়লো।

সময়ের ব্যবধানে এই সংঘাতের সূত্র ধরেই এ দ্বন্দ্বের একটা পক্ষ হয়ে উঠবে এ দেশে নতুন আগত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা ইংরেজ বণিকরা। কারণ, ততদিনে পর্তুগিজরা ভারতের মাটিতে প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজদের হাতে মার খেয়ে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যেতে বাধ্য হবে।

বিজাপুর সালতানাত থেকে কেড়ে নেয়া ছোট্ট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ উপকূলীয় এলাকা গোয়া তখন ভারতের মাটিতে পর্তুগিজদের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ পর্তুগিজরা গুজরাটের কাছে ছোট্ট কিন্তু ভৌগোলিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'কাম্বে' (Camba) দখল করে নিলে ভারতের পশ্চিম উপকূলে তাদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা একরকম পূর্ণতা পায় বলা চলে।

নৌ পথে এ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হলে পর্তুগিজরা হিন্দু-মুসলিম, আরব-অনারব, ভারতীয় বা ভিনদেশি প্রত্যেকের ব্যবসা বাণিজ্যের উপরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ আরোপ ও তাদের থেকে কর আদায় করার পথ ধরলো। এতদিন বিজয়নগরের যে হিন্দু রাজারা তাদের সহযোগিতা করে এসেছে, সেই তারাও বাদ পড়লো না। এর ফলে বিজয়নগরের শক্তিশালী বাণিজ্যধারা লোপ পেয়ে তারা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়লে আর কোন উপায়ান্তর না দেখে শেষ পর্যন্ত তারাও রাজা কৃষ্ণদেব ও তার বংশধররা তাদের এতদিনের মিত্র পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে বাধ্য হলো।

কিন্তু কৃষ্ণদেব ও রামা রাজার (জামাতা ও শ্বশুর) মধ্যে উত্তরাধিকার মনোনয়ন নিয়ে দ্বন্দ্বের কারণে সে যুদ্ধে তারা সফল হতে পারেন নি।

নিজেরা পর্তুগিজদের উচিত শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হলেও রামা রাজা শেষ পর্যন্ত বিজাপুরের মুসলিম সুলতানের বিরুদ্ধে মাঠে নামলেন।
বিগত কুড়ি বৎসর এই রামা রাজা পর্তুগিজদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আরব ও মুসলিম বণিকদের বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক ধ্বংস করেছেন। কেবল তাই নয়, তিনি মুসলিম নারী, পুরুষদের নৃশংসতার সাথে অত্যাচার করেছেন। ইসলাম ধর্ম নিয়েও তার বিভিন্ন আপত্তিকর মন্তব্য, কর্মকাণ্ড রয়েছে বলে জানা যায়।
গত দুই দশক ধরে পর্তুগিজেদের সাথে মিলে মিশে এই রাজা মুসলিম সমাজ ও তাদের জানমাল সম্পদ ধ্বংস করে এসেছেন। নিজ দেশবাসীর সাথে কেবলমাত্র ধর্মবিশ্বাসে ভিন্নতার কারণে তার এই বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণকে রোধ করা যায়নি কারণ তিনি পর্তুগিজ সহায়তায় অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। আর আজ সেই রাজাই পর্তুগিজ শক্তির প্রতিপক্ষ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে তাদেরও আস্থা হারিয়েছেন।
পুরো পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বিজাপুর, গোলকুন্ডাসহ আশপাশের ছোটখাটো মোট চারজন মুসলিম সুলতানরা নিজেদের মতপার্থক্য ভুলে রামা রাজার আক্রমণ প্রতিরোধে একাট্টা হলেন। ১৫৬৫ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তারা যৌথবাহিনী নিয়ে রাজধানীর একশত কুঁড়ি কিলোমিটার উত্তরে 'টালিকোটা' (Talikota) নামক স্থানে রামা রাজার নেতৃত্বে বিজয়নগর বাহিনীর মুখোমুখি হলো। যুদ্ধে বিজয়নগর বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় হলো আর সেই সাথে রামা রাজা মুসলিম বাহিনীর হাতে ধরা পড়লেন। তাকে শিরচ্ছেদে হত্যা করা হলো। এভাবে দক্ষিণ উপকূলের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য বিজয়নগরের পতন হলো।
সময়কালটা বিবেচনায় নেয়াটা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এটা ছিল ১৫৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা। ঠিক এ সময়েই, ১৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে সুফি সাধক শেখ সেলিম চিস্তি যে ছোট্ট গ্রামটিতে বাস করতেন, সেই সিক্রিতে মোগল সম্রাট আকবর একটি শহরের গোড়াপত্তন করলেন, নাম দিলেন 'ফতেহপুর'। ফার্সি ভাষার এই শব্দটির মানে হলো; 'বিজয়নগর'। আধুনিক ভারতের বিখ্যাত শহর; আজকের ফতেহপুর সিক্রি ।
কি বিস্ময়কর মিল দেখুন, হিন্দু রাজার রাজ্য; সংস্কৃত ভাষার 'বিজয়নগর' যখন ধ্বংস হচ্ছে, ঠিক তখনই এই একই ভারতের অন্যত্র, ফার্সি নামধারণ করে 'ফতেহপুর' (এই শব্দটিরও মানে হলো 'বিজয়নগর') প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে মোগল মুসলিম সম্রাট আকবরের হাত ধরে, আর এক বিজয়নগর। মোগল মুসলমান সম্রাটদের 'বিজয়নগর'! তাদের, বোধ বিশ্বাস, তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির পরিচয়কে ধারণ করে আর এক 'বিজয়নগর' বা 'ফতেহপুর'!

ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ কখনও কখনও এতটাই কাকতালীয় হয়ে ওঠে যে, তা কল্পনাকেও হার মানায়। সে বিস্ময়কে অনুধাবন করতে হলে ইতিহাসের একজন সচেতন পাঠক বা ঐতিহাসিকের সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকাটাও বাঞ্ছনীয় বটে!

এবারে আমরা আমাদের দৃষ্টি ফেরাবো ভারতের মাটিতে পর্তুগিজরা কেন ব্যর্থ হলো সেদিকে। এটা আমাদের জানা দরকার, কারণ পর্তুগিজরা যেখানে বিফল হলো ঠিক সেখান থেকেই আর এক ইউরোপিয়ান শক্তি; ইংল্যান্ড শুরু করবে তাদের মিশন। ভারত দখলের মিশন। আর ইংরেজদের ভারত দখলের মিশনের ক্ষেত্রে তাদের প্রতিরোধে ভারত বা ভারতীয় সমাজ যে ব্যর্থ হবে, সেই ব্যর্থতার ভিতটাও রচনা করে দেবেন মোগল সম্রাট আকবর, তার কর্মকান্ডের মাধ্যমে, তার অনুসৃত নীতির মাধ্যমে, নিজের অজান্তেই।

ভারতীয় সভ্যতার একটা বিশেষ দিক রয়েছে তার চরিত্রের ভেতরেই। এর সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা হলো; এর আভ্যন্তরীণ এই শক্তি। সে বাইরের যে কোনো আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করে। এটা যে কোন সমাজের জন্যই এক বাস্তবতা। আক্রান্ত হলে প্রত্যেকেই তা করে। ভারতও তা করে। কিন্তু সে যদি পরাজিত হয়, তা হলে বিজিত শক্তিকে একটা সময় সে তার নিজের ভেতর থেকেই হজম করে নেয়। বিজিত শক্তি ভারতের মাটিতে নিজেদের স্বকীয়তা ধরে রাখতে পারে না। তারা ভারতের সমাজেই লীন হয়ে একসময় 'ভারতীয়' হয়ে যায়!

এ বিষয়টাই খুব চমৎকার করে বলেছেন পণ্ডিত নেহেরু। তার নিজের ভাষায় দেখুন;

Always she has resisted them, often successfully, sometimes unsuccessfully, and even when she failed for the time being, she has remembered and prepared herself for the next attempt. Her method has been two-fold: to fight them and drive them out, and to absorb those who could not be driven away.

ভাবানুবাদ: সে (ভারত) সব সময়ই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, কখনও সফল হয়েছে, আবার কখনও হয়েছে ব্যর্থ। এমনকি, যখন সে সাময়িক সময়ের জন্য ব্যর্থ হয়েছে, তখনও তার ব্যর্থতাকে সে স্মরণে রেখেছে, সুযোগের অপেক্ষায় থেকেছে পরবর্তীতে মোক্ষম সুযোগের জন্য এবং নিজেদের সেভাবেই তৈরি করেছে। তার কৌশল হলো দুই ধরনের; লড়াই করে আগ্রাসী শক্তিকে তাড়িয়ে দেয়া, আর যাদের পরাজিত করা ও তাড়িয়ে দেয়া সম্ভব হবে না, তাদেরকে ভেতর থেকেই হজম করে ফেলা।[১১৩]

অতি সাম্প্রতিক কালের এক পশ্চিমা ইংরেজ ঐতিহাসিকও ঠিক এ কথাটাই তার নিজের ভাষায় বলেছেন, এভাবে;

India has always had a strange way with her conqurers. In defeat, she beckons them in, then slowly seduces, assimilates and transforms them. Over the centuries many powers have defeated Indian Armies, but none has ever proved immune to thgis capacity of the subcontinent to somehow reverse the current of colonisation, and to mould those who attempt to subjugate her.

ভাবানুবাদঃ বিজয়ীদের মোকাবেলার ক্ষেত্রে ভারতের একটা বিশেষ কৌশল রয়েছে। পরাজিত হয়ে সে তাদের প্ররোচিত করে, ধীরে ধীরে প্রলুব্ধ এবং পরিশেষে হজম করে ফেলে।

শতশত বৎসরের পরিক্রমায় অনেক বহিঃশক্তিই কর্তৃক ভারত আক্রান্ত ও পরাজিত হয়েছে, কিন্তু তাদের কেউই এখানে তাদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এসে তার (ভারতের) ঐ কৌশলকে এড়িয়ে, ভারতীয় সংস্কৃতির ছাঁচে পরিবর্তিত হয়ে নিজেদের বিলীন হওয়াটাকে রোধ করতে পারেনি।[১১৪]

আলফান্সো আল বুকার্ক, ভাস্কো ডা গামাসহ অন্যান্য পর্তুগিজ নেতারা তাদের পর্তুগিজ বণিক ও সৈন্যদের উৎসাহ দিতেন, নির্দেশ দিতেন তারা যেন পরাজিত, নিহত ও বন্দী অথবা দূরের কোন দেশে দাস হিসেবে চালান করে দেয়া স্থানীয় ভারতীয়দের স্ত্রী কন্যাদের বিয়ে করে। সে কথা আমরা ইতোমধ্যেই বলেছি। উদ্দেশ্য ছিল; তাদের গর্ভে জন্ম নেয়া সন্তানরা পর্তুগিজ পিতা ও পিতার দেশ এবং সমাজের স্বার্থ রক্ষা করবে।

এভাবে তারা বাস্তবিকই ভারতের মাটিতে একটা পর্তুগিজ প্রজন্ম তৈরি করতে সমর্থ হলো। কিন্তু সমস্যা হলো; শংকর প্রজাতির নতুন এই প্রজন্ম মনে-প্রাণে, বোধে-বিশ্বাসে ভারতীয়ই থেকে গেল। পর্তুগিজ হয়ে উঠলো না। এক ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে বলেছেন;

Indo-Portuguese society was neither purely Portuguese nor wholly Indian, but a hybrid mixture of the two: a European template adapted to the climate and social mores of India.

ভাবানুবাদ : ইন্দো-পর্তুগিজ সমাজ না ছিল পুরোপুরি পর্তুগিজ, আর না তা ছিল প্রকৃত অর্থে ভারতীয়, বরং এ দুয়ের সংমিশ্রণে গজিয়ে ওঠা ভারতীয় পরিবেশ ও সংস্কৃতির মধ্যে ইউরোপীয় ছাঁচ![১১৫]

ভারতীয় নারীদের গর্ভে পর্তুগিজ সন্তান ও স্থানীয় ভারতীয় খ্রিষ্টান, যাদের মধ্যে বেশিরভাগ লোককেই অস্ত্রের মুখে জোর করে খ্রিষ্টানধর্মে দীক্ষা দেয়া

হয়েছে, তারা খ্রিষ্টান বলে পরিচিত হলেও তাদের জীবনাচার, চাল-চলন ও প্রাত্যহিক আচার-আচরণ ছিল খ্রিষ্টধর্মের পরিপন্থী, বা তার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। এ অবস্থা দেখে পর্তুগিজ পাদ্রিরা ক্ষিপ্ত হয়ে ভারতের মাটিতেও ইনকুইজিশন কোর্ট চালু করার অনুমতি চেয়ে ভ্যাটিকানে পোপের কাছে আবেদন করেন;

The Inquisition is more necessary in these parts than anywhere else, since all the Christians here live together with the Muslims, the Jews and the Hindus and this causes laxness of conscience in persons residing therein. Only with the curb of the Inquisition will they live a good life.

ভাবানুবাদঃ বিশ্বের আর যে কোন জায়গার চেয়ে এই জায়গায় ইনকুইজিশন আদালতের বেশি দরকার। (ইনকুইজিশন আদালত হলো ইউরোপের মাটিতে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলে আসা বিশেষ আদালত। দ্বাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে এর উৎপত্তি, পরে তা পুরো ইউরোপব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এই আদালত বাইবেলের শিক্ষা তথা খ্রিষ্টধর্ম বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক বলে মনে হলে সেরকম ধারণা পোষণকারীকে বিচারের মুখোমুখি করতো। খ্রিষ্টধর্মে রক্তপাত নিষিদ্ধ বলে অপরাধীকে এই আদালতের রায়ের মাধ্যমে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হতো। মুসলিম আন্দালুসিয়ার পতনের পরে সেখানেও পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই কোর্ট চালু করা হয়েছিল। বহু লোককে পুড়িয়ে মারা হয়েছে-লেখক) খ্রিষ্টানরা এখানে মুসলমান, ইহুদি, হিন্দুদের সাথে মিলে মিশে বসবাস করার কারণে তাদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে শৈথিল্যতা দেখা দেয়। একমাত্র ইনকুইজিশন আদালতের মাধ্যমেই তারা সঠিক (খ্রিষ্টধর্ম) জীবন যাপন করবে।[১১৬]

ভারতীয় সমাজের এই বহুত্ববাদী বিচিত্র্যতা, বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতি, তার কাছেই পর্তুগিজরা পরাজিত হয়েছে। পণ্ডিত নেহেরু যে কথাটা মুখ ফুটে বলেননি, বা বলতে পারেন নি, সেটা হলো, ভারতীয় সাংস্কৃতির এই প্রলুব্ধকারী দিক, এটাই হলো ভারতের সেই অস্ত্র, যে অস্ত্র দিয়ে সে পরাজিত হয়েও বিজয়ী শক্তিকে ধীরে ধীরে হজম করে নেয়। এ অস্ত্রটাই সে বিজয়ী শক্তির উপরে ধীরে ধীরে প্রয়োগ করে সফলভাবে!

পঁচিশ

নেহেরুর ভাষ্য অনেকাংশেই সঠিক। এর আগে ভারতবর্ষে আগত বহির্শক্তি একটা সময়ে নিজেদের ঐতিহ্য ও স্বকীয়তা হারিয়ে ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। ব্যতিক্রম একমাত্র ইসলাম ও মুসলমান।

বিশেষ করে, ইসলাম। ভারতের সংস্কৃতি ইসলামকে তার নিজের সত্তার মধ্যে আত্মস্থ তো করতে পারলোই না, বরং সে নিজেই ইসলামে বিলীন হয়ে গেল। প্রখ্যাত ইংলিশ দার্শনিক ও ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবির ভাষায়;

The dominant Muslim minority of foreign invaders reinforced by native converts brought India, for the first time, under the rule of masterÕs whome she was unable to assimilate culturally.

ভাবানুবাদঃ যে বিদেশী মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ভারত নিজস্ব সংস্কৃতিক সত্তায় আত্মস্থ করতে পারলো না, সেই বিদেশী মুসলমানরা স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সাথে মিলে এই প্রথমবারের মত ভারতকেই নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এনে দাঁড় করালো।[১১৭]

প্রফেসর আর্নল্ড টয়েনবির এ কথাটা যে কতটা বাস্তব ও অকাট্য সত্য, সেটা আমরা ভারতের পরবর্তী ইতিহাসের দিকে তাকালে প্রায় প্রতিটি পদে পদে টের পাই। ভারতের যেখানেই মুসলমান গেছে, সেখানেই এ বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটেছে। সেখানে বা সেই জনপদে সংখ্যালঘু হয়েও গুটিকতক মুসলমান যে বিশাল হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিজেদের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যতা রক্ষা করেছে।

কেবল তাই নয়, এর পাশাপাশি তারা সংখ্যালঘু হয়েও সংখ্যাগুরু ভারতীয় জনমানসে নীরবে নিভৃতে প্রভাব বিস্তার করে গেছে। এটা করেছে বা করতে পেরেছে ইসলামি সংস্কৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যময়তার কারণেই। আজও তা থেকে ভারতীয় সমাজ, এমনকি, বিশ্বের কোন সমাজই মুক্তি পায়নি।

পর্তুগিজ বণিক ও জেনারেল ভাস্কো ডা গামা কিংবা আলফান্সো আল বুকার্করা দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলে স্থানীয় কোন কোন হিন্দু রাজাদের সাথে মিলে যখন নিজেদের শক্তি ও প্রভাব প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত, স্থানীয় ভারতীয় মুসলমান ও হিন্দুদের ধরে ধরে তাদের মতের বিরুদ্ধেই যখন জোর করে ধর্ম পরিবর্তন করিয়ে খ্রিষ্টান বানানো হচ্ছে, সেই তখনও নিজেদের দল ত্যাগ করে স্পেন ও লিসবন থেকে আসা অনেক পর্তুগিজ

বণিক ও সৈন্য ইসলাম গ্রহণ করে ভারতকেই নিজেদের দেশ হিসেবে গ্রহণ করেছে।[১১৮]

১৫৬৫ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ ভারতের বিভিন্ন রাজার অধীনে প্রায় প্রায় দুই হাজার পর্তুগিজ সৈন্য চাকরি করছে! তারা সকলেই নিজেদের বাহিনী ছেড়ে এসে ভারতের রাজার অধীনে চাকরি নিয়েছে। এ তথ্যটা আমরা পাই সমকালীন পর্তুগিজ পত্রিকা এর বরাত দিয়ে।[১১৯]

মোগল শাসনামলেও আমরা সে রকমটাই দেখি। মোগল ভারতের রাজধানী দিল্লিতে 'ফিরিংগি পাড়া' নামে আলাদা একটা পাড়াই গড়ে উঠে যেখানে ইউরোপ থেকে আসা (বেশির ভাগই পর্তুগিজ, ইংলিশ, আর্মেনিয়া ও ফরাসি নাগরিক) বিদেশিরা বসবাস করতো। তারা মোগল সরকারের অধীনে চাকরি করতেন।

এদের একটা বড় অংশই আবার নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং আচারে আচরণে, চাল চলনে ও নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনেও পুরোপুরি ইসলামি রসম রেওয়াজ পালন করে চলতেন।[১২০] চলনে-বলনে, প্রাত্যহিক জীবনাচারে ও পোশাক পরিচ্ছদেও তারা যেমন ছিলেন মুসলমান, তেমনি ভারতীয়ও বটে।

এদের অনেকেই হয়তো উন্নত সুযোগ সুবিধা, বৈষয়িক উন্নতি, নারী কিংবা ধন সম্পদের কারণে আকৃষ্ট হয়ে মুসলমান হয়েছেন, এমন দাবি করলে তা নিশ্চিতভাবেই উড়িয়ে দেয়ার মত যুক্তি আমাদের কাছে নেই। কেউ কেউ যে এমনটা করেননি, তা আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারবো না।

ইতিহাসের উৎসাহী ও নিরপেক্ষ পাঠক যদি এর কারণ খুঁজে দেখতে চান, তা হলে তাদের নজরে পড়বে ইসলামের একেশ্বরবাদী দর্শন, যা কোনো মতেই বহুত্ববাদিতার সাথে আপোস করে না, কোন মতেই না। এই নিরাপোসকামী দর্শনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে একজন ব্যক্তির আচারে আচরণে, তার কথা আর কাজে।

অর্থাৎ একজন মুসলমানের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে। আর একজন অমুসলিম সর্বপ্রথম এই দিকটির মাধ্যমেই মুসলমান আর অমুসলমানের মধ্যে, তাদের দর্শনের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পান। নিজের মধ্যে বিদ্যমান বহুমাত্রিকতার বাতাবরণে যে এক গোঁজামিল অবস্থার উপস্থিতি রয়েছে, তা টের পান।

ভারতের যে আভ্যন্তরীণ শক্তির কথা পণ্ডিত নেহেরু বলেছেন, সেটা হলো ভারতের সাংস্কৃতিক দিকের কথা। এই শক্তি, তথা, এই সংস্কৃতি দিয়েই এর আগে ভারতের মাটিতে আগ্রাসন পরিচালনাকারী সকল শক্তিকে সে পরাভূত ও বা বশীভূত করতে পারলেও একমাত্র ইসলামের কাছে এসে তার সে

সামর্থ্য কোন কাজে লাগলো না। কেবল তাই নয়, সে ইসলামের সামনে নিজেকে রক্ষাও করতে পারলো না।

প্রখ্যাত ইংরেজ বুদ্ধিজীবী, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক প্রফেসর আর্নল্ড টয়েনবি চমৎকার করে এ বিষয়টা ব্যাখ্যা করেছেন তার এক গ্রন্থে। তিনি বিষয়টা নিয়ে একেবারে খোলাখুলি লিখেছেন, এভাবে;

The Muslims were the first of India's invaders whome the Indian civilization poved unamble to assimilate. There were Buddhist and Hindu converts to Islam, but there were no Muslim converts to Buddhisim or to Hinduism. Islam established itself in the subcontinent as a politically dominant element that remained alien because it was unassimilable culturally. This novel sequel to a foreign invasion broke the religious and cultural unity if Indian life and the break changed the course of Indian history.

ভাবানুবাদঃ মুসলমানরাই হলো ভারত আক্রমণকারী প্রথম বহিঃশক্তি, ভারত যাদেরকে আত্তীকরণ করতে ব্যর্থ হলো। বৌদ্ধ এবং হিন্দু ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু মুসলমান থেকে বৌদ্ধ বা হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি। ইসলাম এই উপমহাদেশে একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েও বিদেশি শক্তি হিসেবেই রয়ে গেল, কারণ, এটাকে (ইসলামকে) সাংস্কৃতিকভাবে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। তার এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটা ভারতীয় সমাজ জীবনের সাংস্কৃতিক ঐক্যকে ভেঙে চুরমার করে দিল আর এই ভাঙন ভারতের ইতিহাসকেই বদলে দিল।[১২১]

ইতিহাস ঘেঁটে দেখলে একজন সচেতন পাঠক এটা পরিষ্কার দেখতে পাবেন যে, পৃথিবীতে হিন্দুত্ববাদী বা খ্রিষ্টবাদী বা বৌদ্ধ বা এরকম অন্য কোনো সংস্কৃতি রাষ্ট্রশক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। ইতিহাসের কোন পর্যায়েই পারেনি। এর ভূরি ভূরি প্রমাণ আমাদের সামনে রয়েছে।

এর বিপরীতে ইসলামি সংস্কৃতিই একমাত্র সংস্কৃতি, যা কোন রকম রাষ্ট্রীয় সহায়তা বা পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই টিকে থাকতে পারে। কেবল তাই নয়, বিস্তার লাভ করতেও পারে, কেবলমাত্র এর অন্তর্নিহিত দর্শনের উপরে ভিত্তি করে।

একজন মুসলমান হিসেবে এমন দাবি করাটা সম্ভবত নিজ ধর্মের প্রতি অতিমাত্রায় আনুকূল্য প্রদর্শন করা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তাই

এক্ষেত্রে একজন অমুসলিম বুদ্ধিজীবী, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও ঐতিহাসিক প্রফেসর টয়েনবির উক্তি তুলে দিচ্ছি এ দাবির স্বপক্ষে। একজন অমুসলিম হয়েও তিনি নির্দ্বিধায় এবং অকপটে বলতে পেরেছেন চরম সত্য ও বাস্তব কথাটা;

In theory the unitary state is an obligatory political framework for the religion; but theory was refuted by experience. This demonstrated that Islam could survive and spread without requiring the support of a unitary government. The experience had two momentous effects. It produced a change in the Muslims' conception of the character of God and the character of the Muslim worshipper's relation to God, and it generated the first wave of mass-conversions among the non-Muslims subjects of the defunct unitary Islamic state's successor-states.

ভাবানুবাদঃ সূত্রানুযায়ী ধর্ম টিকে থাকার জন্য একটি রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর উপস্থিতি অপরিহার্য, কিন্তু বাস্তবতা এ সূত্রকে অকার্যকর প্রমাণিত করলো। বাস্তবতা এটা প্রমাণ করে দেখালো যে, ইসলাম কোন রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা বা সহযোগিতা ছাড়াই টিকে থাকতে এবং বিস্তার লাভ করতে পারে।

এর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ফল হয়েছে। ঈশ্বরের ক্ষমতা ও প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের সাথে তার প্রতি বিশ্বাসীদের (অর্থাৎ মুসলমানদের- লেখক) সম্পর্ক সম্বন্ধে মুসলমানদের ধারণা, বিশ্বাসই বদলে দিয়েছে, এরই ফলে প্রথম যুগের মুসলিম রাষ্ট্র ও তার প্রভাবাধীন রাজ্যসমূহে বসবাসরত অমুসলিম জনগোষ্ঠী দলে দলে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছে।[১২২]

এ কারণেই দেখা গেছে যে, ভারতের মাটিতে গুটিকতক মুসলমান এসে কোন একটা জনপদে শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন এবং সেখানে অত্যন্ত বৈরী পরিবেশেও অতি দ্রুত তারা নিজেদের শাসনব্যবস্থাকে সংহত করতে পেরেছেন। কেবল তাই নয়, এরকম বৈরী পরিবেশেও সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়েছে স্থানীয় ভারতীয়দের ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হওয়ার কারণে। ফলে মুসলিম শাসনব্যবস্থা সুসংহত হয়েছে।

এইসব মুসলিম শাসকরা ইসলামি দর্শন ও সংস্কৃতির কারণে, অর্থাৎ নিজেদের বোধ-বিশ্বাস ও শিক্ষার কারণে বাধ্য হয়েই চারিপার্শ্বের অমুসলিমদের প্রতি, তথা স্থানীয় হিন্দুদের প্রতি মানবিক আচরণ করেছেন।

ধর্ম বিশ্বাস ও জীবনাচারে বৈপরীত্য থাকার কারণে বৈরী আচরণ না করে বরং তাদের সংস্কৃতি ও জীবানচারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর জৌনপুরে গড়ে ওঠা মুসলিম সালতানাতের উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। স্বয়ং নেহেরু তার The Discovery of India নামক গ্রন্থে এ ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন;

Right through the fifteenth century this was a centre of art and culture and toleration of religion. The growing popular language, Hindi, was encouraged, and an attempt was made to bring about a synthesis between the religious faiths of the Hindus and the Muslems. About this time in far Kashmir in the north an independent Muslem King, Zainul Abdin, also became famous for his toleration and his encouragement of Sanskrit learning and the old culture.

ভাবানুবাদ: পঞ্চদশ শতাব্দীর পুরো সময়টা জুড়েই এটা (জৌনপুর) ছিল শিল্পকলা ও ধর্মীয় সহনশীলতার এক প্রাণকেন্দ্র। ক্রমাগতভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকা হিন্দি ভাষাকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হয়েছে এ সময় এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের দর্শনের মধ্যে একটা যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও করা হয়েছে। ঠিক এই সময় কাশ্মীরে জয়নুল আবেদিন নামে এক মুসলমান রাজা ছিলেন, তিনি তার ধর্মীয় উদারতা, স্থানীয় সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা ও সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষকতার কারণে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন।[১২৩]

কেবলমাত্র ইসলাম বিরোধিতার কারণে অনেক ঐতিহাসিকই বাস্তব অবস্থা বর্ণনার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত বিকৃতি ঘটিয়ে ইতিহাসের সাথে, এমনকি, নিজেদের বিবেকের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক সততা রক্ষা করতে পারেননি।

বস্তুত মুসলিম শাসনামলে তথা মুসলমান শাসকদের আওতায় হিন্দু ধর্ম আরও বেশি নিরাপদবোধ করেছে। প্রফেসর টয়েনবির ভাষায়;

It is true that Hinduism showed greater survival-power under Muslim rule than either Zorostrianism of Christianity.

ভাবানুবাদ: এটা সত্য যে 'জরইস্ত্রিয়ানিজিম' (Zorostrianism) এবং খ্রিষ্টবাদের চেয়ে মুসলমান শাসকদের আওতায়ই হিন্দুত্ববাদ টিকে থাকায় সফলতা দেখিয়েছে বেশি।[১২৪]

ছাব্বিশ

এ কারণেই পর্তুগিজ খ্রিষ্টানরা যেমন জোর করে হিন্দু মুসলমান যাকেই হাতের কাছে পেয়েছে, খ্রিষ্টান বানিয়েছে, তেমনটা মুসলমানরা করেনি, বা তাদের তেমনটা করার প্রয়োজন হয়নি। বরং এই পর্তুগিজদের অনেকেই সংখ্যালঘু মুসলিম জনগণকে দেখে, তাদের জীবনাচার, বোধ বিশ্বাস ও সংস্কৃতি দেখে সকল প্রকার প্রতিকলূতাকে উপেক্ষা করেও নিজেদের বাপ দাদার ধর্ম ত্যাগ করেছে, এমন একটা সময়ে যখন তারা এইসব মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আদিষ্ট। সে কারণেই তারা সাগর পাড়ি দিয়ে সেই সুদূর স্পেন ও লিসবন থেকে ভারতের উপকূলে এসে ভিড়েছে।

এটা সম্ভব হয়েছে ইসলামের মানবিক আবেদন, সাম্য ও বৃহত্তর ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা দেখে। অর্থাৎ ইসলামি সংস্কৃতি দেখে। ভারতীয় হিন্দু সমাজ উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর বর্ণ বিভেদে বিভক্ত। সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষ নানাভাবে নিগৃহীত ও অবহেলিত। এমনকি, আজকের এই একবিংশ শতাব্দীর ভারতেও শূদ্র ও দলিত শ্রেণীর উপস্থিতি রয়েছে!

জাতিভেদের এই বোধ ভারতীয় হিন্দু সমাজের অনেক গভীরে প্রোথিত, বহু ভারতীয় বিবেকবান পণ্ডিত এ নিয়ে বহু আন্দোলন করেছেন, লেখালেখি করেছেন, সোচ্চার হয়েছেন, কিন্তু তারপরেও ভারতীয় হিন্দু সমাজ থেকে এটাকে পুরোপুরি নির্মূল করা যায়নি আজও।

ভারতের অনেক জায়গায় গণহারে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ধর্ম পরিবর্তনের পেছনে অনেক কারণের মধ্যে এটাও একটা কারণ যে, তারা অর্থাৎ এইসব নিম্নবর্ণের হিন্দুরা সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অমানবিক এই নিগ্রহ থেকে নিষ্কৃতির পথ খুঁজেছেন। আর ইসলাম যেহেতু তাদেরকে ধর্ম পরিবর্তনের সাথে সাথে রাজা বাদশাহর সাথে সমানভাবে একই মানবিক স্তরে উন্নীত করেছে, কোনো রকম বাছ বিচার বা বিভেদরেখার অস্তিত্ব রাখেনি, তাই তারা মানবিক এই সম্মানটুকু খুঁজেছেন ইসলামের কাছে আশ্রয় নিয়ে।

এটা কেবল ভারতীয় সমাজের বেলাতেই সত্য নয়, বরং এটা একটা বাস্তব ও ঐতিহাসিক সত্য প্রায় প্রতিটি সমাজেই। এমনকি, সেই প্রথম যুগের আরব সমাজে, যেখানে দাসপ্রথা চালু ছিল, সেখানেও। বস্তুত, যেখানেই মানবিক সম্মান ও মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত, সামাজিক অবিচার ও শোষণ প্রতিষ্ঠিত ছিল সেখানেই মুক্তির পথ হিসেবে মানুষ ইসলামের কাছে আশ্রয় নিয়েছে।

ভারতেও এমনটাই ঘটেছে। ভারতের যেসব অঞ্চলে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উপস্থিতি বেশি ছিল, ইসলাম সেইসব অঞ্চলেই বেশি বিস্তার লাভ করেছে।

প্রফেসর আর্নল্ড টয়েনবির ভাষায়;

Conversions of Islam were confined to regions in which a majority of the local Hindu population were outcasts, and the Muslim conquerors found that they must treat unconverted Hindus as if they were 'People of The Book', though Hindus are polytheists, or, if not polytheists, they are monists.

ভাবানুবাদ: ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তকরণটা প্রধানত সেসব স্থানেই সীমাবদ্ধ ছিল যেখানে স্থানীয় হিন্দুদের বেশিরভাগই ছিল নিম্নবর্ণের অচ্ছুত সম্প্রদায়ের। স্থানীয় হিন্দুরা 'আহলে কিত্বাব' বা কিতাবী সম্প্রদায় না হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম শাসকরা তাদের সাথে সেভাবেই (অর্থাৎ কিত্বাবী সম্প্রদায় হিসেবে) ব্যবহার করলেন, যদিও তারা (স্থানীয় হিন্দুরা) ছিল পৌত্তলিক; বহু দেব-দেবীর উপাসক।[১২৫]

এই যে ইসলামি সংস্কৃতির চর্চা ও তার ফল ভারতীয় সমাজে প্রতিফলিত হতে দেখছি আমরা, যার কারণে ভারতে ইসলাম যেমন বিস্তার লাভ করছে তেমনি হিন্দু ও মুসলমান, দুটি সম্প্রদায় মোটামুটি একটা সহাবস্থান তৈরি করে নিতে সক্ষম হচ্ছে, এটা যদি বাধাহীনভাবে চালু থাকতো বা থাকতে পারতো, তা হলে ভারতীয় সমাজ হতে পারতো একটা কল্যাণমুখী, সুখী ও সমৃদ্ধ মানবিক সমাজ।

কোন মুসলিম শাসক বা গোষ্ঠী কর্তৃক এ ধারাকে নিজের বা নিজেদের ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থে ব্যবহার করা না হতো, তা হলে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতীয়ই এ থেকে কল্যাণ লাভ করতে পারতো।

এই সম্ভাবনার মূলেই কুঠারাঘাত করেছেন আকবর। সেটা তিনি করেছেন তার সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থেই। কতটা ইচ্ছাকৃতভাবে বা কতটা অনিচ্ছাকৃতভাবে তিনি তা করেছেন, সে বিতর্ক ইতিহাসের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়, অন্তত আমাদের এ আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। ইতিহাসের গতিধারা ও আকবরের কর্মকাণ্ড এবং তার তাৎক্ষণিক ফলাফল বিচারে আমরা তেমনটাই দেখতে পাই।

ইসলামের যে দর্শন ও সংস্কৃতিকে আমরা বৈষম্য, নিষ্পেষণ ও শোষণের বিরুদ্ধে এক অকাট্য, প্রাকৃতিক রক্ষাকবচ হিসেবে দেখতে পাচ্ছি, মোগল সম্রাট আকবর ইসলামের এই সংস্কৃতিক রক্ষাকবচটাই ধ্বংস করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন।

একজন মুসলমান হিসেবে এ বিষয়টা উপলব্ধি করাটা সহজ হলেও একজন অমুসলিম ব্যক্তির পক্ষে এ বিষয়টার গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি অতটা সহজ

নয়। কিন্তু সেই কঠিন বিষয়টিই অত্যন্ত সহজ ও সাবলীলভাবে উপলব্ধি করেছেন ইংরেজ দার্শনিক ও ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি। তিনি সে উপলব্ধির কথা সোজাসাপ্টা বলেছেনও তার লেখায়। তিনি লিখেছেন;

Akbar initiated a series of debates between representatives of Islam, Hinduism, Zoroastrianism, and Roman Catholic Christianity, and in 1582 he promulgated a new religion of his own, the 'Din – I – Ilahi' (Devine Religion), which so he hoped, would unite all the older religions by transcending each of them.

ভাবানুবাদ: আকবর ইসলাম, হিন্দুত্ববাদ, জরথুস্ত্রবাদ এবং রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্টবাদ নেতার নিয়ে ধারাবাহিক বিতর্ক ও আলোচনার আয়োজন করেছিলেন এবং ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তার নিজেরই এক ধর্মমত; 'দ্বীন-ই-ইলাহী'র (ঐশ্বরিক ধর্ম) প্রচলন ঘটান। এর মাধ্যমে তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন যে, অন্য সব ধর্মের অনুসারীগণ তার এই নতুন ধর্মে অঙ্গীভূত হবে।[১২৬]

অন্য দিকে প্রখ্যাত অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ঐতিহাসিক ও গবেষক Alexander Walker আকবরের এই পন্থাকে সুন্দর করে অতি সংক্ষেপে একটি মাত্র বাক্যে তুলে ধরেছেন। তার ভাষায়;

Akbar sought to combine Islam with the other great faiths to form one universal 'religion of God' calling for a policy of tolerance and mutual understanding that endeared him to his non-muslim subjects.

ভাবানুবাদ: আকবর অন্যান্য মহান ধর্মের সাথে ইসলাম ধর্মকে মিলিয়ে একটা সার্বজনীন সহনশীল ধর্ম উদ্ভাবনে সচেষ্ট হন, এটা আকবরকে তার অমুসলিম প্রজাদের কাছে প্রিয়পাত্র করে তোলে।[১২৭]

আকবরের 'দ্বীন-ই-ইলাহী' নিয়ে আলোচনার আগে এখানে আরও একটা কথা বলে রাখা জরুরি, সেটা হলো এই যে, আকবর ভারতবাসীদের মধ্যে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি ও নিজের ক্ষমতাকে সংহত করতে হিন্দু তোষণের নীতি গ্রহণ করেছিলেন প্রায় একই সময়কালে, একই সাথে।

কাজেই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে এক মঞ্চে আনার পেছনে বা এক মঞ্চে, এক ধর্মে একীভূত করার পেছনে যে কেবলমাত্র প্রজাহিতৈষী বা মানবকল্যাণ চিন্তাই কাজ করেছে, সেটা ঠিক নয়। এর পেছনে আকবরের নিজের সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থচিন্তাও প্রায় পুরোদমে বিরাজ করেছে, সেটা ঘটনাপ্রবাহের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায়। এ বিষয়টি ব্যাখ্যা

করার জন্য আমরা এখানে আকবরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপকে বিচার করে দেখবো।

মোগল রাজধানী দিল্লির সবচেয়ে নিকটবর্তী হিন্দুপ্রধান রাজ্য ছিল; রাজস্থান। রাজপুতদের বাসস্থান। আকবর খুব ভালো করেই জানতেন, তার ক্ষমতার প্রতি যদি কোন হুমকি আসে, তবে তা সবার আগে আসবে এই রাজপুতদের কাছ থেকেই। তাই তিনি রাজপুতদের কাছে টানার জন্য নানা কৌশল ধরলেন। যেখানে শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে উদ্দেশ্য হাসিলের পথ ছিল, সেখানে তিনি তা করলেন। করলেন তার শক্তির সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রা প্রদর্শনের মাধ্যমে।

আকবর ১৫৬৭-৮ খ্রিষ্টাব্দে রাজপুতদের কেন্দ্র চিতোর দখল করলেন আর সেই সাথে তাদের উপরে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালালেন, এমনকি, বন্দী রাজপুতদেরও হত্যা করলেন চরম বর্বরতার সাথে। চিতোর দখলের পরে আকবর প্রায় চল্লিশ হাজার বন্দী রাজপুত যোদ্ধাকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছেন।[১২৮]

বন্দী হওয়ার পরেও নিরস্ত্র এই রাজপুতদের আকবর হত্যা করেছেন কেবলমাত্র অন্যান্য রাজপুত এবং মারাঠাদের মনে মোগল শক্তি সম্বন্ধে ভয় ধরানোসহ শক্তি হ্রাস করতে! নিঃসন্দেহে এটা ছিল এক চরমতম বর্বরতা ও ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।

এই আকবরই আবার রাজপুত রাজাদের মধ্যে থেকে কারো বোন, কারো বা ভাতিজি আবার কারো কন্যাকে নিজের স্ত্রী হিসেবে ঘরে তুলে নিলেন, তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করতে। আর আত্মসম্মান সম্পন্ন যেসব রাজপুত রাজা বা নেতারা (যেমন প্রতাপ সিংহ ও তার বাবা উদয় সিংহ) আকবরের হাতে নিজের বোন বা কন্যা তুলে দিলেন না, তারা হয়ে গেলেন তার চরম দুশমন। এসব নেতাদেরকে তাদের নিজেদের রাজ্য, সম্পদ এমনকি, জীবন দিয়ে হলেও আকবরের মনের ঝাল মেটাতে হয়েছে। মোগল রাজপ্রসাদে হিন্দু রাজপুত নারীদের তাদের নিজেদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবানাচার অপরিবর্তিত রেখে অনুপ্রবেশের ঘটনা ভারতের মাটিতে মোগল সাম্রাজ্যই কেবল নয়, বরং পুরো মুসলিম সমাজ এবং ইসলামি সংস্কৃতির উপরে এক বিরাট নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে। পুরো ভারতের ভবিষ্যৎ সমাজব্যবস্থা, হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ রাজনৈতিক চিত্রপটকে ভিন্নখাতে নিয়ে গেছে।

এ কথার সত্যতা বুঝতে হলে রাজপুত চরিত্রকে বুঝতে হবে। 'রাজপুত' বলতে আধুনিক ভারতের রাজস্থান ও গুজরাট রাজ্যের আদি অধিবাসী সম্প্রদায়কে বোঝায়। ঐতিহাসিকভাবেই তারা যোদ্ধা জাতি। সৈনিক হিসেবে ভাড়া খাটতে বরাবরই তারা দক্ষ। রাজপুত সম্প্রদায়কে

ঐতিহাসিকভাবেই বেয়াড়া, উচ্ছৃঙ্খল গোষ্ঠী হিসেবে দেখা হয়। এরা নিজেদের মধ্যেই বহু গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং যুগ যুগ ধরে পরস্পর পরস্পরের সাথে যুদ্ধ সংঘাতে লিপ্ত।

প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক ও ব্রিটিশ উপনিবেশ আমলে ভারতে কর্মরত কর্নেল জেমস টড (Colonel James Todd) এদের সাথে দীর্ঘদিন উঠা বসা করে, এদের মাঝে দীর্ঘদিন কাটিয়ে এবং রাজপুত গোষ্ঠীর জীবনাচার, সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা, এদের আদি উৎসস্থল, অতীত ইতিহাস ও ভারতীয় সমাজ এবং রাজনীতিতে এদের অবদান, শক্তি আর প্রভাব ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন।

এই ঐতিহাসিক রাজপুত সমাজকে খুব কাছে থেকে দেখে ও পর্যবেক্ষণ করে একটা মন্তব্য করেছেন। ঢালাওভাবে কোনো জাতিগোষ্ঠীকে একই মাত্রায় বিচার ও চিত্রিত করাটা শোভন নয়, বিজ্ঞতার পরিচায়কও নয়, সে কথাটা মাথায় রেখেও আমরা রাজপুত সমাজ নিয়ে তার মন্তব্যটা উল্লেখ করতে চাই।

কর্নেল টড ১৮২০ সালে তার এক লেখায় রাজপুত গোষ্ঠীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন;

'The closest attention to their history proves beyond contradiction that they were never capable of uniting, even for their own preservation: a breath, a scurrilous stanza of a bard, has severed their closest confederacies. No national head exist among them .... And each chief being master of his own house and followers, they are individually too weak to cause us (i.e the British) any alarm.'

ভাবানুবাদঃ 'তাদের (রাজপুতদের) চরিত্রকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এ ব্যাপারে কোন সংশয় থাকে না যে, তারা কখনও ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না, এমনকি নিজেদের স্বার্থেও নয়। সামান্য একটু স্বার্থ, সমালোচনা কিংবা রসাত্মক হাসি ঠাট্টাও তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, জোট বা সমাজকে ভেঙে তছনছ করে দেয়। তাদের ভেতরে কোন জাতীয় নেতার অস্তিত্ব নেই। প্রত্যেক নেতাই তার পরিবার ও অনুসারীদের তত্ত্বাবধায়ক বা দায়িত্বশীল। আমাদের (ভারতে ব্রিটিশ সরকার) জন্য কোন ধরনের হুমকি সৃষ্টির ক্ষমতা তাদের নেই। [১২৯]

কিন্তু এই রাজপুতরাই মুসলিম সামরিক আগ্রাসনের বেলায় একাট্টা এবং সম্মিলিতভাবে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম! এদের মধ্যে থেকেই পৃথ্বিরাজ-এর জন্ম, যে পৃথ্বিরাজ ১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঘোরির বিশাল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল!

সাতাশ

এই ধরনের স্থুল চরিত্রের হিন্দু রাজপুত, মারাঠা নারীসহ অন্যান্য হিন্দু নারীদের মোগল রাজমহলে নিজ নিজ ধর্ম ও জীবনাচার নিয়ে অবস্থান এবং এর পাশাপাশি পর্তুগিজ রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্টান পাদ্রিগণ কর্তৃক আকবরের পুত্র মুরাদের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হওয়ার ঘটনা মুসলিম মোগল রাজপরিবারে এমন একটা সংস্কৃতির জন্ম দিল, যার সাথে ইসলামের মৌলিক আক্বিদা, শিক্ষা ও দর্শনের কোনো দূরতম মিলও রইলো না। বরং এর বিপরীতে ইসলাম ও হিন্দুত্ববাদের সংমিশ্রণে একটা মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠলো। এই মিশ্র সংস্কৃতির তারিফ করেছেন ভারতীয় ঐতিহাসিক ও লেখিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য। তিনি লিখেছেন;

আগন্তুক মুসলমানদের রাজত্বকালে স্থাপত্যে ভাস্কর্যে, সঙ্গীতে, শিল্পে, সাহিত্যে, চিত্রাঙ্কনে সর্বভাবে হিন্দুর সঙ্গে সহযোগিতায় এমন একটি সমৃদ্ধ মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল যার তুলনা বিরল।[১৩০]

মিসেস ভট্টাচার্য যে সংস্কৃতির তারিফ করেছেন, সেই নতুন সংস্কৃতির রূপ, অবয়ব ও অবকাঠামোটা এমনই ছিল যে, এর আওতায় মুসলমানদের তাওহিদের চেতনা জাগ্রত রাখা বা সে রকমটা থাকা একরকম অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ হিন্দু সংস্কৃতির মূল সূত্রই হলো বহুত্ববাদিতা। অপরদিকে এর বিপরীতে ইসলামি সংস্কৃতি ও জীবনাচারের মৌলিক ও অবিচ্ছেদ্য ভিত্তি হলো একেশ্বরবাদিতা।

সম্পূর্ণ বিপরীত মেরু ও পরস্পরবিরোধী এই দুই মতাদর্শভিত্তিক সংস্কৃতির সমন্বয় এক কথায় অসম্ভব একটা ব্যাপার যতক্ষণ না উভয়পক্ষ তার নিজ নিজ অবস্থান থেকে ছাড় না দিচ্ছে বা আপোস না করছে। ভিন্নধর্মের সাথে সহাবস্থান করতে ইসলাম ক্ষেত্র বিশেষে ছাড় দিয়ে থাকে, এ ব্যাপারে তার দর্শনে অবকাশ রয়েছে, কিন্তু তাওহিদের ক্ষেত্রে সে এ ছাড় দিতে প্রস্তুত নয়, সেটা সে পারেও না। এই একটি ক্ষেত্রে সে নিরাপোসকামী।

কারণ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর চিন্তা চেতনায় বহুত্ববাদিতা বা স্রষ্টার সাথে অংশীদারিত্বের আপোস ইসলামের মৌলিক ভিত্তিকেই ধসিয়ে দেয়। ইসলামি দর্শনের এই মৌলিক অবস্থান, অংশীবাদিত্বের ক্ষেত্রে অবিচলতার প্রকাশ থাকে এর প্রতিটি বিধি বিধানে, প্রতিটি শিক্ষায়, প্রত্যেক অনুগামীর চিন্তা-চেতনায় ও বোধে-বিশ্বাসে। এই নিরাপোসকামিতার প্রদর্শনী হয় ব্যক্তিমানসে, তার কথা-কাজে, আচারে-আচরণে এবং সার্বিক জীবনাচারে। মৌলিক এই জায়গাটিতেই আকবর আপোস করলেন অত্যন্ত ন্যক্কারজনকভাবে।

Akbar rejected the classic distinction between the Muslim faithful (umma) and the unbelievers.

ভাবানুবাদ : মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে চিরায়ত পার্থক্য বর্জনের মাধ্যমে আকবর বৃহত্তর উম্মাহর চেতনাকেই অস্বীকার করেন।[১৩১]

'বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী'র এই পার্থক্যটাই তিনি অস্বীকার করলেন। বৃহত্তর মানবসমাজে এক স্রষ্টা এবং একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গন্তব্যকে অস্বীকার করার ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট মিশ্র সংস্কৃতির প্রথম শিকার হলেন তিনি নিজে।

তার চরিত্র থেকে ইসলামের নাম নিশানাটুকু দূর হয়ে গেল। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীর সীমানা ভেঙে তিনি এমন একটা অবস্থানে নিজেকে দাঁড় করালেন যে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসার মত আর কোন পথ তার সামনে খোলা রইলো না। তিনি এক অবাস্তব ও অসম্ভবের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। পরবর্তী জীবনে তিনি আর কখনই এ অবস্থান থেকে বেরুতে পারেননি।

আধুনিক বিশ্বের অতি পরিচিত এক পশ্চিমা পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী ও লেখক Samuel Huntington-এর কিছু প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিসেস বেনজির ভুট্টো তার লেখা 'Reconciliation; Islam Democracy and the West' গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।

একজন মুসলমানের পক্ষে যে তার সাংস্কৃতিক পরিচিতি বিসর্জন দেয়া সম্ভব হয় না, তিনি যে একইসাথে একজন খ্রিষ্টান ও একজন মুসলমান (আমরা এ স্থলে বলবো; একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান) হতে পারেন না, এবং কেন পারেন না, সে বিষয়টি তার বিখ্যাত ও বহুল আলোচিত 'The Clash of Civilizations?' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন সবিস্তারে।

মিসেস বেনজির ভুট্টো সে গ্রন্থ থেকেই এ বক্তব্যগুলো চয়ন করেছেন। স্যামুয়েলের বক্তব্য খুবই পরিষ্কার, তিনি বলেছেন;

Cultural characteristics and differences are less mutable and hence less easily compromised and resolved than political and economic ones.

ভাবানুবাদ: সংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্যগুলো অপেক্ষাকৃত কম পরবির্তনশীল, তাই রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক চরিত্রের তুলনায় এগুলোর কমই পরিবর্তন ঘটে।[১৩২]

তার মতে;

While Ideological differences can be compromised, cultural differences cannot.

ভাবানুবাদ: আদর্শিক মতপার্থক্যগুলোর ব্যাপারে আপোস করা যায়, কিন্তু সংস্কৃতিক বৈপরীত্যগুলোর ব্যাপারে তেমনটা সম্ভবপর হয় না।[১৩৩]
তিনি একেবারে সুস্পষ্ট করেই বলেছেন চরম সত্য কথাটা, যেটা আকবর বুঝতে পারেন নি, বা বোঝার চেষ্টাও করেন নি। তিনি বলেছেন;
a person can be half-French and half-Arab and simultaneously even a citizen of two countries. It is more difficult to be half Catholic and half Muslim.
ভাবানুবাদ: একজন মানুষ একাধারে অর্ধেক আরব আর অর্ধেক ফরাসি হতে পারেন, এমনকি তিনি একই সাথে দুই দেশের নাগরিকও হতে পারেন, কিন্তু তার পক্ষে অর্ধেক খ্রিস্টান আর অর্ধেক মুসলমান হওয়াটা বড়ই দুরূহ।[১৩৫]
স্যামুয়েল এর সেই বক্তব্য ও তার পেছনে যুক্তিগুলো এতটাই অকাট্য ও বাস্তব যে, এর বিপরীতে কোন বিতর্ক চলে না। একজন অমুসলিম হয়েও স্যামুয়েল হান্টিংটন যে সত্যটা বুঝলেন, একজন মুসলমান হয়েও আকবর সেই সত্যটা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন!
আকবর ইসলামকে কি চোখে দেখেছেন, সে বিষয়টি একটা প্রশ্ন বটে। আমরা সে প্রশ্নের উত্তর দেখবো তার কর্মকান্ডের মধ্যেই, আলাদা করে নয়। কারণ, আকবর ইসলাম কতটুকু জানতেন, বা বুঝতেন, অথবা ইসলামকে জানার বা বোঝার এবং ইসলামি জীবন যাপনের বাস্তব প্রশিক্ষণই বা কতটুকু পেয়েছিলেন, সে বিষয়টির উত্তরটাও জানা দরকার আগের প্রশ্নের জবাব পেতে হলে।
ইতিহাস যেমন জানে, তেমনি আমরাও জানি, এ উভয় প্রশ্নের উত্তর, নেতিবাচক হতে বাধ্য। আকবর ইসলামি জীবন যাপনের পর্যাপ্ত সুযোগ পাননি। তিনি ইসলামী শিক্ষাও তেমন পাননি, তিনি ছিলেন প্রায় নিরক্ষর।
তবে তিনি জানতে চাইতেন। তার মনে উদিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেন। তার মনে উদিত প্রশ্নগুলোর বিবিধ ফিরিস্তি আমাদের কাছে নেই। আবুল ফজলও সেগুলো আকবরনামায় বিবৃত করেননি। তিনি তার প্রভু আকবরের মধ্যে ঐশ্বরিক গুণাবলী আবিষ্কার ও তার প্রতিটি পদক্ষেপকে বৈধতা দিতেই ব্যস্ত থেকেছেন।
সরকারের উচ্ছিষ্ট ভোজনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত এই আলেম তার প্রভুর গুণকীর্তণে লিখেছেন ২৫০৬ পৃষ্ঠার বিশাল আকবরনামা ও ১৪৮২ পৃষ্ঠার 'আইন-ই-আকবরী' (ইংরেজি ভার্সনের পৃষ্ঠা সংখ্যা)। আর এর মধ্যে তিনি আকবরের খাবার মেনু, তার ব্যক্তিগত অভ্যাস, পছন্দ-অপছন্দ, বাঘ শিকারের কৃতিত্ব ও সাহস, এসব নিয়েই ব্যয় করেছেন দেড় হাজার পৃষ্ঠা!

তাই কেবলমাত্র আবুল ফজল কিংবা তার ভাই ফৈজি অথবা বাদাউনির বর্ণনার উপরে ভিত্তি করে আকবরকে বিচার করতে গেলে প্রতারিত হতে হবে।

আকবরের কর্মকাণ্ড ও সেসবের ইতিহাস বিচারে এটা সুস্পষ্ট যে, আকবর সকল ধর্মের লোকজনকে খুশি করার জন্য সচেষ্ট থেকেছেন। এক পশ্চিমা ইংরেজ ঐতিহাসিক এ বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন;

He sought a faith which would satisfy the needs of his realm as well as those of his conscience, one based on irrefutable logic, composed (like Fatehpur Sikri) of the finest elements in existing practice, and endowed with a universal appeal, something monumental and sublime which would transcend all sectarian differences and unite his chronically desperate subjects. It was a tall order and one which even a bazaar-ful of theologians could not fulfil.

ভাবানুবাদ: তিনি (আকবর) ফতেহপুর সিক্রিতে বিরাজমান নিখুঁত সামাজিক জীবনাচারভিত্তিক, সার্বজনীন আবেদনময়ী ও অকাট্যযুক্তি নির্ভর এমন একটা স্মরণীয় ও মহিমান্বিত দর্শন খুঁজছিলেন যা একাধারে তার রাজ্যের প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি নিজের মনের প্রশ্নগুলোরও জবাব জোগাবে, একইসাথে, তার বহুধাবিভক্ত প্রজাদের মধ্যে সকল অনৈক্য দূর করে ঐক্যবদ্ধ করবে। তার এ প্রত্যাশা এতটাই ব্যাপক ছিল যে, রাজ্যভর্তি পন্ডিত সকলে মিলেও তা পূরণ করতে পারলো না।[১৩৫]

ব্রিটিশ বাংলাদেশি প্রখ্যাত তরুণ গবেষক, বন্ধুবর জনাব মজলুম খানের ভাষায়;

As a freethinker he advocated a form religious pluralism which antagonised both Muslim and Hindus. According to the Muslims, Akbar's religious synthesis, known as Din e Ilahi (or the 'Devine Religion'), made a complete mockery of Islamic teachings, while the orthodox Hindus considered his religious experimentation to be ill-concieved and bizzare. Thus, instead of strengthening Hindu-Muslim relations, Akbar's amateurish approach to religious dialogue abd debate only served to devide the two communities further.

ভাবানুবাদঃ একজন মুক্তমনা হিসেবে তিনি এক ধরনের ধর্মীয় বহুত্ববাদিতার ধারণা পেশ করেন, যা একইসাথে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কেই ক্ষিপ্ত করে। মুসলমানদের কাছে আকবর প্রবর্তিত ধর্ম 'দ্বীন ই ইলাহি' ইসলামি দর্শনের সাথে তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়, অপরদিকে গোঁড়া হিন্দুরা ধর্ম নিয়ে তার এ ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষাকে অপরিণামদর্শী ও বিদঘুটে হিসেবেই দেখেছে। আর এভাবেই আকবরের এই ধরনের অপরিপক্ব পদক্ষেপ হিন্দু মুসলমান দুই গোষ্ঠীর সম্পর্ককে জোরদার করার পরিবর্তে আর বিভেদের দিকে ঠেলে দিল।[১৩৬]

বস্তুত আকবরের কাছে ধর্ম কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না। এটা নিয়ে যা ইচ্ছা করা যায়, সেটাই তিনি করেছেন এবং করে দেখিয়েছেন। দাদা বাবর কিংবা বাবা হুমায়ুনের মত তিনি কখনই নিজেকে একজন মুসলমান শাসক হিসেবে জাহির করেননি। সেরকম কোনো গরজবোধও তার ছিল না। তার নজরে ছিল পুরো ভারতের আঠারো কোটি জনগণের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে তার ক্ষমতাকে সংহত করা। একজন পশ্চিমা ঐতিহাইসক এ ব্যাপারে বলেছেন;Akbar projected himself not as a Muslim warrior-king, but as the absolute monarch of a diverse subject population.

ভাবানুবাদঃ আকবর নিজেকে একজন মুসলিম মুজাহিদ শাসক হিসেবে নয় বরং বহুজাতিক জনগোষ্ঠীর একজন একচ্ছত্র রাজা হিসেবে জাহির করেছেন। [১৩৭]

আকবরের আগে ভারতবর্ষে পরপর এক এক করে নয়টি মুসলিম রাজবংশ রাজ্য শাসন করেছে। তাদের কেউই চল্লিশ বৎসরের বেশি রাজত্ব করতে পারেনি।[১৩৮]

ফলে স্বাভাবিকভাবেই আকবরের দৃষ্টিসীমায় মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে বিরাজমান ছিল; কি করে নিজের ও নিজের বংশের শাসনকালকে দীর্ঘস্থায়ী করা যায়, কি করে তা সংহত করা যায়। তার প্রতিটি কর্মকাণ্ডের পেছনেই এই চিন্তা কাজ করেছে বলেই মনে হয়।

তার এ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তিনি ধর্ম ও ধর্মীয় ভাবাবেগকে নিখুঁতভাবে, অত্যন্ত সাফল্যজনক ভাবে কাজে লাগিয়েছেন। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি ধর্মকে বিকৃত করে ব্যবহার করলেও তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের ক্ষেত্রে নিজের এবং সংখ্যালঘুর ধর্মীয় বোধ বিশ্বাসকে অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক ভাবে বিসর্জন দিয়ে সংখ্যাগুরুর ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন বটে, কিন্তু নিজে সে ধর্ম গ্রহণও করেন নি।

নিজে একজন মুসলমান ও মুসলিম বাবা মার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ধর্ম পরিবর্তন ছাড়াই হিন্দু নারী বিয়ে করেছেন, সেই সব নারীদের ধর্মপালনের সুবিধার্থে তিনি রাজপরিবারের ভেতরেই মন্দির গড়ে দিয়েছেন, তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দানের জন্য।[১৩৯] আঠারো বা উনিশ বৎসরের আকবর চারটি স্ত্রী তখন হয়ে গেছে। অথচ রাজনৈতিক কারণে বা নিজের বিকৃত যৌন লালসা চরিতার্থ করার জন্য পরবর্তী বিয়ে করার কোনো রাস্তা কি ছিল? অন্তত ইসলাম ধর্মমতে? কিন্তু আকবরের বিয়ে ঠিকই হয়েছিল। তিনি একেরপর এক বিয়ে করে চলেছেন। এভাবে এক এক করে পরপর তিনশত বিয়ে করলেন। এইসব বিয়ে জায়েজ করেছেন আকবরের সভাসদ আবুল ফজল। আবুল ফজলের বাবা শেখ মুবারাক-এর মত দরবারি আলেম। পারসিক সাংস্কৃতির ঐতিহ্যমণ্ডিত শিয়া ধাঁচের বিকৃত ইসলামি চেতনায় উজ্জীবিত শেখ মুবারাক ও আবুল ফজল ঠিকই সেই সব বিয়ের বৈধতা দিলেন ইসলামি লেবাস পরিয়ে 'মুতা'আ' বিয়ে হিসেবে।[১৪০]

যে ইসলামের বিরোধিতায় তিনি মাঠে নেমেছেন সেই ইসলামেরই বিকৃত রূপকে তিনি নিজের ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করলেন। নিজের বিকৃত কামনা বাসনাকে বৈধতা দেবার কাজে ব্যবহার করলেন। তার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে যে আবুল ফজল তাকে ফতওয়া জুগিয়েছেন, সেই আবুল ফজলের অপরাধের চেয়ে আকবরের অপরাধ এক্ষেত্রে এতটুকুও কম নয়।

তার সন্তানদের (বিশেষ করে, শাহাজাদা মুরাদের) জন্য তিনি মুসলিম শিক্ষকের পরিবর্তে পর্তুগিজ খ্রিষ্টান পাদ্রিকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন।[১৪১]

এই পর্তুগিজ পাদ্রিদের সাথে তার ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এই বন্ধুত্বের মূল্য দিতে হয় বাংলাকে! কারণ, পর্তুগিজরা আকবরের কাছ থেকে পশ্চিমবাংলার হুগলিতে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের জন্য অনুমতি আদায় করে নিল এই সময়কালেই।

বাংলা চিরদিনই মোগল সাম্রাজ্যের জন্য একটা মাথা ব্যথার কারণ ছিল, এরা সুযোগ পেলেই দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে এক পায়ে খাড়া ছিল। তা ছাড়া, দিল্লি থেকে অনেক দূরের এই প্রদেশে মোগল সম্রাটকে রাজস্ব আদায় করতেও বেগ পেতে হতো। এই সুযোগটাই পর্তুগিজরা নিতে চাইলো। তারা দেন দরবার করে আকবরের কাছ থেকে বাংলায় বাণিজ্যের অনুমতি তো নিলই, সে সাথে আরাকানেও তারা অনুমতি পেলো।[১৪২]

হিন্দু সন্ন্যাসীদের মত করে গেরুয়া পোশাক পরেছেন। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরেছেন।[১৪৩]

কপালে চন্দনের তিলক লাগিয়েছেন। দৈনন্দিন পানি পানের ক্ষেত্রে তিনি সারাজীবন কেবলমাত্র গঙ্গাজলকেই বেছে নিয়েছেন পবিত্রজ্ঞানে।[১৪৪]

আবার ওদিকে পারসিক অগ্নিপূজারিদের সন্তুষ্ট করতে তাদের ধর্মীয় নেতাদের সাথে সখ্যতা গড়েছেন। কেবল তাই নয়, দিল্লির জরোস্ত্রীয় পারসিক ধর্মগুরুকে তিনি তার রাজসভার গুরুত্বপূর্ণ পদে, সভাসদ হিসেবে ঠাঁই দিয়েছেন এবং সেই একইসাথে জরোস্ত্রীয় পারসিক ধর্মীয় চিহ্ন হিসেবে তাদের বিশেষ ধরনের কোর্তা ও কোমরবন্ধ পরিধান করেছেন।[১৪৫]

তার এসব অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের বিরোধিতার কারণে বা সে সবের প্রতিবাদ করার চেষ্টা করায় দুই সুন্নি আলেম; মকদুম-উল-মুলক ও শেখ আব্দুন নবী, দুইজনকেই বরখাস্ত করলেন। [১৪৬]

কি নির্মম রসিকতা, যে সম্রাট নিজের জন্য তিনশত স্ত্রী এবং আরও পাঁচ হাজার উপপত্নী বেছে নিলেন, সেই সম্রাটই কিছুদিন পর রাজকীয় ফরমান জারি করছেন এই মর্মে যে; একজন পুরুষের একজন মাত্র স্ত্রী থাকাই বাঞ্ছনীয়![১৪৭]

সবচেয়ে হাস্যকর বিষয় হলো সম্রাট আকবর যে সময়টাতে এই ঘোষণা দিচ্ছেন, সেই তখনও তার ঘরে তিনশত স্ত্রী এবং হাজারেরও উপরে রক্ষিতা রয়েছে! যা হোক, উক্ত দুই আলেমকে বরখাস্ত করার কারণে খুলে গেলো সম্রাটের চাহিদামত, মন জোগানো ফতওয়া দেয়ার মত, তার সকল কাজ কর্মকে ইসলামের লেবাসে বৈধতা দেয়ার মত আলেম; আবুল ফজল, তার বাবা শেখ মুবারাক গংদের তার উপরে প্রভাব বিস্তার করার পথ।

যে সময়টাতে তিনি আলেমদ্বয়কে তাঁড়িয়ে দিলেন ঠিক সে সময়টাতেই কাল্পিনগরের হতদরিদ্র ব্রাহ্মণ 'মহেশদাস' ভাগ্যক্রমে সম্রাটের নজরে পড়ে যান সঙ্গীত, সুর ও কাব্যে তার অসাধারণ কণ্ঠ ও দক্ষতার কারণে। সম্রাট হতদরিদ্র, সূর্য উপাসক এই ব্রাহ্মণকে রাজা বানিয়ে দেন জায়গির দান করে, হতদরিদ্র মহেশদাস হয়ে যান প্রচণ্ড প্রভাবশালী 'রাজা বীরবল'।[১৪৮]

আকবর তার জীবনের একটা পর্যায়ে কবিরের ভক্তিবাদের প্রতি আগ্রহ দেখান। ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তার মনে ভক্তিবাদ ও বৈষ্ণববাদের সাথে ইসলামের কিছু ধ্যান ধারণার মিশ্রণে এক অদ্ভুত ধরনের সুফিবাদ দানা বাঁধে। এই সময়েই তিনি ফতেহপুর সিক্রির ঠিক পেছনের দিকে একটা ঘর বানান, নাম দেন 'ইবাদাত খানা'। এখানেই প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়, শুক্রবার শুরুর আগের রাতে এসে হাজির হতেন, সেই সাথে হাজির হতেন সকল ধর্মের ধর্মীয় পণ্ডিতবর্গ।

এখানেই আবুল ফজল, তার বাবা শেখ মুবারাক, বাদউনি, মাকদুম-উল-মুলক, আব্দুন নবীসহ সুন্নি শিয়া খারেজি মতাদর্শের ইসলামি পণ্ডিতবর্গের সাথে সাথে বসতেন হিন্দু ব্রাহ্মণ, দিল্লির জরুথ্রাস্টিয় গুরুসহ অনেকই। এখানেই স্বয়ং আকবর কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে এইসব ধর্মীয় পণ্ডিতদের সাথে বিতর্কে অংশ নেবেন সেই সুদূর মাদ্রাজ হতে আগত তিনজন পর্তুগিজ খ্রিষ্টান পাদ্রিও (১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে)।

এই পর্তুগিজ পাদ্রিরা স্বয়ং আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় খোদ মোগল হেরেমের মধ্যেই খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করবে। আকবরও তার পুত্র মুরাদের গৃহ শিক্ষক হিসেবে পর্তুগিজ পাদ্রি মনসুরেট কে নিয়োগ দেবেন। [১৪৯]

আর এই পাদ্রি যুবরাজ মুরাদকে তার প্রতিটি পাঠদানের পূর্বে তা শুরু করাবেন, পবিত্র ঈশ্বর ও তার পুত্র পবিত্র আত্মা প্রভু যিশুর নামে শুরু করছি বলে![১৫০]

যুবরাজ মুরাদও সম্মানিত শিক্ষকের সাথে সাথে ভক্তিতে গদ গদ হয়ে প্রতিটি পাঠ শুরু করবেন উক্ত বাক্য উচ্চারণ করে। ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ আকবরের তিন নাতি প্রকাশ্যে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হবে, ঘটা করে মোগল রাজপরিবারে তাদের সে ধর্মান্তকরণের খ্রিষ্টীয় অনুষ্ঠানও পালিত হবে।[১৫১]

১৫৬২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আম্বরের রাজকুমারীকে বিয়ে করলেন, আর এর মাত্র দুই বৎসরের মাথায় ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে এসে তিনি ভারতের অমুসলিম নাগরিকদের উপর থেকে যিজিয়া তুলে দেন।[১৫২]

ছাব্বিশ বৎসর বয়সেও মহামতির যখন কোন সন্তান নেই তখন তিনি ভক্তিতে গদ গদ হয়ে শেখ সেলিমের কাছে দোয়ার জন্য গিয়েছিলেন। ১৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের, ১৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাটের আর এক স্ত্রীর গর্ভে মুরাদের এবং ১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় পুত্র দানিয়েলের জন্ম হলে কৃতজ্ঞতা আর উথলে উঠা হৃদয় নিয়ে পায়ে হেঁটে আজমিরে গেছেন খাজাবাবার কবর জিয়ারতে। ১৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জানুয়ারি থেকে শুরু করে পরের মাস ফেব্রুয়ারির ৫ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন চৌদ্দ মাইল করে দুই শত আঠাশ মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে গেছেন, কৃতজ্ঞতা আর ভক্তির আতিশয্যে।[১৫৩]

চিতোর জয়ের পরেও একইভাবে তিনি আগ্রা থেকে আজমির গেছেন পায়ে হেঁটে! সেই তিনি এখন ইসলাম আর এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কিছুর প্রতিই এতটাই বিরক্ত যে, ১৫৮০ সাল নাগাদ এসে তিনি সেই আজমির জেয়ারতও বন্ধ করে দেবেন। [১৫৪] এরপরে তিনি আর কোনদিনও আজমিরে যাননি।

সময়কালটা বিবেচনায় নেয়াটা খুব জরুরি বটে। ঠিক এই সময়, ১৫৭৯

সালে এসে আকবর ভারতীয় মুসলিম রাজাদের যুগপ্রাচীন ঐতিহ্য; কাবাঘর রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজিদের খেদমতে মক্কা ও মদিনায় অর্থ প্রেরণের ধারাটা বন্ধ করে দেবেন। [১৫৫] তিনি মক্কায় এরপর থেকে আর কোনো অর্থ পাঠাবেন না। অথচ এই আকবরই কোথাকার কোন অখ্যাত এক ব্যক্তি, খাজা হুসেন মারুই এসে যখন তার সামনে স্বরচিত একটি শের শুনিয়ে যাবে, খুশিতে গদ গদ হয়ে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে দুই লক্ষ রুপি এনাম দিয়ে দেবেন! [১৫৬] পোষা চিতাগুলোর মধ্যে যে চিতাবাঘ সবচেয়ে বেশি হরিণ শিকার করতে সক্ষম হয়েছিল, সেটাকে আকবর তার প্রধান চিতা হিসেবে বিশেষ সম্মান জানিয়ে তার গলায় হিরার মালা আর গায়ে মুক্তার চাদর চড়িয়ে দেবেন! [১৫৭] যথেচ্ছাভাবে সরকারি অর্থ অপচয়ের এই যে ধারা মহামতি শুরু করলেন, এরপর থেকে এক সম্রাট আওরঙ্গজেব ছাড়া মোগল রাজা বাদশাহদের প্রায় সকলেই তা চালু রাখবেন। জাহাঙ্গির আর নুরজাহান তো কাশ্মীরের চল্লিশ মাইল দক্ষিণের এক লেকে তাদের প্রিয় মাছগুলোর কোন কোনটার কানে সোনার দুল, কোন কোনটার নাকে হীরার রিং পরিয়ে দেন! [১৫৮] জন্মদিনে নিজের ওজন করাবেন স্বর্ণ দিয়ে।

জাহাঙ্গীর তার পুত্র শাহজাদা খুররমকে (ভবিষ্যৎ সম্রাট শাহাজাহান) ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে সেনাদলসহ দাক্ষিণাত্যে অভিযানে পাঠালে সেই অভিযানে শাহজাদা সফল হন। দাক্ষিণাত্যের রাজা মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করে বার্ষিক কর দিতে সম্মত হয় এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের জন্য প্রচুর উপঢৌকন পাঠায়। বিজয়ী বেশে শাহজাদা রাজধানীতে ফেরত এলে খোদ জাহাঙ্গীর তার বিজয়ী পুত্রকে খোশ আমদেদ জানান, পুত্রের মাথার উপরে এক থালা হীরা-জহরত, মনি-মুক্তা ঢেলে দিয়ে। আর রানী নুরজাহান তো পুত্রের বিজয় উদযাপনে এক বিশেষ পার্টির আয়োজনকরণে সে সময়কার তিন লক্ষ রুপির এক বিশাল অংকের অর্থ খরচ করে! [১৫৯]

এ সময় এসে তিনি আরও একটা সাংঘাতিক কাজ করে বসলেন। তিনি 'মাহজার' নামে সেই কুখ্যাত ফরমান জারি করে বসলেন। আলেম ওলামাদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার খর্ব করতে তিনি উক্ত ফরমানে নির্দেশ জারি করলেন, 'এখন থেকে ইসলামের কোন বিধি বিধান নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলে তার চূড়ান্ত ফয়সালা, অর্থাৎ চূড়ান্ত ফতোয়া দেবেন মহামান্য আকবর। রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে ভবিষ্যতে সম্রাট যদি কোন নির্দেশ জারি করেন, তবে সে নির্দেশ সকলেই মানতে বাধ্য থাকবেন।' [১৬০]

এভাবে গণ্ডমূর্খ আকবর, কুরআন হাদিস ও ফিকাহশাস্ত্র সম্বন্ধে যার বিন্দুমাত্রও জ্ঞানও ছিল না, যিনি নিজের মাতৃভাষাটাও পড়তে লিখতে

পারতেন না, সেই তিনি একাধারে রাজ্যের প্রধান মুফতি ও কাজি হিসেবে নিজেকে অধিষ্ঠিত করলেন! এ পর্যায়ে এসে ১৫৮২ খিষ্টাব্দে তিনি নিজের উদ্ভাবিত ধর্ম; 'দ্বীন-ই- ইলাহি' প্রবর্তন করলেন।[১৬১]
আকবর তার দরবারে পারসিক নববর্ষ নওরোজের কথা জানতেন। জানতেন ইংরেজি বর্ষ শুরুর কথাও। তিনি জানতেন ইসলামি হিজরি সালের কথাও। আবুল ফজল তাকে বুঝিয়েছিলেন যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মক্কার কাফেরদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাতে রাতের আঁধারে পালিয়ে গিয়েছিলেন মদিনার উদ্দেশ্যে, সেই ঘটনা থেকে হিজরি সাল গণনা শুরু।
এই 'পালিয়ে যাওয়া'র ঘটনা বীর আকবরের ভালো লাগেনি, তাই তিনি নিজের সিংহাসনে আরোহণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এক নতুন সাল গণনার রীতি চালু করলেন; (ডিভাইন এরা) 'ঐশ্বরিক সাল' হিসেবে! [১৬২]
এরপরে তিনি ফতেহপুর সিক্রির মসজিদে নিজের তৈরি নতুন ধর্ম 'দ্বীন-ই-ইলাহি' প্রচারে গেলেন। খুতবা দেবেন। শেখ মুবারাকের পুত্র, আবুল ফজলের বড় ভাই ফৈজি কাব্যিক ছন্দে তার সে খুতবা লিখে দিয়েছিলেন।[১৬৩]
মহামতি মসজিদের মিম্বরে উঠে যখন খুতবা দিতে গেলেন, তখন দেখা দিল বিপত্তি। তিনি কাঁপতে লাগলেন। তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। তাকে থামতে হলো। তার সারা শরীর জুড়ে এক বিস্ময়কর খিঁচুনি শুরু হলো।[১৬৪]
এরপর থেকে মহামতি আকবর দিনে দিনে যেন ক্রমেই ইসলাম বিদ্বেষী হয়ে উঠতে থাকলেন। তিনি এক এক করে মসজিদ প্রতিষ্ঠা, আজান দেয়া, নামাজ পড়া, হজে যাওয়া, মুসলিম নারীদের পর্দা করা, মুসলমান পুরুষদের জন্য দাঁড়ি রাখা, গরু কুরবানি করা, মুসলমানি দেওয়া বা খতনা করা, মুসলমানদের পরস্পরের দেখা স্বাক্ষাতে সালাম দেয়া-নেয়ার প্রথা বন্ধ করে দিলেন।[১৬৫]
মুসলমানদের কালেমা পরিবর্তন করে আকবর নতুন কলেমা প্রবর্তন করেন; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আকবর খলিফাতুল্লাহ। মোগল হেরেম ও রাজদরবারে এ কলেমার প্রচলন ছিল।[১৬৬]
ফরজ গোছল বন্ধ করে দিয়ে তিনি যৌন সঙ্গমের পূর্বে তা করতে নির্দেশ জারি করেন। [১৬৭] এ পর্যায়ে এসে তিনি নিজেকেই ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন দাবি করলেন!
আকবর অনেক আগেই তার রাজদরবারে সেজদাহ প্রথা চালু করেছিলেন। ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকের একটি ঘটনায় আমরা দেখতে পাই, তার চালুকৃত

এই সেজদাহ প্রথা কেবলমাত্র ফতেহপুর সিক্রি কিংবা আগ্রা বা দিল্লিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং রাজ্যের দূর-দূরান্তেও গিয়ে পৌঁছেছিল, অথবা বলা চলে পৌঁছানো হয়েছিল।

ঘটনাটা ঘটেছিল ১২ এপ্রিল ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দ, মঙ্গলবার বিকেলে। এর আগে সম্রাট আকবর স্বয়ং পাটনা পর্যন্ত তেড়ে এসেছেন। ১৫৭২ সালে বাংলার আফগান সুলতান সুলেমান শাহের মৃত্যুর পরে তার অযোগ্য সন্তান দাউদ ক্ষমতারোহণ করলেও বাংলায় অব্যবস্থা ও অস্থিরতা চলতেই থাকে।

দক্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আকবর সুদূর ফতেহপুর সিক্রিতে বসেও বাংলার দিকে তার ঠিকই নজর ছিল। তার দৃষ্টি বাংলার দিকে টেনে এনেছিল উড়িষ্যার হিন্দু মুকুন্দ দেব স্বয়ং। বাংলার সুলতান সুলেমান শাহ উড়িষ্যা আক্রমণ এবং পুরিতে জগন্নাথের মন্দির লুট করলে তিনি মোগল সম্রাট আকবরের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠান। আকবর তার রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে আফগানদের দৌরাত্ম্য সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই আফগানরা যে সুযোগ পেলেই তাকেও তার বাবা হুমায়ুনের মত বিরক্ত করবে, তা তিনি খুব ভালো করেই জানতেন। তাই তিনি কাল বিলম্ব না করে এগিয়ে এলেন। খুব সহজেই সুলেমান শাহের সন্তান দাউদ শাহ ও তার বাহিনীকে পরাস্ত করলেন।

সেখান থেকে আরও পূর্বের দিকে পূর্ববঙ্গে তিনি না এসে তার সেনাপতি মুনিম খানের নেতৃত্বে কুঁড়ি হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করলেন। মুনিম খান একরকম বিনা বাধাতেই উত্তরবঙ্গের ঘোড়াঘাট, পূর্ব দিকের সোনারগাঁও, দক্ষিণ-পূর্ব দিকের ফরিদপুর এবং দক্ষিণের সাতগাঁও (চট্টগ্রাম) দখল করে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।[১৬৮]

সুলতান দাউদ খান পরাজিত হন। তার আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানটি ছিল বড়ই চমকপ্রদ এবং আকবরকে কতটা উচ্চমার্গীয় অবস্থানে তুলে ধরা হয়েছে ততদিনে, সে বিষয়টি প্রমাণ করতে যথেষ্ট।

আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের জন্য মঞ্চ সাজানো হয়েছে, সেখানে সুশোভিত কার্পেট বিছানো হয়েছে এবং তার উপরে মোগল সেনাপতি মুনিম খান, টোডরমলসহ আরও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সমাসীন। মোগল সেনাপতি মুনিম খান এসে কার্পেটের শেষ মাথায় দাঁড়ালেন, পরাজিত আফগান সুলতান দাউদ শাহ এগিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়ালেন, এর পরে নিজের তলোয়ার বের করে তার সামনে এক পাশে রেখে সোজা হয়ে আবার দাঁড়ালেন।

এরপরে মুনিম খান দাউদ খানের হাতে একটা মোগল তরবারি ধরিয়ে দিলেন, একই সাথে তার কোমরে মোগল সাম্রাজ্যের চিহ্নখচিত একটা

কোমরবন্ধ পরিয়ে দিলেন, একই চিহ্ন খচিত একটা চাদরও তার গায়ে চড়িয়ে দিলেন মোগল সাম্রাজ্যের ছত্রছায়ায় দাউদ শাহকে আশ্রয় দেয়ার প্রতীকী ঘোষণা হিসেবে।

দাউদ শাহ্ মোগল সরকারের প্রদত্ত চাদর গায়ে রেখেই এরপরে দিল্লির ফতেহ্পুর সিক্রির দিকে ঘুরলেন এবং সোজা সেজদায় চলে গেলেন। অর্থাৎ তিনি সম্রাট আকবরের আনুগত্য মেনে নিলেন।[১৬৯]

আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে আকবরের উদ্দেশ্যে এই যে সেজদাহ করার ঘটনা, এটা এ কথাই প্রমাণ করে যে, আকবর ও তার সভাসদগণ সেজদাহকে কেবলমাত্র আকবরের জন্যই বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল আনুগত্যের চিহ্ন হিসেবে এবং সেই সিস্টেম সুদূর দিল্লির সীমানা পেরিয়ে এই বাংলাতেও চলে এসেছিল বা তাকে আনা হয়েছিল আকবরের প্রভুত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আর জীবন বাঁচাতে পরাজিত সুলতান দাউদ শাহের কোনো উপায়ও ছিল না আকবরকে সেজদাহ্ না করে।

একজন মুসলমান সম্রাট আকবর কর্তৃক অপর একজন মুসলমান সুলতানকে এভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য সেজদাহ্ করা বা করিয়ে নেয়ার এ ঘটনা বলে দেয়, আকবর তার প্রবর্তিত সেজদাহ্ প্রথাকে নিজের ও তার কর্মচারীদের কতটা অবিচ্ছেদ্য বিশ্বাস, কর্ম ও আনুষ্ঠানিকতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় প্রটোকলের কতটা গভীরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

মোগল রাজ দরবারে ১৫৬২ খ্রিষ্টাব্দের দিকে প্রখ্যাত সুরসাধক তানসেন ও বীরবলের অন্তর্ভুক্তি ও তাদের প্রভাবশালী হয়ে উঠার ঘটনার এক বিরাট প্রভাব পড়বে আকবরের জীবনে, এমনকি, তার পরবর্তী বংশধরদের জীবনেও। বীরবলের জন্য এবং তারই প্রভাবে আকবর রাজদরবারে, মোগল হেরেমে অগ্নিপূজা শুরু করেন।[১৭০]

হিন্দু সমাজে সঙ্গীত হলো তাদের দৈনন্দিন জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। অনেকে তো সঙ্গীতকেই একমাত্র আরাধ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। আর তাদের সঙ্গীতের প্রতিপাদ্য, বিষয়বস্তু এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ তথা বাদ্যযন্ত্র ও নৃত্য একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠে। কোন কোন সময় সঙ্গীত পূর্ণতা পায় না নৃত্য ছাড়া। আর নৃত্য বা নাচ জমেই না, যদি সেই নৃত্য পরিবেশনকারী একজন নারী না হন। এর সাথে এসে যায় সুরার বিষয়টিও। সুর ও সুরা যেন একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। থাকতেই হবে, তেমনটি না হলেও বাস্তবে আমরা তেমনটাই থাকতে দেখি।

সঙ্গীত, সুর আর সুরা এবং নারী ও নৃত্য এসব মিলে যে পরিবেশ তৈরি হয়, সে পরিবেশ অনেক অনাচার আর অযাচারের সুযোগ অবারিত করে দেয়। আমরা সে সত্যেরই বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাবো পুরো মোগল রাজপরিবারে, তাদের জীবনে, আর তার সে প্রভাব পড়বে আমির ওমরাহদের জীবন থেকে শুরু করে পুরো সমাজেই। সম্রাট আকবর স্বয়ং সে ধারাটি উন্মোচন করে দেবেন তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে।

এ কারণেই আমরা বলি, সঙ্গীত এমন একটি মাধ্যম, যার মাধ্যমে সংস্কৃতির মধ্যে, তথা মানুষের জীবানাচারের মধ্যে অশ্লীল ভাষা, ভাব ও বাক্যসহ অন্যান্য উপকরণের আমদানি হতে পারে। ব্যক্তি, সমাজ ও সভ্যতার জন্য ক্ষতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে।

এ কারণেই আর সকল কিছুর মতই সঙ্গীতের মধ্যে ভালো মন্দ, শ্লীল-অশ্লীল বাছ-বিচার করতে হয়। ইসলাম সেটা করে অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে এবং এ ব্যাপারে নির্দেশও দেয়। ইসলামি দর্শন ও সংস্কৃতিতে সঙ্গীতের একটা বিশেষ ধারা রয়েছে। এটাকে কেউ শ্লীল বা শালিন ধারা বলতে পারেন, কেউবা তাকে ইসলামি ধারাও বলতে পারেন।

আকবর জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এই ক্ষেত্রেও কোন বাছ-বিচার করলেন না, বা করতে দিলেন না। তিনি বীরবল এবং তানসেনকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করলেন। তার কাছে সঙ্গীত সাধনা ও সঙ্গীত শিল্পীরা পৃষ্ঠপোষকতা পেলো অবারিতভাবে। এর ফলে সময়ের পরিক্রমায় সৃষ্ট পরিবেশে পড়ে সবার আগে আকবরের নিজের জীবন, এরপরে তার পরিবার ও নিকটাত্মীয়দের এবং তারও পরে সে বৃহত্তর সমাজে অনেকেরই জীবন, বোধ বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনায় অশ্লীলতা ঠাঁই করে নিল।

আকবরের তিন সন্তানের প্রত্যেকেই সংগীতপিপাসু, নারীলিপ্সু ও সুরাসক্ত হয়ে বেড়ে উঠলো। মদ্যপান, আফিম সেবন, এগুলো প্রাত্যহিক জীবনের অংশ হয়ে উঠলো। যে দাদা বাবর জীবনে মদ ছুঁয়েও দেখেন নি, সেই তারই নাতি আকবর এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করলেন যে, তিনি নিজে তো বটেই, এমনকি তার পরবর্তী বংশধরেরা পাঁড় মাতাল হয়ে বেড়ে উঠলো। আর তাদের চরিত্রের এই দিকটির প্রভাব পড়তে থাকলো রাষ্ট্রের প্রতিটি কাজে।

আকবরের ছোট ছেলে দানিয়েল মদে এতটাই আসক্ত হয়ে গিয়েছিল যে, তার হাতে যেন মদের বোতল না পড়ে, সেটা নিশ্চিত করতে পাহারা বসাতে হয়েছিল। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হয়নি। কারণ, ঐ পাহারাদাররাই শাহজাদা দানিয়েলকে মদ সরবরাহ করতো লুকিয়ে লুকিয়ে।[১৭১]

শেষ দিকে এসে নেশা বাড়ানোর জন্য মদের সাথে আফিম মিশিয়ে খেতে হতো। একদিন এরকম এক মিশ্রণে বিষক্রিয়ায় দানিয়েল মৃত্যুবরণ করে। এই একই পরিণতির মুখোমুখি হয় মেজো ছেলে মুরাদও। মুরাদও মদে আসক্ত ছিল এবং অতিরিক্ত মদপানেই মৃত্যুবরণ করে।

দানিয়েল এবং মুরাদের মৃত্যুর পরে আকবরের একমাত্র উত্তরাধিকার হিসেবে বেঁচে থাকা সন্তান জাহাঙ্গীরের অবস্থাও তথৈবচ। এই জাহাঙ্গীরের বিয়েও দিয়েছিলেন তিনি আম্বারের রাজকন্যা মানবাঈ এর সাথে পুরোপুরি হিন্দু মতে।[১৭২]

ইসলামি দৃষ্টিতে এই বিবাহ সম্পূর্ণ অবৈধ হলেও নতুন ধর্ম; দ্বীন-ই-ইলাহি'র চেতনায় উজ্জীবিত সম্রাট আকবর, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন ও রক্ষায় তৎপর আকবর সে দিকে কোন ভ্রুক্ষেপই করেননি।

জাহাঙ্গীরের কাছে এই নারী সুখী হতে পারেননি। এই মানবাঈ'ই হলেন পরবর্তী সম্রাট শাহজাহানের মা। পরবর্তী জীবনে পারিবারিক কলহের কারণে তিনি আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করে সংসার নামক নরক থেকে নিষ্কৃতি পান।[১৭৩]

জাহাঙ্গীরও তার সারাটা জীবনই মদ্যপ ছিলেন, বরং আকবরের সন্তানদের তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বড় মদ্যপ। দিনে কুড়ি গ্লাস মদপান ছিল তার নিত্যদিনের অভ্যাস। তাতেও যখন তার নেশা পরিপূর্ণ হচ্ছিল না, তখন মদের সাথে আফিম মেশানো হতো নেশার ব্যাপকতা বাড়ানোর জন্য। শেষ বয়সে এসে রাজ হেকিমের পরামর্শে মদ পানের পরিমাণ কমিয়ে দেন। এরপরেও তিনি দিনে ছয় কাপ মদ এবং চৌদ্দ পুরিয়া আফিম সেবন করতেন।[১৭৪]

আর মৃত্যুর দিনে তাকে দেয়া মদের সর্বশেষ কাপটা শেষ পর্যন্ত তিনি আর গলার নিচে নামাতেই পারেননি, অপেয়ই রয়ে যায় শেষ কাপটি।

জাহাঙ্গীর তার সারাটাজীবন নিজের জন্য রাজদরবারে দক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ নিয়োগ দিয়ে রেখেছিলেন, প্রতিদিন ভোরে এইসব সঙ্গীতজ্ঞরা বিভিন্ন বাদ্য বাজিয়ে সুরের মূর্ছনায় সম্রাটের ঘুম ভাঙ্গাতো।

আকবরের কাছে একবার অভিযোগ এলো, তার এক গরিব প্রজা এক জোড়া জুতো চুরি করেছে। মহামতি তাৎক্ষণিক তার বিচার করবেন নিজেই। আদেশ দিলেন তার দুই পা কেটে দেয়া হোক।[১৭৫] হতভাগার দুই পা গোড়ালি থেকে কেটে দেয়া হলো।

নৃশংসতা বিচারে পিতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, তার সন্তান পরবর্তী মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীর নিজ পিতা আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন ক্ষমতা দখলের জন্য। সে বিদ্রোহে ব্যর্থ হয়ে বেশ কয়েক মাস পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানোর পরে শেষ পর্যন্ত দাদি হামিদা বানু ও বাবারই ফুফু গুলবদনের মধ্যস্থতা আর বুদ্ধিমত্তায় বাবা আকবরের কাছ থেকে ক্ষমা পান।

অবশ্য তার আগে বাবার শক্ত হাতের গোটা কয়েক চড় থাপ্পড়ও হজম করতে হয়েছিল ঘরোয়া পরিবেশে, দাদি হামিদা বানুর সামনেই।[১৭৬]

এরপরেও জাহাঙ্গীর বসে থাকেননি। বাবা আকবর মরছেন না, ক্ষমতাও ছাড়ছেন না, এদিকে জাহাঙ্গীরের তর সইছে না, মসনদে বসার জন্য। গোপনে বাবার খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে দিয়েও উদ্দেশ্য সিদ্ধি হলো না। সেই জাহাঙ্গীর নিজে যখন ক্ষমতার মসনদে, তার সন্তান খসরু ও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ক্ষমতার জন্য। সসৈন্যে ১৬০৭ সালের এপ্রিল মাসে আগ্রা হয়ে লাহোর দখলের জন্য এগিয়ে গেলে পিতা জাহাঙ্গীর সে বিদ্রোহ দমন করেন শক্ত হাতে। এরপরে জাহাঙ্গীর তার নৃশংসতার যে মাত্রা দেখান, তা ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। পুত্র খসরুকে তার কয়েকজন সেনাপতি ও বন্ধু সহযোগীসহ গ্রেফতার করা হয়। তার প্রধান দুই সহযোগী ও সেনাপতিদের একটি গরু ও একটি গাধা জবাই করে তার কাঁচা চামড়ার ভেতরে পুরো মুখ এঁটে দেয়া হয় এর পরে প্রচণ্ড রোদের মধ্যে সারা শহর ঘোরানো হয় তাদের। হতভাগা দুজনেই কাঁচা চামড়ার মধ্যে আবদ্ধ থেকে গরমে আধা সেদ্ধ অবস্থায় দম বন্ধ হয়ে মারা যায়।

আর শাহাজাদা খসরুর অন্যান্য সহযোগী ও বন্ধুদের বেঁধে মাটিতে শুইয়ে দেয়া হয়। এরপরে খসরুকে হাতির পিঠে বসিয়ে তাকেই বাধ্য করা হয় ঐসব বন্ধুদের উপর দিয়ে হাতি চালিয়ে যেতে, যেন তার বন্ধুরা হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট হয়ে যায়! এভাবেই খসরুর সকল সহযোগীকে হত্যা করা হয়।[১৭৭]

খসরুকেও একটা গাধার পিঠে চড়িয়ে সারা শহর ঘোরানো হয়। খসরু এর পরেও থেমে থাকেনি। বাবাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে, গোয়েন্দাদের মারফত এমন গোপন খবর ও বিস্তারিত প্রমাণ পাবার পর তার দু'টি চোখই বাবা জাহাঙ্গীরের নির্দেশে অন্ধ করে দেয়া হয়। এর পরের সারাজীবন খসরুকে অন্ধ হয়েই কাটাতে হয়।[১৭৮]

বড় ভাই, ভবিষ্যৎ মোগল সম্রাট শাহজাহান আপন পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ক্ষমতা দখলের লড়াই-এ নামবেন। ঠিক এই সময়,

তার কাছে আশ্রিত থাকাবস্থাতেই শাহাজাহান আপন অন্ধ ছোট ভাই, খসরুকে সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে বিষ প্রয়োগে ১৬২১ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই আগস্ট হত্যা করে নিজের পথ পরিষ্কার করবেন সিংহাসন প্রাপ্তির পথে।[১৭৯]
বাবা আকবর যেমন চিতোর দখল করে প্রায় চল্লিশ হাজার বন্দী রাজপুতকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছেন, (চল্লিশ হাজার রাজপুত হিন্দুর এই হত্যাকাণ্ডটি আকবর ঘটিয়েছেন তার দুই হিন্দু সেনাপতি, ভগবান দাস ও টোডরমলকে দিয়ে) ঠিক সে রকমই নৃশংসতা পুত্র জাহাঙ্গীরও দেখিয়েছেন। সংখ্যাবিচারে অনেক কম হলেও অহেতুক হত্যাকাণ্ড ও নৃশংসতার সেটা একটা জঘন্যতম উদাহরণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১৬০৭ খ্রিষ্টাব্দে কান্দাহার বিজয়ের পরে প্রায় তিনশত বন্দীর কাটা মাথা উপহার হিসেবে জাহাঙ্গীরের কাছে প্রেরণ করে তার সেনাপতিরা![১৮০]
এ ধরনের নৃশংসতা আর বর্বরতা মোটামুটি পুরো মোগল যুগেই চালু ছিল। আর সময়ের পরিক্রমায় তা ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের রাজনীতির এক অবিচ্ছেদ্য রীতি হিসেবে অঙ্গীভূত হয়ে যায়। এর অর্থ হলো, রাজনীতি ও প্রশাসন থেকে মানবিক কল্যাণের চিন্তা দূরীভূত হতে থাকে। এর ফলে ভারতীয় সমাজে হিন্দু, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তো বটেই এমনকি, বিভিন্ন হিন্দু গোত্রের মধ্যেও স্থায়ী বিরোধ ও বিদ্বেষের সূত্রপাত হয়, যা আজও বিদ্যমান।
দু'একটা ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া পুরো মোগল বংশে পরিবার ব্যবস্থা ছিল একটা সাক্ষাৎ নরকসম। পরিবার নামক এ ধরনের নরক, যেখানে বাবা, সন্তান, ভাই একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী, যাদের সম্পর্কের ভিত্তিই হলো অনাস্থা আর অবিশ্বাস, তাদের দ্বারা একটা সুস্থ সমাজ কি করে গঠিত হতে পারে? যারা নিজেদের রক্তের সম্পর্কটাকেও সম্মান করতে পারে না, রক্ষা করতে পারে না, তারা কি করে বৃহত্তর পরিসরে আপামর জনসাধারণ, যাদের সাথে রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই, তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে মানবিক হতে পারে?
দাদা বাবর ও বাবা হুমায়ুনের পরে আকবরই প্রথম মোগল সম্রাট যিনি মোটামুটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ পেয়েছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম হলো, 'দ্বীন-ই-ইলাহি' প্রবর্তন ও ইসলাম বিরোধিতার কারণে তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় ও মারাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলে বাংলা ও বিহারের জনতা।[১৮১] আকবরের মনে ছিল বাংলার এই ভূমিকার কথা। ঠিক তেমনি পুত্র জাহাঙ্গীরও সেটা মনে রেখেছিলেন। তাই ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস এর দূত হিসেবে Sir Thomas Roe জাহাঙ্গীরের দরবারে এসে খুব

সহজেই তার কাছ থেকে সুরাটে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের অনুমতি লাভে সক্ষম হবে।[১৮২]

যা হোক, আকবর নিজে কখনো কখনো যদিও সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করেছেন (যেমন রাজপুতদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আগ্রাসন, চিতোর আর কান্দাহার দখলের ঘটনা ইত্যাদি)। এর বাইরে তার রাজত্বকালে মোটামুটি শান্ত পরিবেশ বজায় থেকেছে। স্থানীয় ভারতবাসীদের সহযোগিতাও পেয়েছেন তিনি। তার রাজত্বকালও ছিল প্রায় অর্ধশতাব্দী সময়কাল। দশ কোটিরও বেশি লোকসংখ্যা নিয়ে ভারত তখন সম্পদে আর সম্ভাবনায় বিশ্বে অদ্বিতীয় বলা চলে।

আকবর ভারতবাসীর মানবিক মানোন্নয়নে সুদূরপ্রসারী ও পরিকল্পিত কোন পদক্ষেপ নেননি। তিনি ইচ্ছা করলেই ভারতের আনাচে-কানাচে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারতেন। মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সম্পদ ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে পারতেন। তিনি তা করেননি। এমনকি, তিনি ভারতের স্থানীয় বাসিন্দাদের ব্যবহার করলেও তিনি তাদের কৃষ্টি-কালচার আর মুখের ভাষাকে পৃষ্ঠপোষকতা দেননি বরং তিনি নিজের মাতৃভাষাকেই লালন করেছেন। সেটা তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনেই কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং নবগঠিত ও উদীয়মান সাম্রাজ্যের (মোগল সাম্রাজ্যের) রাষ্ট্রভাষা ছিল ফার্সি।[১৮৩]

স্থানীয় কোনো ভারতীয় ভাষাই আকবরের পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। অথচ তখনও ভারতের কয়েকশত ভাষা জীবন্ত এবং লোকের মুখে মুখে। সে সময় ভারতের লোকসংখ্যা খুব বেশি হলে প্রায় দশ কোটি।[১৮৪]

এই সব কোটি কোটি লোকের মুখের ভাষাকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করার, বা তাদের বোধগম্য ভাষায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা করা বা তার পৃষ্ঠপোষকতা করার কোনো উদ্যোগই মহামতির মাঝে দেখা যায় না।

তিনি সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। অনেকের চেয়ে বেশিই করেছেন, তবে সেটা হলো তার নিজের বোধগম্য ভাষা; ফার্সি সাহিত্য, ফার্সি ভাষা। এখানে বৃহত্তর পরিসরের ভারতীয় সমাজ বরাবরই উপেক্ষিত থেকেছে। তার আমলে শহর গড়ে উঠেছে, নগরের উন্নতি হয়েছে। নিজের রক্ষিতাদের জন্য ঘর-বাড়ি, প্রাসাদ ও অবকাঠামো গড়তে গড়তে তিনি শহরই গড়ে ফেলেছেন, কারণ রক্ষিতাদের সংখ্যাও ছিল অগণন; পাঁচ হাজার! তাদের প্রয়োজনেই গড়ে উঠলো ফতেহপুর সিক্রি।

আজমিরকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন কিন্তু সেটা দিয়েছেন যতদিন ইসলামের সাধু দরবেশের উপরে তার আস্থা ছিল ততদিনই। আগ্রা থেকে আজমির

পর্যন্ত সড়কের উন্নয়ন করেছেন কারণ তিনি নিজে সেখানে যেতেন প্রতি বৎসর। যখন থেকে তিনি আজমির ভ্রমণ বন্ধ করেছেন, তখন থেকে আর সেদিকে তার কোনো নজর ছিল না।

একইভাবে, ভূস্বর্গ কাশ্মীরের সৌন্দর্যের প্রেমে পড়ে যান সম্রাট। কিন্তু অতি দুর্গম পথ অতিক্রম করে সেখানে যাওয়াটা সম্রাটের জন্য বিপজ্জনক ও সময়সাপেক্ষ। সম্রাট নির্দেশ দিয়ে সেখানে পাথর কাটতে তিন হাজার দক্ষ মিস্ত্রি ও মাটি কাটার জন্য দুই হাজার শ্রমিক পাঠালেন। তাড়াহুড়ো করে সম্রাটের জন্য খাইবার পাসের সাথে সংযোগকারী রাস্তায় সিন্ধু নদীর উপরে ব্রিজ নির্মাণ করা হলো। সহজ হয়ে উঠলো কাশ্মীরমুখী সড়ক। এভাবে প্রায় প্রতিটি উন্নয়নের পেছনে সম্রাটের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা জড়িত থেকেছে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণের চিন্তা অনেকটাই গৌণ।

আকবর এবং তার পরবর্তী মোগল শাসকরা মনে প্রাণে ভারতীয় হয়ে উঠতে পারেনি, সে প্রচেষ্টাও তাদের মধ্যে ছিল না। ভারতের মাটিতে তারা সবসময়ই নিজেদেরকে শাসক শ্রেণী হিসেবে ভাবতো। এ ধরনের ভাবনাপ্রসূত ধ্যান ধারণা তাদের আচার আচরণে প্রকাশ পেতো। ভারতের আলো বাতাসে বেড়ে উঠা, ভারতের সম্পদে পরিপুষ্ট মোগলদের চিন্তা ও চেতনায় সব সময়ই এক ধরনের উন্নাসিকতা বিরাজমান ছিল। আর সে উন্নাসিকতা ফুটে উঠতো তাদের আচারে, আচরণে, চিন্তা-চেতনা ও জীবনধারণের পদ্ধতিতে। এক ইংরেজ ঐতিহাসিকের ভাষায়: The vain notions in which they have been educated with such love of outward show, and the enervating climate in which they are born render them so incapable of resisting impulses of fancy, that nothing is so common than to see them purchasing a jewel or ornament of great price, at the very time that they are in the greatest distress of money to answer the necessities of government.

ভাবানুবাদ: নিজেকে জাহির করার যে অমূলক, মেকি চেতনা নিয়ে তারা শিক্ষালাভ করে আর যে রকম দুর্বল, কৃত্রিম ও অকার্যকর পরিবেশে তারা জন্মগ্রহণ করে, তা তাদেরকে বিলাসী জীবন যাপনের হাতছানি থেকে ফিরিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়। সরকারের চরম অর্থ সংকটের সময়েও তারা মহামূল্যবান রত্ন বা গহনা কেনার প্রলোভনকে সংবরণ করতে পারে না।[১৮৫]

মনস্তাত্ত্বিক বিচারে এটা পরিষ্কার যে, এ ধরনের অনুভূতি কেবলমাত্র প্রচণ্ড জাত্যাভিমান বোধ থেকেই সৃষ্টি হয়। আর মোগলদের মধ্যে বিদ্যমান জাত্যাভিমানের ব্যাপারে জনৈক গবেষকের মন্তব্য হচ্ছে নিম্নরূপ;

The Mughals present a posture of racial arrogance, a sense of of pedigree, and a strong sense of hereditary aristocracy. In North India, military slavery as an actual institution had long since disappeared, surviving only in a vestigial, rhetorical form: high-born Mughal officials, all of them free men customarily swore political loyalty to the emperor by styling themselves 'slaves of the court.'

ভাবানুবাদ : মোগলরা এক ধরনের উচ্চবংশীয় ঐতিহ্য ও জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা লালন করতো। দাক্ষিণাত্যে সামরিক দাসত্ব বহু আগেই দূরীভূত হয়ে তা কেবলমাত্র এক ধরনের লোক ঐতিহ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। উচ্চ বংশীয় মোগলরা নিজেদেরকে 'দরবারের দাস' হিসেবে উপস্থাপন করে বাদশাহর আনুগত্যের শপথ নিত।[১৮৬]

সম্রাটের কাছে নিজেদেরকে দাস হিসেবে উপস্থাপন করলেও এই 'দাস'রাই বৃহত্তর সমাজে এক একজন মনিব হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতেন। আকবর তার প্রতিটি সভাসদ,আমির-ওমরাহ, প্রতিটি সেনাপতির পাশাপাশি একটি বিশেষ সুশীল শ্রেণীকে জায়গির প্রদান করতেন। এদেরকে বলা হতো মনসবদার।

এইসব মনসবদাররা আবার নিজ নিজ অধীনে সৈন্যবাহিনী যা মূলত মোগল বাহিনী হিসেবেই পরিগণিত হতো। মনসবদাররা জায়গির থেকে খাজনা আদায় করতো, তা থেকেই তাদের অধীনস্থ সেনাবাহিনীর খরচ নির্বাহ করতেন। নিজেদের জীবন যাপনের খরচ নির্বাহ করতেন, ভোগ বিলাসের সকল খরচ সেখান থেকেই আসতো। আর এরপরে তাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারেও নির্ধারিত অর্থ জমা দিতে হতো। এই বিশাল অর্থের জোগান দিতো উক্ত জমিতে চাষাবাদকারী প্রজা।

আকবরের রাজত্বকালের শেষ দিকে এসে দুই হাজার মনসবদার ছিল তার পুরো সাম্রাজ্য জুড়ে। এদের অধীনে দেড় লক্ষ থেকে দুই লক্ষ সৈন্য ছিল। এইসব মনসবদার আর তাদের অধীনস্থ এই বিশাল সেনাবাহিনীর খরচ মেটাতেই ব্যয় হতো বার্ষিক বাজেটের শতকরা বিরাশি ভাগ।[১৮৭]

আর সম্রাট আকবর নিজের অধীনে রেখেছিলেন সাত হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং আশি হাজার পদাতিক সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী। এদের জন্য ব্যয় হতো বার্ষিক আয়ের নয় ভাগ।[১৮৮]

এভাবে দেখা যাচ্ছে বার্ষিক আয়ের শতকরা একানব্বই ভাগই চলে যেতো সম্রাট, তার সভাসদ, মনসবদার আর সকলের অধীনস্থ সৈন্যদের ভরণপোষণ ও তাদের ব্যয় নির্বাহের কাজে। রাজকোষে যে অর্থ জমা হতো,

তার একচ্ছত্র মালিক ছিলেন সম্রাট নিজে। আর মোগল সম্রাট ও তার পরিবার পরিজনের বিলাসিতা, যথেচ্ছভাবে রাষ্ট্রীয় অর্থ খরচের কথা তো কিংবদন্তি হয়ে আছে।

এইসব তথ্য আমাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, সামাজিক ও নাগরিক সুবিধার জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ রাষ্ট্রের হাতে থাকতো না, বা রাখা হতো না। আর তাই আপামর জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের তেমন কোনো প্রশ্ন এখানে আসার কথা নয়। তাদের ভাগ্যের কোনো অর্থবহ উন্নয়ন তো হয়ই নি বরং তারা অবর্ণনীয় দারিদ্রের মধ্যে নিপতিত হয়েছে। পুরো ভারতবর্ষে সম্পদের সুষম বন্টন তো হয়'ই নি, বরং সম্পদ একটা বিশেষ শ্রেণীর হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়েছিল। সম্পদের বৈষম্য ছিল আকাশচুম্বী। সামাজিক সাম্যের মতোই অর্থনৈতিক সাম্যও ছিল অকল্পনীয়, অভাবনীয়, অশ্রুতপূর্ব একটা বিষয়।

আকবর ও তার সন্তান জাহাঙ্গীর এবং তারও পরিবর্তিতে আকবরের নাতি শাহাজাহানের অনুসৃত নীতির ফল কি হয়েছিল, ভারতের কৃষক সমাজ কি পরিণতি ভোগ করেছিল তার একটা বিবরণ পাওয়া যায় এক ফরাসি পরিব্রাজক Francois Bernier এর বর্ণনায়। বিষয়টি প্রখ্যাত ইংরেজ গবেষক John Keay তার India: A History গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এভাবে: In consequence the peasant's lot was not, even in good times, a happy one. Francois Bernier, a doctor who travelled widely in India in the 1660s and then reported his finding's to Louis XIV's chief minister, described the lot of the Indian Peasant as a debasing state of slavery. Jagirdars, zamindars and the like excercised a tyranny often so excessive as to deprive the peasant and the artisan of the necessaries of life, and leave them to die of misery and exhaustion. It was, moreover, a tyranny that drives the cultivator of the soil from his wretched home to some neighbouring state in hopes of milder treatment, or to the army where he becomes the servant of some trooper'

ভাবানুবাদ: এর পরিণতিতে আপামর কৃষক সমাজ রাজ্যের স্থিতিশীল সময়গুলোতেও ভালো থাকেনি। ফরাসি চিকিৎসক Francois Bernier ১৬৬০ এর দিকে ভারতে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন, তিনি তার ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিখে জানান সপ্তদশ লুই'র প্রধানমন্ত্রীর কাছে। সেখানে তিনি লিখেছেন; ভারতীয় কৃষক সমাজ এক অবর্ণনীয় করুণ দাসত্বের নিগড়ে

বাঁধা পড়ে আছে। জায়গিরদার, জমিদার আর সমশ্রেণীর মানুষগুলো তাদের সীমাহীন নিপীড়ন ও শোষণের মাধ্যমে জীবন ও সমাজ পরিচালনার জন্য মৌলিক প্রয়োজন উৎপাদন ও সরবরাহ কাজে নিয়োজিত এই কৃষক শ্রেণীকে মানবেতর অবস্থায় তিলেতিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। তদুপরি এই শোষণ ও নির্যাতনই ভূমি চাষীদেরকে তাদের জীর্ণ কুটির ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী কোন রাজ্যে অপেক্ষাকৃত ভালো থাকার আশায় পাড়ি জমাতে, অথবা সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়ে কোন সেনাপতির দাসত্বে নিজেকে সমর্পণ করতে ঠেলে দেয়।[১৮৯]

কর ও রাজস্ব আদায়ের এই পথটা আকবরকে করে দিয়েছিলেন তার সভাসদ টোডরমল, সেটা আমরা আগেই বলেছি। কর আদায়ের এই ব্যবস্থার ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় চাষী সমাজ। কৃষিনির্ভর ভারতবর্ষে চাষী সমাজ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও পর্যাপ্ত সুবিধা না পাওয়ায় কৃষিকাজে অনিচ্ছুক হয়ে পড়ে। এর ফলে অনেক কৃষি জমি অনাবাদিই থেকে যায়। উক্ত ঐতিহাসিকের কথায়ঃ As the ground is seldom tilled otherwise than by compulsion, and as no person is found willing and able to repair the ditches and canals for the conveyance of water, it happens that the whole country is badly cultivated and a great part rendered unproductive for want of irrigation.

ভাবানুবাদঃ জোর জবরদস্তি করে কর আদায় করা এবং ঝোপ-ঝাড় পরিষ্কার না করা ও সেচ ব্যবস্থা না থাকার কারণে সারাদেশে চাষাবাদে এক বিপর্যয়কর পরিস্থিতি নেমে আসে এবং ভূ-ভাগের এক বিরাট অংশই অনাবাদি পড়ে থাকে।[১৯০]

অথচ এই ভারত হলো বিশ্বের অন্যতম একট উর্বরভূমি সম্পন্ন একটা দেশ। এ দেশের প্রায় পঁচাশি ভাগেরও বেশি জমি আবাদযোগ্য। এখানে রয়েছে ছোট বড় অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল। অতি সহজেই এর পুরো ভূ-ভাগকে একটি সুপরিকল্পিত সেচব্যবস্থার আওতায় আনা যেতো। সে রকম লোকবল ও অর্থ উভয়টিই আকবরের হাতে ছিল। কিন্তু তিনি এ কাজে কোনো উদ্যোগই নেননি।

এখানে একটা কথা বলে রাখা বোধকরি অসঙ্গত হবে না যে, রুক্ষ পাথুরে পাহাড়ি ও অনূর্বর ভূ-খণ্ড স্পেন, তথা আন্দালুস, যার মাত্র পঁয়ত্রিশভাগ ভূমি আবাদযোগ্য, মুসলমানরা ক্ষমতা গ্রহণের পরে সেই পাথুরে দেশটিতে অসংখ্য খাল কেটে, সেচব্যবস্থা চালু করে, কৃষকদের সবরকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে সেখানে একটা কৃষি বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলে মাত্র কয়েকটি দশকের

মধ্যেই। আন্দালুস অচিরেই বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ও সম্পদশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

ঠিক এরকমই একটা আর্থ সামাজিক বিপ্লব খুব সহজেই করা যেত ভারতেও। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটা হয় নি। আন্দালুস; পাহাড়ি, রুক্ষ, পাথুরে ও অনুন্নত জনপদ মাত্র তিরিশভাগ আবাদযোগ্য ভূ-ভাগ নিয়ে উন্নতি ও প্রবৃদ্ধির যে শিখরে যেতে পারলো, তার ধারে কাছেও মোটামুটি পঁচাশি ভাগ আবাদযোগ্য ভূমি, হাজার হাজার খাল বিল, ঝিল, পুকুর আর নদী-নালা এবং সেই সাথে আঠারো কোটি জনসংখ্যা নিয়ে ভারত কেন সেই একই স্তরে বা তার কাছাকাছিও পৌঁছুতে পারলো না?

আন্দালুস 'আন্দালুস' হতে পেরেছিল, কারণ, তার পেছনে মুসলমানরা ছিল। আর ভারত 'আন্দালুস' হতে পারেনি, তারও কারণ ঐ একই; এখানেও মুসলমানদের উপস্থিতি। তবে পার্থক্য হলো, ভারতে মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়েছেন আকবর ও তার পরবর্তী বংশধররা। আকবরই ভারতকে 'আন্দালুস' হতে দেননি, ভবিষ্যতেও যেন ভারত 'আন্দালুস' হতে না পারে, সেটা তিনি নিজের কাজের মাধ্যমে নিশ্চিত করে গেছেন, অবশ্য নিজেরই অজান্তে।

আর সেটা তিনি করেছেন ভারতীয় সমাজে গোত্রে-গোত্রে, জাতিতে-জাতিতে একটা স্থায়ী বিভেদের বীজ বপন করে। আকবর নিজের পরিবার বংশ গোত্র ও গোষ্ঠীকেই কেবল বিভেদে বিভেদে বিভক্ত করেননি। করেছেন পুরো ভারতবর্ষকেই। ভারতের প্রতিটি গোত্র একটি ঐক্যবদ্ধ একটি সামাজিক প্রক্রিয়ায় অঙ্গীভূত হওয়ার পরিবর্তে আকবরের সৃষ্ট পরিবেশের কারণে এতটাই বিভক্ত ও পারস্পরিক আস্থাহীনতায় আক্রান্ত ছিল যে, তারা যখন আক্রান্ত হলো চতুর ইংরেজদের দ্বারা, তখন কোনরকম কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। অথবা তাদের গড়ে তোলায় প্রতিরোধ আন্দোলনগুলো নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা ও পারস্পরিক আস্থাহীনতার কারণেই অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। ভারতীয় সমাজকে একটা স্থায়ী বিভেদের মধ্যে নিপতিত করে আকবর একে এতটাই দুর্বল করে রেখে গেছেন যে, ভারত যেন একটা বহিঃশক্তির অপেক্ষায় ছিল, আক্রান্ত হলেই সে আগ্রাসনের মুখে কোনো প্রতিরোধ গড়ে না তুলেই নিজের স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দেবে!

আকবর যেন ভারতের ভাগ্যে পরাধীনতাকে নিশ্চিত করে গেছেন তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে! প্রখ্যাত কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক মার্কস সে কথাটাই খুব সুন্দর করে বলে গেছেন প্রশ্নের আকারে। তিনি তার এক লেখায় বলেছেন:

A country not only devided between Mohammedan and Hindu, but between tribe and tribe, between caste and caste; a society whose framework was based on a sort of equilibrium, resulting from a general repulsion and constitutional exclusiveness between all its members. Such a country and such a society, were they not the predestined prey of conquest?

ভাবানুবাদঃ এমন একটা দেশ, যা হিন্দু মুসলমানদের মধ্যেই কেবল নয়, বরং গোত্রে গোত্রে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিভক্ত, এমন একটি সমাজ, যার মৌলিক ভিত্তিই প্রতিষ্ঠিত এর সদস্যদের পারস্পরিক বিভাজন, ঘৃণা ও বিদ্বেষের উপর, সেই সমাজ, সেই দেশের ভাগ্য কি বাইরের শক্তি কর্তৃক বিজিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকেনি? [১৯১]

বস্তুত মার্কসের কথাটাই আমরা সত্য হতে দেখেছি পরবর্তীতে। সম্রাট আকবরের সামনে এক বিরাট সুযোগ ছিল ভারতীয় সমাজকে একটা স্থিতিশীলতার উপরে দাঁড় করানোর। তিনি সেটা করেননি, সম্ভবত করতে চাননি।

আকবর কেবল ইসলাম ও মুসলমানেরই ক্ষতি করেননি, তিনি হিন্দুদেরও সীমাহীন ক্ষতি করেছেন। আকবরকে ইতিহাসে নানাভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, তিনি যা না, তাই তাকে বানানো হয়েছে বা বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আবার যে কাজটা তিনি করেননি, তার দায়ভারও তার উপরেই চাপানো হয়েছে। আকবর নিজেও একটা বিশেষ কাল ও পরিবেশের শিকার, নির্মম শিকার!

১. The Making of the Mughal Empire A History of India, John Keay পৃ: ৩১৩
২. ঐ পৃ: ৮৯
৩. White Mughals, William Dalrymple পৃ: ১১
৪. ঐ পৃ: ১২-১৩
৫. ঐ পৃ: ১০৪-৫
৬. আল কুরআান, সুরা নিসা, আয়াত: ৫৭
৭. The Great Mughals, Bamber Gascoigne পৃ: ২১
৮. ঐ পৃ: ১৬
৯. ঐ পৃ: ২০
১০. ঐ পৃ: ৫৩
১১. The Discovery of India, Jawharlal Nehru পৃ: ১৪৬
১২. The Great Mughals, Bamber Gascoigne পৃ: ৬০
১৩. পরাজিত সম্রাট ও শরাহত সুহৃদ, শ্যামাপ্রসাদ বসু পৃ: ১২
১৪. The Great Mughals, Bamber Gascoigne পৃ: ১৮-১৯
১৫. ঐ পৃ: ৪৩
১৬. ঐ পৃ: ৬৬
১৭. ঐ পৃ: ৬৬
১৮. ঐ পৃ: ৬৬
১৯. ঐ পৃ: ৬৬
২০. ঐ পৃ: ৬৬
২১. ঐ পৃ: ৬৭
২২. ঐ পৃ: ৬৮
২৩. ঐ পৃ: ৬৮
২৪. The Making of the Mughal Empire:
1500-1605, India; a History. John Keay পৃ: ৩০৯
২৫. উইকিপিডিয়া
২৬. পরাজিত সম্রাট ও শরাহত সুহৃদ, শ্যামাপ্রসাদ বসু পৃ: ১৩
২৭. ঐ পৃ: ৫১
২৮. ঐ পৃ: ৪৭
২৯. The Great Mughals, Bamber Gascoigne পৃ: ৬৯
৩০. ঐ পৃ: ৬৯
৩১. ঐ পৃ: ৬৯
৩২. ঐ পৃ: ৩৩৮
৩৩. After Tamerlane-The Global History of Empire, John Darwin পৃ: ৮৫
৩৪. ঐ পৃ: ৮৫
৩৫. Raj; The Making and Unmaking of British India, Lawrence James পৃ: ১৯২
৩৬. The Oxford Dictionary of World Religions. Edited by, John Bowker পৃ: ৩৭
৩৭. The Great Mughals, Bamber Gascoigne পৃ: ৭১
৩৮. ঐ পৃ: ৭১
৩৯. After Tamerlane. The Global History of Empire. John Darwin পৃ: ৮২
৪০. ঐ পৃ: ৮৩
৪১. চেপে রাখা ইতিহাস, গোলাম আহমেদ মূর্তাজা পৃ: ৪৫
৪২. Islam in China, MiSoujiang& You Jia.
Translated by Min Chang পৃ: ০৩

৪৩. The Muslim 100 The Lives, Thoughts and Achievements of the Most Influential Muslims in History, Muhammad Mojlum Khan পৃ: ২১২
৪৪. ঐ পৃ: ২১২
৪৫. ঐ পৃ: ২১৩
৪৬. ঐ পৃ: ২১৪
৪৭. চেপে রাখা ইতিহাস, গোলাম আহমদ মুর্তজা পৃ: ১১২
৪৮. ঐ পৃ: ১৪
৪৯. ঐ পৃ: ১১১
৫০. India : A History, John Keay পৃ: ২০৮
৫১. উইকিপিডিয়া
৫২. চেপে রাখা ইতিহাস, গোলাম আহমেদ মুর্তজা পৃ: ১১২
৫৩. ঐ পৃ: ১১৩-১১৪
৫৪. The History of Decline and Fall of the Roman Empire, অধ্যায় ৫৭ পৃ: ৮৬৪
৫৫. A Social History of the Deccan 1300-1761, Richard M Eaton পৃ: ২৩
৫৬. A History of India, John Keay পৃ: ২৩৫
৫৭. ঐ
৫৮. The Great Mughals, Bamber Gascoigne পৃ: ৮১
৫৯. চেপে রাখা ইতিহাস, গোলাম আহমেদ মুর্তজা পৃ:১১৯
৬০. The Muslim 100; The Lives, Thoughts and Achievements of the Most Influential Muslims in History. Muhammad Mojlum Khan পৃ: ৩০১
৬১. The Great Mughals, Bamber Gascoigne পৃ: ৮৩
৬২. ঐ
৬৩. The Great Mughals, Bamber Gascoigne পৃ: ৮৫
৬৪. পরাজিত সম্রাট ও শরাহত সুহৃদ, শ্যামাপ্রসাদ বসু পৃ: ২১
৬৫. A Social History of the Deccan 1300-1761. Richard M Eaton, পৃ: ১১৫
৬৬. After Tamerlane, The Global History of Empire. John Darwin পৃ: ৮৩
৬৭. ঐ পৃ: ৩৪, ৩৫
৬৮. ইসলামের অভ্যুদয় এবং বাংলাদেশ, রিচার্ড এমইটন পৃ: ৫৩
৬৯. The Muslim Heritage of Bengal, Mohammad Mojlum Khan পৃ: ১৫-১৬
৭০. "ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান" এম. এন. রায় পৃ: ৬২
৭১. সংস্কৃতির রূপান্তর, শ্রী গোপাল হালদার পৃ: ১৯৬
৭২. ঐ পৃ: ১৭
৭৩. After Tamerlane. The Global History of Empire, John Darwin পৃ: ০৫
৭৪. The Great Mughals, Bamber Gascoigne,myl: পৃ: ০১
৭৫. The Ottoman Empire, Lord Kinross পৃ: ৬০
৭৬. ঐ, পৃ: ৬০-৬১
৭৭. Sufis of Bijapur1300-1700.Richard M Eaton পৃ: ৯৫-৯৭
৭৮. The Ottoman Empire, Kinross পৃ: ২-৩
৭৯. Foundation of Islam, Alexander Walker পৃ: ১৭
৮০. ঐ
৮১. After Tamerlane. The Global History of Empire, John Darwin পৃ: ১৮
৮২. The Ottoman Empire, Kinross পৃ: ৬১
৮৩. ঐ পৃ: ৬২-৬৩
৮৪. ঐ পৃ: ৬৩
৮৫. What Went Wrong, Bernard Lewis পৃ: ০৮
৮৬. ঐ পৃ: ১২

৮৭. The life and Legend of Lawrence of Arabia;
The Golden Warrior, Lawrence James — পৃ: ১১৯, ১৫৯-১৬১
৮৮. Imperial Spain 1469-1716. J.H. Elliott — পৃ: ৬০
৮৯. ঐ — পৃ: ৬১
৯০. India: A History. John Keay — পৃ: ৩০৫-৩০৬
৯১. হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, সুকুমারী ভট্টাচার্য — পৃ:২৪
৯২. A Survey of Kerala History, A. Sree dhara Menon — পৃ: ২১৭
৯৩. ঐ — পৃ: ২১৯
৯৪. ঐ
৯৫. ঐ
৯৬. ঐ — পৃ: ২২০
৯৭. Imperial Spain 1469-1716. J.H. Elliott — পৃ: ৫৩
৯৮. ঐ — পৃ: ২২
৯৯. Indian Summer, The Secret History of
the End of an Empire; Alex Von Tunzelmann — পৃ: ১২
১০০. ঐ — পৃ: ১৩
১০১. ঐ
১০২. White Mughals, William Dalrymple — পৃ: ১১
১০৩. After Tamerlane, The Global History of Empire
John Darwin. — পৃ: ৫৩
১০৪. White Mughals, William Dalrymple — পৃ: ১৩-১৪
১০৫. A Survey of Kerala History, A. SreedharaMenon. — পৃ: ২২৮
১০৬. ঐ — পৃ: ২২৪
১০৭. ঐ — পৃ: ২২৭-২২৮
১০৮. An Utterly Imperial History of Britain. O'Farrell. — পৃ: ১৭৭
১০৯. The Slave Trade, The History of the Atlantic Slave Trade 1440-1870. — পৃ: ১০৫
১১০. ঐ — পৃ: ৭০৭
১১১. ঐ
১১২. A Survey of Kerala History, A. Sree dhara Menon — পৃ: ২২৮
১১৩. The Discovery of India, Jawharlal Nehru — পৃ: ১৪৬
১১৪. White Mughals, Wlliam Dalrymple — পৃ: ১১
১১৫. ঐ — পৃ: ১৩
১১৬. ঐ — পৃ: ১২
১১৭. Mankind and Mother Earth, Arnold Toynbee. — পৃ: ৪১৩
১১৮. ঐ — পৃ: ১৫
১১৯. White Mughals, William Dalrymple — পৃ: ১৪
১২০. ঐ
১২১. Mankind and Mother Earth. Arnold Toynbee — পৃ: ৪০৮
১২২. ঐ — পৃ: ৪২৯-৩০
১২৩. The Discovery of India, Jawharlal Nehru, — পৃ: ২৫৬-২৫৭
১২৪. Mankind and Mother Earth. Arnold Toynbee — পৃ: ৪০৮-৯
১২৫. ঐ — পৃ: ৪০৯
১২৬. ঐ — পৃ: ৫৫৩
১২৭. Foundation of Islam, Alexander Walker — পৃ: ২৫৪
১২৮. White Mughals, William Dalrymple — পৃ: ৮২
১২৯. India; A History. John Keay — পৃ: ২৩২
১৩০. হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, সুকুমারী ভট্টাচার্য — পৃ: ৪৮

১৩১. After Tamerlane. The Global History of Empire, John Darwin পৃ: ৮৬
১৩২. Reconciliation; Islam Democracy and the West, Benazir Bhutto পৃ: ২৩৯
১৩৩. ঐ পৃ: ২৩৯
১৩৪. ঐ পৃ: ২৪০
১৩৫. India; A history. John Keay পৃ: ৩১৭
১৩৬. The Muslim 100, Muhammad Mojlum Khan পৃ: ৩০৮
১৩৭. After Tamerlane. The Global History of Empire, John Darwin পৃ: ৮৫
১৩৮. The Great Moghuls, Bamber Gascoigne পৃ: ৭১
১৩৯. চেপে রাখা ইতিহাস, গোলাম আহমদ মুর্তাজা পৃ: ৬৯
১৪০. The Great Mughals, Bamber Gascoigne পৃ: ৭৪
১৪১. ঐ পৃ: ১০৪
১৪২. After Tamerlane. The Global History of Empire, John Darwin. পৃ: ৫৬
১৪৩. চেপে রাখা ইতিহাস, গোলাম আহমদ মুর্তাজা পৃ: ২১২
১৪৪. The Great Mughals, Bamber Gascoigne পৃ: ৯২
১৪৫. Foundation of Islam, Alexander Walker পৃ: ২৫৪
১৪৬. The Great Mughals, Bamber Gascoigne পৃ: ৭৪
১৪৭. ঐ
১৪৮. পরাজিত সম্রাট ও শরাহত সুহৃদ, শ্যামাপ্রসাদ বসু পৃ: ৮১
১৪৯. The Great Mughals, Bamber Gascoigne পৃ: ১০৪
১৫০. ঐ
১৫১. ঐ পৃ: ১০৫
১৫২. Mankind and Mother Earth, Arnold Toynbee পৃ: ৫৫৩
১৫৩. পরাজিত সম্রাট ও শরাহত সুহৃদ, শ্যামাপ্রসাদ বসু পৃ: ২৮
১৫৪. The Great Mughals, Bamber Gascoigne পৃ: ১০৮
১৫৫. ঐ পৃ: ১০৭
১৫৬. পরাজিত সম্রাট ও শরাহত সুহৃদ, শ্যামাপ্রসাদ বসু পৃ: ২৮
১৫৭. The Great Mughals, Bamber Gascoigne পৃ: ৭৫
১৫৮. ঐ পৃ: ১৬৭
১৫৯. ঐ পৃ: ১৩১
১৬০. ঐ পৃ: ১০৭
১৬১. Mankind and Mother Earth, Arnold Toynbee পৃ: ৫৫৩
১৬২. The Great Mughals, Bamber Gascoigne পৃ: ১০৮
১৬৩. চেপে রাখা ইতিহাস, গোলাম আহমেদ মুর্তাজা পৃ: ২২২
১৬৪. The Great Mughals, Bamber Gascoigne পৃ: ১০৮
১৬৫. চেপে রাখা ইতিহাস, গোলাম আহমেদ মুর্তাজা পৃ: ২০৭-২১২
১৬৬. The Great Mughals, Bamber Gascoigne পৃ: ১১১
১৬৭. ঐ
১৬৮. The Rise of Islam and the Bengal Frontier. Richard M. Eaton পৃ: ১৪২
১৬৯. ঐ পৃ:১৪৩
১৭০. পরাজিত সম্রাট ও শরাহত সুহৃদ, শ্যামপ্রসাদ বসু পৃ: ৮১
১৭১. The Great Mughals, Bamber Gascoigne পৃ: ১১৭
১৭২. পরাজিত সম্রাট ও শরাহত সুহৃদ, শ্যামাপ্রসাদ বসু পৃ: ৮৬
১৭৩. ঐ পৃ: ৮৭
১৭৪. The Great Mughals, Bamber Gascoigne পৃ: ১৭০
১৭৫. ঐ পৃ: ১২৬
১৭৬. পরাজিত সম্রাট ও শরাহত সুহৃদ, শ্যামপ্রসাদ বসু পৃ: ৯১

১৭৭. The Great Mughals, Bamber Gascoigne পৃ: ১২৫-১২৬
১৭৮. ঐ পৃ: ১২৭
১৭৯. ঐ পৃ: ১৬০
১৮০. ঐ পৃ: ১৪৬
১৮১. India; A History, John Keay পৃ: ৩১৮
১৮২. The discovery of India, Jawaharlal Nehru পৃ: ২৮৫
১৮৩. After Tamerlane. The Global History of Empire, John Darwin পৃ: ৮৫
১৮৪. ঐ পৃ: ৮৬
১৮৫. Raj; Making and Unmaking of British India Lawrence James পৃ: ২৮
১৮৬. A Social History of the Deccan 1300-1761, Richard M. Eaton পৃ: ১১৪
১৮৭. India; A History, John Keay পৃ: ৩২৫
১৮৮. ঐ
১৮৯. India A History, John Keay পৃ: ৩২১-২২
১৯০. ঐ পৃ: ৩২২
১৯১. The First Indian War of Independence, Marx & Engels পৃ: ২৬